

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

ত্রৈমাসিক

CUK-1101947-71-3572

সপ্ততিতম বর্ষ ॥ প্রথম—চতুর্থ সংখ্যা

১৩৭০

71

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস



বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪৩/১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বোড,

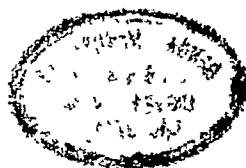
কলিকাতা—৬

Not to be issued



7572

100 11 12 3-12



সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

বর্ষ ৭০ ॥ সংখ্যা ১-৪

সূচীপত্র

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যেব ছন্দ—প্রবোধচন্দ্র সেন	১
কৌলীন্দ্ৰ প্রথাব উৎপত্তি—দীনেশচন্দ্র সবকাব	৪৫
পাতঞ্জল মহাভাষ্য (পূর্বানুবৃত্তি)—বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য	৫২
কপকাক্সক-শব্দ-প্রয়োগে বরীন্দ্রমানস—বীবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস	৬৯
কবি কাষ কোবাদ—অকগকুমাব মুখোপাধ্যায়	৮৪
ব্রহ্মাণ্ডকল্পনা বান্ধগ্য, বৌদ্ধ ও জৈন—নবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য	৯৮
কার্য বিববণ—	

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের ছন্দ

প্রবোধচন্দ্র সেন

১। অবতারণা

শিল্পিত বাগুভূজিবই নাম ছন্দ। প্রত্যেক ভাষার ছন্দই নির্ভব করে সে ভাষার স্বাভাবিক বাগুভূজি বা উচ্চারণবৈশিষ্ট্যের উপবে। কিন্তু ভাষার স্বাভাবিক উচ্চারণ-রীতির সন্ধান পাওয়া সহজ নয়। সে সন্ধান পাবার পথে অনেক অন্তরায়। প্রধান বাধা আসে ঐতিহাসিক সংস্কার থেকে। ভাষার স্বাভাবিক উচ্চারণের গতিপ্রবণতা যে দিকে, ঐতিহাসিক সংস্কারের বেগ অনেক সময় তার সহায়তা না করে তাকে তার ঐচ্ছিক পথের দিকেই আকর্ষণ করে। এই দোটানায় পড়ে সে ভাষার ছন্দে দেবা দেয় কৃত্রিমতা ও অস্থিৰতা। বাংলা ছন্দের ইতিহাসেও তাই ঘটেছে। বাংলা ভাষার অধিকাংশ শব্দই সংস্কৃত তথা প্রাকৃত ভাষার উত্তরাধিকারস্থলে পাওয়া। কিন্তু বাংলা উচ্চারণ সংস্কৃত বা প্রাকৃতের উত্তরাধিকারকে পুরোপুরি মেনে নেয় নি। অর্থাৎ শব্দের বানান ও প্রয়োগের বেলায় বাংলা ভাষা সংস্কৃত ও প্রাকৃতের ধুব কাছাকাছি হলেও উচ্চারণের বেলায় তার থেকে অনেকখানি দূরে চলে এসেছে। হিন্দি, মরাঠি প্রভৃতি ভাষার সঙ্গে তুলনা করলেই এ কথা সার্থকতা বোঝা যাবে। ছন্দ বস্তুটা যেহেতু শব্দের উচ্চারণ-তথা শ্রুতি-রূপেব উপরেই নির্ভর করে, সেইজন্মেই বাংলা ছন্দ সংস্কৃত ও প্রাকৃত ছন্দের অমুবর্তী হতে পারে নি। শব্দসম্পদের দিক্ থেকে বাংলা ভাষা হিন্দি, মরাঠি বা গুজরাটের চেয়ে সংস্কৃত-প্রাকৃতের অনেক কাছাকাছি, কিন্তু উচ্চারণের দিক্ থেকে অনেক দূরবর্তী। তাই হিন্দি, মরাঠি, গুজরাটি প্রভৃতি ভারতীয় আর্থভাষাব ছন্দ অনেকাংশেই সংস্কৃত-প্রাকৃত ছন্দের অমুবর্তী। কিন্তু বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে সে কথা বলা চলে না। বস্তুতঃ বাংলা ছন্দ অনেকাংশেই সংস্কৃত-প্রাকৃত ছন্দ থেকে পৃথক্ ও স্বতন্ত্র। এই পার্থক্য ও স্বতন্ত্র্য সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করতে তার বহু শতাব্দী সময় লেগেছে। বস্তুতঃ বাংলা ছন্দেব ইতিহাস মানে ছন্দোমুক্তিরই ইতিহাস, সংস্কৃত ও প্রাকৃত ছন্দসংস্কারের আকর্ষণ থেকে মুক্তিলাভের ইতিহাস। এই দীর্ঘ ইতিহাসেব শেষ পর্যায়ে আবিস্কৃত হলেন বাংলা ছন্দের শ্রেষ্ঠ মুক্তিসাধক রবীন্দ্রনাথ। এই ছন্দোমুক্তির প্রসঙ্গে তার প্রথম পর্যায়ের কবি বড়ু গুণীদাসের নামটিও উপেক্ষণীয় নয়। আসলে এই ইতিহাস-সোপানেব প্রথম দুটি পাদপীঠই হল চর্যাগীতিপদাবলী ও বড়ু গুণীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

এ কথা একটু আগেই বলা হয়েছে যে, বাংলা ছন্দোমুক্তি-প্রয়াসের প্রধান কাজই হল সংস্কৃত ও প্রাকৃত উচ্চারণ-তথা ছন্দ-সংস্কারে মায়া কাটিয়ে বাংলা ছন্দকে বাংলা ভাষার স্বাভাবিক উচ্চারণরীতির উপরে প্রতিষ্ঠিত করা ও সংস্কৃত-প্রাকৃত ছন্দের কাঠামো ভেঙে ফেলে নিজের উপযোগী নূতন কাঠামো তৈরি করা। কিন্তু বাংলা উচ্চারণও তো এক দিনেই 'ঘোবনে গঠিত পূর্ণ প্রস্ফুটিত' রূপ নিয়ে আবির্ভূত হয় নি। সে যুগে যুগে বিবর্তিত হয়ে বর্তমান রূপ ধারণ কবেছে। কিন্তু তাব গতিপ্রবণতা চিরকালই স্পষ্ট ও স্ননির্দিষ্ট। তা হলেও বাংলা ছন্দ কখনও স্ননির্দিষ্ট ও অবক্ষ গতিপথে অগ্রসর হতে পারে নি। পূর্বতন সংস্কারেব টানে সে পথ বাবে বাধেই নানাভাবে বেকে গিয়েছে। স্বভাব ও সংস্কার, এই দুই বিরুদ্ধ শক্তির টানে বাংলা ছন্দেব গতিপথ কিভাবে এঁকেবেঁকে গিয়েছে, তার প্রাথমিক পরিচয় পাওয়া যায় চর্যাগীতিতে। ঐতিহাসিক কাব্যখানিতে। সে প্রসঙ্গ উত্থাপনের পূর্বে দেখা প্রয়োজন, বাংলা উচ্চারণ সংস্কৃত-প্রাকৃত উচ্চারণেব বিধান লঙ্ঘন করে কতখানি স্বাতন্ত্র্য অর্জন করেছিল। বলা বাহুল্য, এই উচ্চারণস্বাতন্ত্র্যের সর্বাঙ্গীণ পরিচয় দেওয়া আমাদের পক্ষে নিম্নপ্রয়োজন বাংলা উচ্চারণস্বাতন্ত্র্যের যে বিশিষ্টতাগুলি তার ছন্দস্বাতন্ত্র্যের সহায়ক হয়েছে, শুধু সেগুলির একটু পরিচয় দেওয়াই বর্তমান প্রসঙ্গেব পক্ষে আবশ্যক।

২। বাংলাভাষার উচ্চারণস্বাতন্ত্র্য

এক ॥ সংস্কৃত ভাষায় অ, ই, উ, এই তিনটি স্বরবর্ণের উচ্চারণরূপ দু-রকম, হ্রস্ব ও দীর্ঘ। এই দ্বিবিধ উচ্চারণরূপের জন্ত দু-রকম লিপিরূপও উদ্ভাবিত হয়েছে। ও ভাষায় প্রত্যেক শব্দেই অ, ই, উ কোথায় হ্রস্ব হবে ও কোথায় দীর্ঘ হবে তা নির্দিষ্ট আছে। ফলে ও ভাষায় হ্রস্ব ও দীর্ঘ উচ্চারণভেদ অমুসাবে লিপিভেদও স্বীকৃত হয়। বাংলায় সংস্কৃতেব অমুসরণে হ্রস্বদীর্ঘ লিপিভেদ মানা হয়, কিন্তু তদমুসারে উচ্চারণভেদ মানা হয় না। সংস্কৃত দীর্ঘস্ববগুলিও বাংলায় হ্রস্বরূপেই উচ্চারিত হয়, অর্থাৎ বাংলায় আ, ঈ, উ বর্ণের উচ্চারণও হ্রস্ব। যেমন বাংলায় যদি, নদী, মধু, বধু, জিগীষা, পিগীলিকা, মুমূর্ষু, মুহূর্ত, নুপুং প্রভৃতি শব্দে স্বরবর্ণের লিপিভেদ অমুযায়ী উচ্চারণভেদ হয় না। ফলে সংস্কৃত ও বাংলা ছন্দে আ, ঈ, উ স্বরেব মাত্রাগত মূল্যভেদ ঘটাও অনিবার্য।

সংস্কৃতে এ এবং ও, এই দুটি স্বরবর্ণ নিত্যদীর্ঘ, বাংলায় এ দুটিও নিত্যহ্রস্ব। স্নতবাংলা সংস্কৃত ও বাংলা ছন্দে এ দুটি স্বরবর্ণেরও মাত্রামূল্যগত পার্থক্য হওয়া স্বাভাবিক।

দুই ॥ তা বলেই বাংলা উচ্চারণে যে দীর্ঘ স্বর নেই, তা নয়। আছে, কিন্তু তার কোনো স্বতন্ত্র লিপি বা চিহ্ন নেই। তাই চোখে দেখে চিনে নেওয়া যায় না, কিন্তু কাণে সহজেই চেনা যায়। বাংলায় এই দীর্ঘ উচ্চারণের যে কোনো নীতি নেই, তা নয়।

এই নীতির পবিচয় দেবার পূর্বে দু'একটি পারিভাষিক শব্দের একটু পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। ঐ (= অই বা ওই), ও (= অউ বা ওউ), আই, উই, অও প্রভৃতি জোড়াক্ষরকে বলি 'রুদ্ধস্বর' (closed vowel) এবং অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, এ, ও, এই কয়টি একক স্বরকে বলি 'মুক্তস্বর' (open vowel)। স্বরবর্ণের এই দ্বিবিধ রূপের প্রসঙ্গ একটু পরেই আবার উত্থাপিত হবে।

শব্দের যেসব অংশ বাগ্মন্ত্রের এক-এক প্রয়াসে উচ্চারিত হয়, তাকে বলি 'দল' (syllable)। যেমন—'ছন্দ' শব্দে দুই দল, ছন্ ও দ; 'ছান্দসিক' শব্দে তিন দল—ছান্, দ, সিক্; 'রবীন্দ্রনাথ' শব্দে চার দল—র, বীন্, দ্র, নাথ্। ছন্, ছান্, সিক্, বীন্, নাথ্ প্রভৃতি দলেব প্রথম অংশটা স্বতন্ত্র, দ্বিতীয় অংশটা স্বাতন্ত্র্যহীন বা আশ্রিত। এরকম 'স্বায়' 'রুদ্ধদল' (closed syllable)। আর আশ্রিতহীন দলকে (যেমন—স্বা, বি, ভী, ধি, কা) বলা যায় 'মুক্তদল' (open syllable)। দলসংখ্যা অনুসারে বিভিন্ন শব্দকে একদল (monosyllabic), দ্বিদল (dissyllabic), ত্রিদল (trisyllabic) ইত্যাদি নামে বর্ণিত করা যায়। যেমন—মা, কি, সে ইত্যাদি শব্দ একদল; ক, বি, ছন্, দ প্রভৃতি দ্বিদল; বাল্, মৌ, কি, কা, লি, দাস্ প্রভৃতি ত্রিদল।

এবার বাংলা উচ্চারণে দীর্ঘস্বরের প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। বাংলায় মুক্তস্বরবাস্তব একদল শব্দ সাধারণতঃ পূর্ববর্তী বা পববর্তী শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে উচ্চারিত হয়। যেমন—'তুমি-কি' যাবে? তুমি 'না-গেলে' আমিই যাব। 'সে-যদি' 'না-যায়' তবে আর 'কে-কে' যাবে? এরকম মুক্তস্বরবাস্তব একদল শব্দ যদি অল্প শব্দের সঙ্গে যুক্ত না হয়ে স্বতন্ত্রভাবে উচ্চারিত হয়, তবে ওই মুক্তস্বরের উচ্চারণ স্বভাবতঃই দীর্ঘ হয়। যেমন—'না, আমি যাব-না।' এই বাক্যের প্রথম 'না' দীর্ঘ, দ্বিতীয় 'না' হ্রস্ব। এই দীর্ঘ-হ্রস্বভেদ চোখে ধরা না পড়লেও কানে ধরা পড়ে। কবিতাব ছন্দে তা আরও সহজে ধরা পড়ে। কেন না, তখন তা হিসাবের মধ্যেই এসে যায়। দ্বিজেন্দ্রলালের বচনা থেকে একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

নন্দ বলিল, | ভায়ের জ্ঞান | জীবনটা যদি | দিই,—

'না-হয়' দিলাম, | কিন্তু অভাগা | দেশের হইবে | কি-?

—'হাসিব গান', নন্দলাল

'দিই' শব্দটা যে দ্বিমাত্রক অর্থাৎ দীর্ঘ, তাতে সন্দেহ নেই। বস্তুতঃ 'দিই' দলটির উচ্চারণ সংস্কৃত 'দী'র মতো। অথচ হ্রস্ব-ইকবাস্তব 'কি' এই 'দিই' বা 'দী'র সঙ্গে সম্পূর্ণরূপেই সমতা রক্ষা কবতে পেবেছে অর্থাৎ দীর্ঘত্ব বা দ্বিমাত্রকতা লাভ করেছে। কারণ, এই 'কি' পূর্ববর্তী বা পববর্তী কোনো শব্দের সঙ্গে যুক্ত না হয়ে স্বতন্ত্রভাবেই উচ্চারিত হয়েছে। পক্ষান্তরে 'না' শব্দটি পববর্তী 'হয়' শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে উচ্চারিত হচ্ছে বলে দীর্ঘ বা দ্বিমাত্রক বলে গণ্য হয় নি।

এবাব্ ববীন্দ্রনাথের বচনা থেকে দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করি।—

‘সে-দিন’ ববষা | ববব্বর ববে | কহিল কবির | স্ত্রী,...

‘মাথাব উপবে | বাড়ি পড়ো-পড়ো, | তাব খোঁজ রাখ | কি-১’

—‘সোনার তরী’, পুরস্কার

ধূলার মাঝে | ‘না-যদি’ দেন | পা-

‘তা-হলে’ পায় | ‘ধূলা-তো’ লাগে | না-

... ..

নিজের ছুটি | চরণ ঢাকো, | তবে

ধরণী আর | ঢাকিতে নাহি | হবে।

—‘কল্পনা’, জুতা-আবিষ্কার

কেন ‘কী-বলিতে’ চায়, | ‘না-বলিয়া’ যায় | সে-,

সখী, প্রতিদিন হায় | এসে ফিরে যায় | কে-।

—‘কল্পনা’, স্করণা

এখানে স্ত্রী, কি, পা, না, সে, কে, এই কয়টি পংক্তিপ্রান্তস্থ একদল শব্দ দ্বিমাত্রক ; কারণ এগুলি স্বতন্ত্রোচ্চাৰিত। অল্প একদল শব্দগুলি দ্বিমাত্রক নয় ; কারণ সেগুলি স্বতন্ত্রোচ্চাৰিত নয়, পার্শ্ববর্তী শব্দের সঙ্গে যুক্তভাবে উচ্চাৰিত।

পংক্তির মধ্যবর্তী একদল শব্দের দ্বিমাত্রক প্রয়োগেব দৃষ্টান্তও আছে ববীন্দ্রবচনাতে।—

গোলাপ ফুল | ফুটিয়ে আছে | মধুপ হোঁথা | বাস-নে—

ফুলের মধু | লুটিতে গিয়ে | কাঁটার ‘বা-’ | -খাস-নে।

—‘শৈশব-সংগীত’, ফুলবালা : গান-১

ফাগুন মাস | আবার এল |

বহিয়া ফুল | -ডালা।

জানালা-পাশে | একেলা বসে |

ভাবিছে বাজ | -বালা—

‘কে-’ পবালে | মালা।

—‘সোনার তরী’, স্তম্ভোৎখিতা

বাংলা উচ্চারণের এই বিশিষ্টতার দৃষ্টান্ত মধ্যযুগের সাহিত্যেও বিরল নয়। বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রচনাব সময়েই এই বিশিষ্টতা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

পৃষ্ঠাঙ্গুলি মূল পাণ্ডুলিপিব।

আক্ষার বচন শুণ | তোকে বড়ি ‘মা-’।

না-জাণো কেমন করে। আক্ষার ‘গা-’ ॥

—বংশীখণ্ড, পা ১৭১।১-২

বড়ার বোহারী আন্ধে | বড়ার 'কী-' ।

কাহ্ন বিণি মোর রূপ | ঘোবনে 'কী-' ॥

—বংশীখণ্ড, প। ১৭৫।২

নঠ হৈল ঘোল দুধ | আর নঠ 'দী-' ।

এড়ি জাএ মোক সব | গোআলাব 'কী-' ॥

—দানখণ্ড, প। ৫১।২

যত আলঙ্কার | বহুমূল সার |

সব রাধা মোর | 'নে-' |

জুবধে জড়িত | হিরাঞ রচিত |

বাঁশীগুটি মোরে | 'দে-' ॥

—বংশীখণ্ড, প। ১৮১।২

সবগুলি দৃষ্টান্তই পংক্তিপ্রান্তিক । পংক্তিমধ্যস্থ দৃষ্টান্তেরও অভাব নেই । যেমন—

গোআলার 'বি-' আন্ধে | আতিশয় বালী ।

—দানখণ্ড, প। ৪৯।২

'কে-' তোকে জাণাইলে | মাউলানী সম্বন্ধ ।

—দানখণ্ড, প। ২৬।১

'ভৌ-' মোব নাতি যেহ | দুঅজ পবাণ ।

ভোঙ্কার বোলত আন্ধে | না-করিব আন ॥

—ভাষ্যলখণ্ড, প। ৬।২

বারে' বারে' কাহ্ন 'মো-' | দধি বিকে জাওঁ ।

সমুচিত দানঘাট | তোর-না ভাদ্ধাওঁ ॥

—দানখণ্ড, প। ২৫।২

অসর বাঁশীর নাদ | গুণিআ বডায়ি |

রাঙ্কিলেঁ-যে গুনহ কাহিনী ।

আম্বল ব্যঞ্জনে 'মো-' | বেশোআব দিলেঁ ।

সাকে, দিলেঁ কানাসোজাঁ পাণী ॥

—বংশীখণ্ড, প। ১৭৫।২

ঘাটত ভেটিল | নামের 'পো-' ।

কাজ-না বুয়িল | লাজে ।

—যমুনাখণ্ড, প। ১৩২।২

আর দৃষ্টান্ত বাড়িয়ে লাভ নেই । এরকম অনেক দৃষ্টান্তই আছে এ গ্রন্থে ।

তিন ॥ সংস্কৃতে 'ঋ' হ্রস্বব বলৈই স্বীকৃত । কিন্তু বাংলায় ঋ স্থলবিশেষে হ্রস্বব বলৈ এবং স্থলবিশেষে 'বি' রূপে গণ্য হয় । যেমন—'বিকৃত' শব্দটি উচ্চারিত হয় 'বি. কৃ. ত'

রূপে, ‘বিক্. রি. ত’ রূপে নয়। পক্ষান্তরে ‘পিতৃ’ শব্দটির উচ্চারণরূপ ‘পিত্. রি’, ‘পি. তৃ’ নয়। এই উচ্চারণভেদের ফলে বাংলা ছন্দে ঋকারান্ত বর্ণের মাত্রামূল্যেও ভেদ ঘটে। রবীন্দ্রনাথের রচনা থেকে দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

যক্লং যদি | বিকৃত হয়, |

স্বীকৃত হবে | কিসের ভয়, |

না-হয় হবে | পেটের গোল | -যোগ।

—‘প্রহাসিনী’, ভোজনবীথ

‘আমরা হইলাম | পিতৃহারা’, |

কাদিয়া কহে দশ | দিক্,

সকল জগতেব | বন্ধু ধাঁবা, |

তাদের শক্রবে | দিক্’।

—‘কথা’, মণ্ডকবিক্রম

মাতৃভূমির লাগি | পাড়া ঘুবে মরেছে,

এক-শো টিকিট বিলি | নিজ হাতে করেছে।

—‘খাপছাড়া’, ৩৫

দেখা যাচ্ছে এখানে যক্লং, বিকৃত ও স্বীকৃত শব্দে তিন মাত্রা, আবাব পিতৃ ও মাতৃ শব্দেও তাই ধরা হয়েছে। অর্থাৎ শেষের দুটি শব্দ প্রথম তিন শব্দের চেয়ে আয়তনে ছোট হলেও মাত্রামূল্যে সমান বলেই গণ্য হয়েছে। মাত্রামূল্যগত এই পার্থক্য ঋকারান্ত বর্ণের উচ্চারণভেদেরই ফল।

সংস্কৃতে কিন্তু যক্লং, বিকৃত ও স্বীকৃত শব্দে তিন মাত্রা এবং মাতৃ ও পিতৃ শব্দে দুই মাত্রাই ধরা হয়। কারণ ও ভাষায় ঋকারান্ত বর্ণের উচ্চারণ সর্বত্রই এক, স্থলবিশেষে পার্থক্য ঘটে না।

চার ॥ সংস্কৃতে দুটিমাত্র রুদ্ধস্বর (closed vowel) আছে, ঐ এবং ঔ। এ দুটির উচ্চারণরূপ হচ্ছে যথাক্রমে অই্ এবং অউ্। পূর্বেই বলা হয়েছে, যেসব যুক্তস্বরের প্রথম অংশ স্বতন্ত্র এবং দ্বিতীয় অংশ প্রথমটির আশ্রিত, তাবই নাম ‘রুদ্ধস্বর’। ঐ অর্থাৎ অই্, ধ্বনির আদিশ্রিত ‘অ’ অংশটি স্বতন্ত্র, পরবর্তী ই্ অংশটি আশ্রিত। অতএব ঐ বা অই্ রুদ্ধস্বর। ‘দাও্’ শব্দের আও্ রুদ্ধস্বর; কারণ এখানে ও্ স্বাতন্ত্র্যহীন অর্থাৎ আশ্রিত। কিন্তু ‘দিও্’ শব্দের ‘ও’ স্বাতন্ত্র্যহীন নয়, স্তবরাং ‘দিও’ শব্দের ‘ইও’ অংশকে রুদ্ধস্বর বলা যায় না। এখানে দুটি স্বতন্ত্র স্বরের সমাবেশ ঘটেছে। তেমনি ‘খাও’ শব্দের ‘আও্’ রুদ্ধস্বর, কিন্তু ‘খেও’ শব্দের ‘এও’ রুদ্ধস্বর নয়। পক্ষান্তরে ‘দেও্ দাব’ শব্দের ‘এও’ রুদ্ধস্বর বলেই স্বীকার্য।

বাংলা ভাষা ঐ আর ঔ, এই দুটিমাত্র রুদ্ধস্বর সংস্কৃতির কাছে পেয়েছে উত্তরাধিকার-স্বত্রে। কিন্তু বাংলায় আরও অনেকগুলি রুদ্ধস্বর উৎপন্ন হয়েছে তাব স্বকীয় ধ্বনিপ্রবর্তনার

ফলে। যেমন— অই, অউ, অএ, অও; আই, আউ, আএ, আও; ইই, ইউ; উই; এই, এউ, এএ, এও; ওই, ওএ, ওও ইত্যাদি। দই, বউ, কয় (= কএ < কহে), কও (= কঅ < কহ) ; নাই, লাউ, চায় (= চাএ < চাহে), চাও (চাঅ < চাহ) ; নিই, শিউলি ; দুই; সেই, ঢেউ, দেয় (= দেএ), দেওদার ; ওই (সংস্কৃত অদঃ অর্থে), শোয় (= শোএ), শোও প্রভৃতি শব্দের কথা স্মরণ করলেই বোঝা যাবে— বাংলায় রুদ্রস্বরের সংখ্যা যুক্তস্বরের (open vowel) চেয়ে কত বেশি।

এ প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, বাংলায় অই এবং অউ, ধ্বনির উচ্চারণরূপ হচ্ছে যথাক্রমে ওই এবং ওউ; অঅ এবং আঅ, ধ্বনি পবিবর্তিত হয় যথাক্রমে অও এবং আও রূপে; আর অএ এবং আএ, ধ্বনি দুটির লিখিত রূপ অয় এবং আয়।

বাংলায় অই এবং অউ, এই দুটি রুদ্রস্বর সংস্কৃতের অঘসরণে দুটি স্বতন্ত্র বর্ণলিপি (ঐ এবং ঔ) সাহায্যে লিখিত হয়। এই দুটি রুদ্রস্বর অবশ্য অনেক সময় ভেঙে দুই বর্ণলিপির সাহায্যেও লেখা হয়। যেমন— দই, বউ। অল্প রুদ্রস্বরগুলি লিখতে, দুটি করে বর্ণলিপি লাগে, এক বর্ণে লেখা যায় না। কারণ এগুলি জন্ম কোনো স্বতন্ত্র বর্ণলিপি উদ্ভাবিত হয় নি।

এ প্রসঙ্গে ছন্দের আলোচনায় দুটি বিষয় অবগীয়া।—

১। রুদ্রস্বরের বাহুল্যে বাংলা ভাষার ধ্বনিপ্রকৃতিতে যে বিশিষ্টতা দেখা দিয়েছে, স্বভাবতঃই তা বাংলা ছন্দকে সংস্কৃত ছন্দ থেকে স্বাতন্ত্র্যদানের সহায়ক হয়েছে।

২। রুদ্রস্বরগুলির লিপিরূপও বাংলা ছন্দের গতিপ্রকৃতিকে অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত করেছে। আবার অবস্থাবিশেষে সংশয়সৃষ্টিকর সহায়কও হয়েছে। যেমন, বৌ এবং বউ শব্দের লিপিরূপ ভিন্ন হলেও এ দুই শব্দের ধ্বনিরূপ অভিন্ন। কিন্তু অনেক সময় ধ্বনিরূপকে না মেনে লিপিরূপকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। ফলে বৌ শব্দে এক মাত্রা গণনা করা হয়, অথচ বউ শব্দে দুই মাত্রা। তেমনি হইল শব্দে তিন মাত্রা, আর হৈল বা শৈল শব্দে দুই মাত্রা। কিন্তু ডাইনী, চাউনি, শিউলি, কেউটে, নেওটা প্রভৃতি শব্দে তিন মাত্রাই ধরা হয়। কারণ এসব স্থলে রুদ্রস্বরের কোনো একক লিপিরূপ নেই, থাকলে হয়তো বিকল্পে দুই মাত্রাও ধরা হত।

কিন্তু এই লিপিরূপকে প্রাধান্য দেবার বীতি বড় চণ্ডীদাসের যুগে দেখা দেয় নি, সে বীতি প্রতিষ্ঠালাভ কবে ভারতচন্দ্রের হাতে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন থেকে দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক।—

বড়ায়ি লইআঁ রাহী | গেলী সেইখানে।

সখিসবে বুইল বাধা | লডিউ সিনানে ॥

—বংশীখণ্ড, পা ১৬৮।২

খনে কবতাল খনে | বাজাএ মুদঙ্গ।

তা দেখি বাধিকার | সখিগণে রঙ্গ ॥

—বংশীখণ্ড, পা ১৬৯।১

কে-না বাঁশী বাএ বডায়ি | কালিনী নইকুলে ।
 কে-না বাঁশী বাএ বডায়ি | এ-গোঠ গোকুলে ॥
 আকুল শরীর মোর | বেআকুল মন ।
 বাঁশীব শবদেঁ মো- | আউলাইলোঁ বান্ধন ॥

—বংশীখণ্ড, পা ১৬৯।২

আউলাইল কুন্তল মোব | সত্বব গমনে ।
 করযুগ তুলী তাব | করিলোঁ বন্ধনে ॥

—যমুনাখণ্ড, পা ১৩৪।২

বডায়ি বা বড়াই শব্দের আই ধ্বনি প্রথম দৃষ্টান্তে দুই মাত্রা এবং তৃতীয় দৃষ্টান্তে এক মাত্রা বলে গণ্য হয়েছে। লইআঁ ও নইকুলে (তুলনীয় ‘নৈহাটি’) শব্দের আই স্বব যথাক্রমে দুই ও এক মাত্রাব মূল্য পেয়েছে। বাজাএ শব্দের আএ দুই মাত্রা, বাএ শব্দেও আএ দুই মাত্রা। বুইল, আউলাইলোঁ এবং আউলাইল শব্দের তিনটি রুদ্রস্বরই (উই, আউ, আই) এক মাত্রা বলে গণ্য হয়েছে। পূর্বোদ্বৃত্ত

‘কে- তোকে জাণাইলে | মাউলানী সম্বন্ধ।’

এই দৃষ্টান্তে ‘মাউলানী’ শব্দে আউ স্ববটিও এক মাত্রা। প্রসঙ্গক্রমে লক্ষণীয় যে, ‘বাঁশীর শবদে মো- আউলাইল বান্ধন’ এই পংক্তির ‘মো’ দলটি দুই মাত্রার মূল্য পেয়েছে। কারণ এই মুক্তস্বরাস্ত একদল শব্দটি এখানে অলগ্ন- অর্থাৎ স্বতন্ত্র-ভাবে উচ্চারিত। অমূরূপ আব-একটি দৃষ্টান্ত এই।—

গোআলাব বহ কি- | লইআঁ জাইব আন্দে ।

—তাম্বুলখণ্ড, পা ১৫।১

এখানে ‘কি’ মুক্তদলটি দ্বিমাত্রক। কিন্তু ‘লই’ এবং ‘জাই’ এই দুটি রুদ্রদল একমাত্রক।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ছন্দে স্ববাস্ত দলেব প্রয়োগ সম্বন্ধে এতক্ষণ যা আলোচনা করা গেল, তার সারকথা এই।—

১। স্বরাস্ত মুক্তদলের অলগ্ন উচ্চারণ দ্বিমাত্রক এবং সংলগ্ন উচ্চারণ একমাত্রক। যথা,

আম্বল ব্যঞ্জে মো- | বেশোআর দিলোঁ ।

—বংশীখণ্ড, পা ১৭৫।২

মো-কিছু-না জাণো শিশু | আবালী গোআলী ।

—নৌকাখণ্ড, পা ৭৭।২

২। স্বরাস্ত রুদ্রদল শব্দের মধ্যেই থাকুক বা শব্দের অন্তেই থাকুক, তার উচ্চারণ প্রয়োজনমতো একমাত্রক বা দ্বিমাত্রক হয়। যেমন,

নিছন লইআঁ কাছাঞিঁ | থাকু এক বাটে ।

আন পথে যাইব বিকে | মথুরার হাটে ॥

যে-বাটে বাইবি হাট | দধি ঘৃত লজ্জা ।

সবই কাছাঞ্জি তোর | খাইব তথা গির্জা ॥

—দানখণ্ড, পা ৬১২-৬২১

ভাত-না খাইলি তবৈ | তাহাব কারণে ।

শাকব খাইতে তোন্ধে | আদরাহ কেছে ॥

—রাধাবিরহ, পা ২২৬১

পাঁচ ॥ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের রচনায় স্বরাস্ত রুদ্রদলের প্রয়োগে যে বৈচিত্র্য দেখা যায়, ব্যঞ্জনাস্ত রুদ্রদলের প্রয়োগে তা দেখা যায় না। মনে হয় সে কালে শব্দমধ্যস্থ রুদ্রদলমাত্রই যুক্তাক্ষরের সাহায্যে লিখিত হত (যেমন—স্রষ্টি, শঙ্খ, চন্দ্র, কলঙ্ক)। তখনকার উচ্চারণে অ-তৎসম শব্দে অযুক্তাক্ষরে লিখিত উক্তপ্রকার ব্যঞ্জনাস্ত রুদ্রদলেব (যেমন—হালকা, পাতলা, চলতি, হুনকো, পাগলা) উদ্ভব হয়েছিল কি না নিঃসন্দেহে বলা কঠিন। তবু মনে হয় শঙ্খ, চক্র প্রভৃতি তৎসম শব্দের ব্যঞ্জনাস্ত রুদ্রদল (শঙ, চক্) এবং বুইল, পাইব প্রভৃতি অ-তৎসম শব্দের স্বরাস্ত রুদ্রদলেব (বুই, পাই) প্রয়োগ যখন স্পষ্টপ্রচলিত ছিল, তখন কল্‌সি, হল্‌দি প্রভৃতি অ-তৎসম শব্দে রুদ্রদলেব উচ্চারণও অসম্ভব ছিল না। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কোনো কোনো প্রয়োগ দেখে এই অসুমান সমর্থনযোগ্য বলেই মনে হয়। যেমন—

পাপ ছুঠ্ঠ কংস তাক | সবই মাবিব ।

—জন্মখণ্ড, পা ৩২

পুণ্য কইলৈ স্বগ্গ জাইএ ।

নানা উপভোগ পাইএ ।

পাপেঁ হএ নরকের ফল ।

—রাধাবিরহ, পা ২০৭২

কাছের কল্‌সিএঁ বাধা | তুলিলে- পাণী ।

মধু রসময় তোব | বোল খাণী খাণী ॥

—যমুনাখণ্ড, পা ১৩৭২

এখানে ছুঠ্ঠ, স্বগ্গ এবং কল্‌সিএঁ শব্দের ছুঠ্ঠ, স্বগ্গ, ও কল্, এই তিনটি ব্যঞ্জনাস্ত রুদ্রদলের সংকুচিত অর্থাৎ একমাত্রক প্রয়োগ লক্ষণীয়। এসব রুদ্রদলের প্রসারিত বা দ্বিমাত্রক প্রয়োগও আছে। যথা—

সর্গ মর্ত্য পাতালে ।

চিস্তিঞা চাহিলেঁ মনে ।

তৌ- মোর নিজাঁহিস বাণী ।

—বংশীখণ্ড, পা ১৮৬১

সংপূন পুনমীচাঁদ | তোক্ষার বদন ।

কাঞ্চীহলদি যেন | তোক্ষার বরণ ॥

—দানখণ্ড, পা ৩৮।১

বাঁশীগুটি থুইহ তোক্ষে | কলসি ভীতর ।

—বংশীখণ্ড, পা ১৭৮।১

দধিভার লজ্জা কাহ | মথুবাক জাএ ।

উলটি উলটি বাধা | কাহ পাণে চাহে ॥

—ভারখণ্ড, পা ৯৭।২

এসব স্থলে হলদি, কলসি, উলটি শব্দে মধ্যবর্তী বর্ণের অকারান্ত উচ্চারণও অসম্ভব নয় ।

শব্দের অস্তুস্থিত ব্যঞ্জনান্ত রুদ্ধদলের উচ্চারণও দ্বিবিধ— প্রসাবিত বা দ্বিমাত্রক এবং সংকুচিত বা একমাত্রক । যথা—

হেন শুনী দৈমত হাসিআঁ ততিখণে ।

ধল কাল ছুই কেশ | দিল নারায়ণে ॥

—জন্মখণ্ড, পা ৩।১

ত্রিঙ্গতনাথ তোক্ষে | দেব বনমালী ।

তোক্ষাকে না কবে ভয় | রাধা চন্দ্রাবলী ॥

—বাণখণ্ড, পা ১৫৪।২

বলা বাহুল্য, তৎকালে খণ্ড ত-এর প্রচলন ছিল না । সুতরাং এখানে দৈবৎ এবং জগৎ এ দুটি তৎসম শব্দের হসন্ত উচ্চারণ অভিপ্রেত কি না, তা নিঃসংশয়ে বলা যায় না । তা ছাড়া পদ্যরচনায়, বিশেষতঃ গেয় রচনায়, এসব শব্দের উচ্চারণরূপ নির্ণয় কবা আরও কঠিন । কেন না, পদ্যরচনায় অনেক সময় হসন্ত শব্দেরও অকারান্ত উচ্চারণ হয় । এবার অ-তৎসম শব্দের দৃষ্টান্ত দিচ্ছি ।—

আনেক ফুল তুলিলেঁ |

আল বহত ফল খায়িলেঁ |

আর আহুচিত কৈলেঁ বাধা | ডাল ভাঙ্গিআঁ পেলায়িলেঁ ।

—বৃন্দাবনখণ্ড, পা ১২৩।২

এখানে আনেক, বহত, ফুল, ফল, ডাল, আহুচিত, এই শব্দগুলি হসন্ত উচ্চারণ হওয়া অসম্ভাবিত নয় ।

কিন্তু শব্দের অস্তুস্থিত সংকুচিত অর্থাৎ একমাত্রক প্রয়োগের ক্ষেত্রে এরকম উচ্চারণগত সংশয়ের কোনো অবকাশ থাকে না । যেমন—

‘তাহাব’ হাথে হৈবে কংশা | -স্বরের বিনাশে ।

হেন বর পাঁজী সব | দেব গেলা বাসে ॥

—জন্মখণ্ড, পা ৩।১

কাল 'মেঘেব' পাশে শোভে | পুনমিব চন্দ্র ।

এহা বুঝী না কব রাধা | তৌ- মন মন্দ ॥

—দানখণ্ড, পা ৪৮।১

বেদ উদ্ধারিলে। ক্রীড়া 'সাগর' জলে

লীলাএ আক্ষে মুবাবী ।

দৈত্য দলিলে। 'আম্বর' সংহাবিলো

শত্ৰু চক্র গদা ধবী ॥

—দানখণ্ড, পা ৫১।২

'ঘাটের' ঘাটিআল মোরে | ঝাঁট কর পার ।

তোর মায় যশোদায় | নন্দ আন্ধার ॥

—নৌকাখণ্ড, পা ৭৭।২

যবে রাধা গোআলিনী | 'পাতল' কৈল গাএ ।

তবে হিঅ হিঅ বুলী | কাহু বাহে নাএ ॥

—নৌকাখণ্ড, পা ৮৩।১

এবে 'আকুল' কৈলে মোরে | নান্দে নন্দনে ।

—বংশীখণ্ড, পা ১৭৫।১

যমুনার তীবে 'কদম' তরুতলে

বাত বহে স্নানীতলে ।

—বংশীখণ্ড, পা ১৭৮।১

মোর বোলে তোম্বে তার | 'পাসক' না আসিবে ।

পাছে কলি কাহাঞি বিরহ দুখ পাইবে ॥

—রাধাবিবহ, পা ২২৬।১

তৎসম শব্দের যুক্তাক্ষরচিহ্নিত রুদ্রদলেরও বিবিধ প্রয়োগ, একমাত্রক ও দ্বিমাত্রক ।
যথা—

এবে হতে দৈবকীর | যত 'গর্ভ' হএ ।

মামুষ নিয়োজিল | মারিবাক তাএ ॥...

এবে দৈবকীঞ যত | 'গর্ভ' ধবির ।

পাপ দুষ্ঠ কংসে তাক | সবই মাণিব ॥

—জন্মখণ্ড, পা ৩।২

'ওষ্ঠ' আধর যেহু | যমজ পৌআর ।

কণ্ঠযুগ শোভে যেহু | বরুণের জাল ॥

—জন্মখণ্ড, পা ৫।১

নাগা বিনতানন্দন ।
 পাণ্ডুগুণ পাশে কল্প ।
 বিশ্ব 'ওষ্ঠ' পুষ্পদন্ত সঙ্গে ।

—বাণখণ্ড, পা ১৫৮।১

এখানে 'গর্ভ' এবং 'ওষ্ঠ' শব্দের দ্বিবিধ প্রয়োগ লক্ষণীয়। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন যে, এরকম রুদ্ধদলেব একমাত্রক প্রয়োগই ত্রিকৃষ্ণকীর্তনের সাধাবণ নীতি; দ্বিমাত্রক প্রয়োগের দৃষ্টান্ত খুবই বিরল। উপরের উদৃষ্টান্তগুলির প্রতি একটু দৃষ্টি দিলেই এ কথা সার্থকতা বোঝা যাবে।

এখানে ব্যঞ্জনান্ত রুদ্ধদলের দ্বিমাত্রক প্রয়োগেব আরও কয়েকটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করছি।—

কালিনী ব তীরে বহে । 'মন্দ' পবনে ।
 তোমাক চিন্তিতে আছে । নামের নন্দনে ॥

—বৃন্দাবনখণ্ড, পা ১১৩।২

'মন্দ' পবন বহে । কালিনী নহীতীরে ।
 কাহাঞি সৌন্দরী মোর । চিত নহে থীরে ॥

—বংশীখণ্ড, পা ১৭৫।১

আপণে বোলহ বডায়ি । দেব গদাধরে ।
 'ছত্র' ধরিলে বোল । ধবিরো তাহাবে ॥

—ছত্রখণ্ড, পা ১০২।২

'লাবণ্য' জল তোর । সিংহাল কুন্তল ।
 বদন কমল শোভে । আলক ভষল ॥

—ছত্রখণ্ড, পা ১০২।১

যত কৈল 'সংযম' ।
 করিলে যত নিয়ম ।
 নঠ হএ কাজ মোর । সে সব ধরম ।

—বাধাবিরহ, পা ২১০।১

শিশত সিন্দূব শোভে । উয়ে যেন স্রব ।
 নয়ন দেখিঅঁ 'খঞ্জন' জাএ দূর ॥

—বাণখণ্ড, পা ১৫৬।২

দ্বিতীয় দৃষ্টান্তের 'নহীতীরে' শব্দের উচ্চারণরূপ 'নৈতীরে'। আব শেষ দৃষ্টান্তেব দ্বিতীয় পংক্তিব যতি পড়েছে 'খঞ্জন' শব্দের মধ্যে। এই পংক্তিটির পদবিভাগ নিম্নলিখিত রকম।—

নয়ন দেখিঅঁ খঞ্ । -জন জাএ দূর ।

এরকম ব্যঞ্জনান্ত রুদ্ধদলের দ্বিমাত্রক প্রয়োগের প্রসঙ্গ একটু পরেই আবার উত্থাপন করা যাবে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ছন্দোবীতি-বৈচিত্র্যের আলোচনা উপলক্ষে।

আশা করি এতক্ষণে এ কথা স্পষ্ট হয়েছে যে, বাংলা ভাষার সবকম উচ্চারণস্বাতন্ত্র্যই শ্রীকৃষ্ণকীর্তন বচনার যুগে বেশ পবিস্মৃষ্ট রূপ ধারণ কবেছিল এবং সে রূপটি প্রায় সর্বতোভাবেই ধরা দিয়েছিল তার বিচিত্র ছন্দের বন্ধনে। কিন্তু সেই উচ্চারণরূপ তখনও সুনিয়ন্ত্রিত হতে পারে নি। এই অভাব বা অপূর্ণতাও প্রতিকলিত হয়েছে ওই কাব্যের ছন্দোরচনায়। ভাষার উচ্চারণরীতি-নিয়ন্ত্রণের উপবেই নির্ভর করে ছন্দের বীতিবৈচিত্র্য। এই ছন্দোবীতির বৈচিত্র্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে কতখানি প্রকাশ পেয়েছিল, অতঃপর সে প্রসঙ্গেই আসা যাক।

৩। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে ছন্দের বীতিবৈচিত্র্য

সংস্কৃত ছন্দেব দুই বীতি, বৃত্ত ও জাতি।—

পৃথং চতুস্পদী তচ্চ বৃত্তং জাতিবিত্তি দ্বিধা।

বৃত্তং অক্ষরসংখ্যাভং জাতিমাত্রাকৃতা ভবেৎ ॥

—‘ছন্দোমঞ্জরী’ ১।৪

‘বৃত্ত’ বীতির ছন্দ অক্ষরসংখ্যাত এবং ‘জাতি’ বীতিব ছন্দ মাত্রাসংখ্যাত। অক্ষর ও বর্ণ একার্থক শব্দ। তাই অক্ষর- বা বর্ণ- সংখ্যাত ছন্দ সাধারণতঃ ‘অক্ষরবৃত্ত’ ও ‘বর্ণবৃত্ত’ দুই নামেই অভিহিত হয়ে থাকে, আর মাত্রাসংখ্যাত ছন্দ সাধারণতঃ অভিহিত হয় ‘মাত্রাবৃত্ত’ নামে।

সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্রে অক্ষর বা বর্ণ বলতে ইংরেজি letterও বোঝায় না, syllableও বোঝায় না। যেমন, ‘ছন্দ’ শব্দে দুটি অক্ষর বা বর্ণ, ছ. ন্দ। বলা বাহুল্য, এ দুটি ইংবেজি letterও নয়, syllableও নয়। ইংবেজি letter অর্থে ‘হরফ’ ও syllable অর্থে ‘দল’ ব্যবহাব করলে বোঝাবাব সুবিধা হয়। ‘ছন্দ’ শব্দে হরফ দুটি নয়, পাঁচটি— ছ, অ, ন, দ, অ ; দল দুটি বটে, কিন্তু তাব রূপ স্বতন্ত্র— ছন্. দ।

বাংলায় ‘অক্ষর’ শব্দের অর্থ আরও অনিশ্চিত। যেমন, বাংলায় ‘পুণ্যবান্’ শব্দে ধরা হয় চার অক্ষর— পু. গ্য বা. ন্। অর্থাৎ স্থলবিশেষে-হস্ বর্ণও স্ববাস্ত বর্ণের সমান মর্যাদা পায়। বাংলায় ‘বপ্তানি’ শব্দে তিন অক্ষর, কিন্তু ‘আমদানি’ শব্দে চার। কারণ ‘মদ’-স্বচক কোনো যুক্তাক্ষর নেই। অথচ বলা বাহুল্য বপ্তানি ও আমদানি শব্দের ধ্বনিমূল্যে কোনো পার্থক্য নেই। ‘বপ্তানি’ না লিখে যদি লেখা হয় ‘বফতানি’ (এটাই ও শব্দের আসল রূপ), তা হলেই ও শব্দের অক্ষরসংখ্যা বেড়ে যাবে। কেন না, ‘কৃত’-স্বচক যুক্তাক্ষর নেই। তেমনি ‘গ্রেপ্তাব শব্দে তিন অক্ষর, কিন্তু ‘গ্রেফভার’ শব্দে চার। বলা বাহুল্য এরকম ‘অক্ষর’-গণনা অযৌক্তিক অর্থাৎ যথার্থ উচ্চারণবিভাগস্বচক নয়।

এসব কারণে বাংলায় অক্ষরের সংখ্যা অমুসারে ছন্দেব হিসাব রাখতে গেলে পদে পদেই ভ্রান্তি ঘটাব আশঙ্কা থাকে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেব ছন্দেব ক্ষেত্রে সে আশঙ্কা আরও বেশি। সে প্রসঙ্গে একটু পবেই ফিরে আসা যাবে।

যা হক, সংস্কৃত অক্ষরবৃত্ত রীতিব ছন্দ শুধু অক্ষবসংখ্যার উপবেই নির্ভব করে না। ওই রীতির অন্তর্গত প্রত্যেকটি ছন্দেব অক্ষবগুলি আবার লঘুগুরুভেদে নির্দিষ্ট প্রণালীতে সাজানো থাকে। বর্তমান প্রসঙ্গে সে রীতিব অধিকতব পরিচয় দেওয়া নিপ্রয়োজন। কেন না, বাংলায় সংস্কৃত পদ্ধতিতে অক্ষরবৃত্ত ছন্দেব প্রচলন নেই— এখনও নেই, চর্যাগীতি বা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেব আমলেও ছিল না।

‘জাতি’ রীতির ছন্দ মাত্রাসংখ্যাত বলেই তাকে ‘মাত্রাবৃত্ত’ বলা হয়। ‘মাত্রা’ মানে পরিমাপক, অর্থাৎ যে এককেব সংখ্যা অমুসারে কোনো কিছুব পরিমাপ করা হয়, সেই একক বা unitকে বলা হয় ‘মাত্রা’। বিভিন্ন ভাষার ছন্দে কিংবা একই ভাষার বিভিন্ন বীতিব ছন্দে বিভিন্নবকম মাত্রা থাকা সম্ভব। সংস্কৃত তথা প্রাকৃত ছন্দশাস্ত্রে একরকম মাত্রাই স্বীকৃত হয়। ও শাস্ত্রে একটি লঘুস্বরাস্ত বর্ণের উচ্চারণকালকেই ‘মাত্রা’ বলা হয়। এই মাত্রাব নামাস্তব ‘কলা’। বস্তুতঃ ‘মাত্রা’ শব্দেব অর্থ ‘কলা’ব চেয়ে ব্যাপকতর। তাই ‘কলা’ ও ‘মাত্রা’ শব্দকে একার্থে গ্রহণ না করে বিভিন্নার্থে প্রয়োগ কবাই সমীচীন। ‘কলা’ শব্দটিকে কালগত পরিমাপক অর্থাৎ কালমাত্রা অর্থে গ্রহণ কবে ‘মাত্রা’ শব্দটিকে সাধারণভাবে unit বা পরিমাপক অর্থে প্রয়োগ কবলে বাংলা ছন্দেব পরিচয় দেওয়া সহজ হয়। কেন না, বাংলায় বিভিন্ন রীতিব ছন্দেব মাত্রা বিভিন্ন প্রকার; কোনো বীতির ছন্দ গঠিত হয় কলামাত্রাব অর্থাৎ কলাসংখ্যার হিসাবে, আব অত্র বীতির ছন্দ গঠিত হয় দলমাত্রাব অর্থাৎ দলসংখ্যার হিসাবে।

অতএব কলাসংখ্যাত ও দলসংখ্যাত, এই দুই রীতিকে যথাক্রমে ‘কলামাত্রিক’ বা কলাবৃত্ত ও ‘দলমাত্রিক’ বা দলবৃত্ত নাম দিলে ওই দুই বীতির প্রকৃতিগত পরিচয়টা স্পষ্ট হয়। ফলে ওই দুই রীতির ছন্দেব পরিমাপককেও স্বভাবতই যথাক্রমে বলতে হয় ‘কলামাত্রা’ ও ‘দলমাত্রা’।

এ স্থলে বলা প্রয়োজন যে, সংস্কৃত জাতি বা মাত্রাবৃত্ত রীতির ছন্দও আসলে কলাবৃত্ত। কেন না, ও রীতিব ছন্দ কলামাত্রা অর্থাৎ কলামাত্রা নিয়েই গঠিত। প্রাকৃত মাত্রাবৃত্তও তাই। সংস্কৃত সাহিত্যে অক্ষবৃত্ত রীতিরই প্রাধান্য, তবে জাতি বা মাত্রাবৃত্তেব প্রয়োগ উত্তবোত্তর বাড়তে থাকে। এই ক্রমবর্ধমান প্রভাবেব পরিচয় সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় উত্তরকালীন প্রাকৃত ও অপভ্রংশ সাহিত্যে। অপভ্রংশজাত প্রাদেশিক ভাষাগুলিতে তাই মাত্রাবৃত্তেবই প্রাধান্য। অতত্র যা-ই হক, অন্ততঃ প্রাচ্যভাবতীয় ভাষাগুলিতে যে মাত্রাবৃত্তেবই একক আধিপত্য দেখা দিয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। আদিযুগেব বাংলাসাহিত্যে সংস্কৃত বা প্রাকৃত অক্ষবৃত্ত রীতিব ছন্দ অমুসরণেব লেশমাত্র চিহ্নও দেখা যায় না, মাত্রাবৃত্ত রীতি অমুসরণেব প্রয়াস সর্বত্র লক্ষণীয়। বাংলা চর্যাগীতিগুলিতেই তার নিদর্শন আছে। তার

পবেও দীর্ঘকাল ধবে এই মাত্রাবৃত্তেব আদর্শ বাংলা ছন্দেব বিবর্তনে সহায়তা কবেছে। এই বিবর্তনেব প্রথম দুই স্তরের পরিচয় বহন কবেছে চর্যাগীতিগুলি আব শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য। কিন্তু সে প্রসঙ্গে আসার আগে বাংলা ছন্দাবীতিগুলির একটু পরিচয় দেওয়া দবকাব।

প্রাচীন ভারতীয় ছন্দের প্রধান বিভাগ দুটি, বৈদিক ও লৌকিক।—‘ছন্দো দ্বিবিধঃ, বৈদিকং লৌকিকঞ্চ।’ বেদোক্তব সংস্কৃত ছন্দমাত্রই লৌকিক বর্গের অন্তর্গত। তেমনি বাংলা ছন্দেবও দুটি প্রধান ধাবা, সাধু ও লৌকিক। ছেলেভুলানো ছড়া, বাউলের গান, লোচনদাসের ধামালি, রামপ্রসাদের গান প্রভৃতি লোকসাহিত্যের প্রধান বাহন বাংলা লৌকিক রীতির ছন্দ। রামপ্রসাদের (১৭২০-৮১) রচনা থেকে দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

১। প্রসাদ ভণে | ভর্ষা মনে | বাপ তো নহেন | মিথ্যাবাদী।

ঠেকে বারে বাবে | খুব চেতেছি | আর কি এবার | কাঁদে পা দি ॥

২। মন রে কৃষি | -কাজ জান না।

এমন মানব-জমিন | রইল পতিত, | আবাদ করলে | ফলতো সোনা ॥

৩। বল মা তারা | দাঁড়াই কোথা।...

ওমা, যে জন তোমাব | নাম করে তার | হাড়মালা আর | ঝুলি কাঁথা ॥

৪। আমি কি ছুঃ | -খেবে ডরাই...

দেখ সুখ পেয়ে লোক | গর্ব কবে, | আমি কবি। | দুখের বড়াই ॥

লোচনদাসের রচনা থেকেও একটা দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করছি।—

মনে প্রাণে | মৈল ধনী, | রূপে মনপ্রাণ | টানে।

ছনছনানি | মনে লো সহ, | ছটফটানি | প্রাণে ॥

কিসের রাঁধন | কিসেব বাড়ন | কিসেব হলুদ | -বাটা।

আঁখির জলে | বুক ভিজিল | ভেসে গেল | পাটা ॥

আধুনিক কালে এই বীতিব ছন্দ লোকসাহিত্যেব আসর থেকে সাধু সাহিত্যের আসরে স্থান পেয়েছে রবীন্দ্রনাথের প্রচেষ্টায়। তাঁর ‘ঋণিকা’ কাব্যে (১৯০০) এই রীতির প্রথম সূচু ও ব্যাপক প্রয়োগ দেখা দেয়। রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সের রচনা থেকে একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

ওরে পাখি,

থেকে থেকে | ভুলিস কেন | সুব,

যাস নে কেন | ডাকি।...

অরুণ-আলোব | প্রথম পবন | গাছে গাছে | লাগে,

কাঁপনে তার | তোয়ি যে সুর | পাতায় পাতায় | জাগে।

—‘শেষলেখা’, ৩-সংখ্যক কবিতা (১৯৪১)

চলতি ভাষায় রচিত এই-লৌকিক রীতির ছন্দের ধ্বনিপ্রকৃতি বিশ্লেষণ কবলে দেখা যাবে,

এই রীতির ছন্দে মুক্তকল্পনির্বিশেষে প্রত্যেকটি দলই এক-এক মাত্রা বলে গণ্য হয়। তাই ছন্দব্যাকরণের পরিভাষায় এই রীতিকে বলা যায় ‘দলমাত্রিক’ বা ‘দলবৃত্ত’ (syllabic) বীতি।

বাংলা সাহিত্যে এই রীতির প্রথম প্রয়োগ দেখা যায় লোচনদাসের (ষোড়শ শতক) রচনায়। আরও দেখা যায় যে, এই রীতির ছন্দ তখনই বেশ জুগুপ্সিতরূপ ধারণ করেছে। সূতবাং ষোড়শ শতকের বহু পূর্বেই যে লোকসাহিত্যের রচনায় এই রীতির উদ্ভব হয়েছিল তাতে সন্দেহ করা যায় না। লোচনদাসের পূর্বকালে এই রীতির অস্তিত্বের প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া না গেলেও তার কিছু আভাস পাওয়া যায় চর্যাগীতিগুলিতেই।

ভবণই | গহণ গম্ | -ভীব বেগে | বাহী,
 দু আন্তে | চিখিল | মার্বো ন | থাহী ॥...
 সাঙ্কমত | চড়িলে | দাহিণ বাম মা | হোহী,
 নিয়ড্ডী | বোহি | দূর মা | জাহী ॥
 জই তুম্হে | লোঅ হে | হোইব পাব | -গামৌ,
 পুচ্ছতু | চাটিল | অমুস্তর | সামী ॥

—চর্যাগীতি ৫

এটি মাত্রাবৃত্ত (আধুনিক পরিভাষায় ‘কলামাত্রিক’ বা ‘কলাবৃত্ত’) বীতিতে রচিত। প্রতি পর্বে চাব মাত্রা। হ্রস্বস্বরাস্ত মুক্তদলে এক মাত্রা এবং দীর্ঘস্বরাস্ত মুক্তদলে তথা কল্পদলে দুই মাত্রা গণনীয়। কিন্তু ছন্দ বাঁচিয়ে অর্থাৎ প্রতি পর্বে চার মাত্রা রেখে পড়তে গেলেই দেখা যাবে, এখানে অনেক স্থলেই উক্ত গণনাপ্রণালীর ব্যতিক্রম ঘটেছে।—

এক ॥ অনেক স্থলেই দীর্ঘস্বরের হ্রস্ব উচ্চারণ হয়েছে। যেমন, প্রথম পংক্তির তৃতীয় পর্বে তিনটি দীর্ঘস্বরই হ্রস্বরূপে উচ্চার্য।

দুই ॥ স্বরাস্ত ও ব্যঞ্জনাস্ত, উভয়বিধ কল্পদলেরই সংকোচন ঘটেছে কয়েক স্থানে। যেমন— গই এবং জই শব্দের কল্পদল দ্বিমাত্রিক বটে, কিন্তু হোইব শব্দের হোই একমাত্রিক। এরূপ ক্ষেত্রে উত্তরকালে হোইব না লিখে লেখা হত হৈব। গন্তীব, সাঙ্কমত, তুম্হে এবং অমুস্তর, এই চারটি শব্দে ব্যঞ্জনাস্ত কল্পদলের (গম্, সাঙ, তুম্, হুং) সংকোচন ঘটেছে। এগুলি সবই শব্দের মধ্যবর্তী। দাহিণ ও বাম শব্দের অন্তস্থিত কল্পদলও এখানে সংকুচিত (অর্থাৎ একমাত্রিক) রূপে উচ্চার্য।

এ স্থলে বলা প্রয়োজন যে, ‘চিখিল’ শব্দের একটি হ্রস্ব স্বর (সম্ভবতঃ মধ্যেরটি, কাবণ শব্দটির পূর্বতন রূপ হচ্ছে চিখিল) এবং ‘বোহি’ শব্দের ইকাব দ্বিমাত্রিকরূপে উচ্চার্য ছন্দেব খাতিবে। হ্রস্ব স্বরের এরকম দীর্ঘ উচ্চারণ বাংলাভাষার স্বভাবসংগত নয়। কাজেই এরকম প্রয়োগকে ছন্দোপগত ভ্রুটি বলেই মানতে হয়।

পঞ্চান্তরে ঐতিহ্যগত দীর্ঘ স্ববেব হ্রস্বতা এবং স্বরাস্ত বা ব্যঞ্জনাস্ত কল্পদলের সংকোচন বাংলা লৌকিক উচ্চারণসম্মত অর্থাৎ বাংলাভাষার স্বভাবসংগত। লৌকিক রীতির ছন্দে

বাংলাভাষার স্বাভাবিক উচ্চারণ সর্বতোভাবেই স্বীকৃত হয়। তাই এই রীতির ছন্দকে ববীন্দ্রনাথ বলেছেন ‘বাংলাভাষার স্বাভাবিক ছন্দ’।

চর্যাগীতির উদ্ভূত দৃষ্টান্তটিতে চিরাগত সংস্কৃত তথা প্রাকৃত-অপভ্রংশ বীতি অমুবর্তনের প্রয়াস স্পষ্ট। তথাপি অমুবর্তনের করুণ থেকে মাঝে মাঝে যে বিচ্যুতি ঘটেছে, তা হয়েছে বাংলাভাষার স্বাভাবিক উচ্চারণের আকর্ষণে। বোঝা যাচ্ছে, চর্যাগীতির যুগেও বাংলা লৌকিক উচ্চারণ নিষ্ক্রিয় বা শক্তিহীন ছিল না। সংস্কার ও স্বভাবের এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তখনও সংস্কারই ছিল প্রবলতর। কিন্তু স্বভাবের শক্তি কালক্রমে প্রবলতর হয়ে সংস্কারকে হঠিয়ে দিতে থাকে। তার পবিচয় পাওয়া যায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ছন্দে।

বাংলা ছন্দের সংস্কৃত আদর্শ হিসাবে শংকবাচার্যের ‘মোহমুদগর’ থেকে কয়েকটি বহুখ্যাত পংক্তি উদ্ধৃত করা যাক,—

অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং ।
নাস্তি ততঃ স্তম্ভলেশঃ সত্যম ॥
পুত্রাদপি ধনভাজাং ভীতিঃ ।
সর্বদ্রেষা কথিতা নীতিঃ ॥ ২ ॥

মা কুরু ধনজনবোজনগর্বম্ ।
হবতি নিমেষাং কালঃ সর্বম্ ॥ ৪ ॥

নলিনীদলগতজলমতিতবলম্ ।
তদ্বজ্জীবনমতিশয়চপলম্ ॥ ৫ ॥

এ ছন্দের শাস্ত্রীয় নাম ‘পাদাকুলক’ বা ‘পজ্জটিকা’। সংস্কৃত সাহিত্যে অমৃৎপু-এব যে স্থান, উত্তরকালীন প্রাকৃত-অপভ্রংশ সাহিত্যে এই পাদাকুলক ছন্দ প্রায় সেই স্থানেরই অধিকারী হয়। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যেও এই আদর্শেরই প্রাধান্য। চর্যাগীতিগুলিতেই তাব পবিচয় আছে। কিন্তু তখনই বাংলার স্বাভাবিক উচ্চারণের টানে ছন্দেব আদর্শচ্যুতি ঘটে থাকে, এ কথা আগেই বলা হয়েছে। এই আদর্শচ্যুতির নিদর্শন হিসাবে চর্যাগীতি থেকে পূর্বে যে অংশটুকু উদ্ধৃত হয়েছে, একটু মন দিলেই বোঝা যাবে সেটুকুও এই পাদাকুলক ছন্দেই রচিত। ঘন ঘন আদর্শচ্যুতিসম্মেও চর্যাগীতিগুলিতে পাদাকুলক ছন্দের নির্দোষ নিদর্শন একান্ত বিরল নয়। যেমন—

কাঁজা তরুবব | পঞ্চ বি ডাল- ।
চঞ্চল চীএ | পইঠো কাল- ॥ ১ ॥

অপণা মাংসেঁ হবিণা বৈরী ।
খনহ ন ছাডঅ ভুখু অহেরি- ॥
... ..
হরিণা হবিণির নিলঅ ণ জাগী ॥ ৬ ॥

সোনে ভরিলী করুণা নাবী।

... ...

বাহ তু কামলি গঅণ উবেসেঁ।

... ...

ধুন্টি উপাড়ী মেলিলি কাচ্ছি-।

বাহ তু কামলি সদগুরু পুচ্ছি- ॥ ৮ ॥

আজি ভুস্কু বঙ্গালী ভইলী।

গিঅ ঘরিলী চণ্ডালী লেলী ॥ ৪৯ ॥

আর দৃষ্টান্ত বাড়াবার প্রয়োজন নেই। এবকম সম্পূর্ণ নির্দোষ পংক্তির চেয়ে প্রায়-নির্দোষ অর্থাৎ কিছু-না-কিছু খুঁত আছে এমন পংক্তির সংখ্যা আরও বেশি। এরকম প্রায়-নিখুঁত কয়েকটি দৃষ্টান্তও এখানে দেওয়া গেল।—

আদণ | ঘরপণ | জুন তো বি | -আতী।

কানেট | চৌরেঁ | নিল অধ | -রাতী ॥

সজুরা | নিদ গেল | বহুড়ী | জাগঅ।

কানেট | চোবে নিল | কা গই | মাগঅ ॥ ২ ॥

কাহু | বিলসই | আসব | -মাতা।

সহজ ম | -লিনীবন | পইসি নি | -বিতা ॥ ৯ ॥

কমলকু | -লিশ মাঝে | ভই ম মি | -অলী।

সমতা | -জোএঁ | জলিঅ চণ | -ডালী ॥ ৪৭ ॥

একটু মন দিয়ে শুনলে ‘নিদ গেল,’ ‘চোরে নিল,’ ‘সহজ নলিনীবন,’ ‘কমলকুলিশ মাঝে’ প্রভৃতি নানা স্থানেই বাংলাব স্বাভাবিক ধ্বনি কানে আসবে। মনে রাখা উচিত যে, চর্যাগীতি-বচনাগুলির ছন্দোন্নয়ন নিঃসন্দেহে নির্ণয় করা সম্ভব নয়। কাবণ লিপিকবপ্রমাদ প্রভৃতি নানা কাবণে বাংলা ভাষার তৎকালীন ধ্বনিরূপ অনেকাংশেই প্রচ্ছন্ন হয়ে গেছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ছন্দ সম্বন্ধেও এ কথা কিছু-পরিমাণে প্রযোজ্য।

চর্যাগীতি ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মধ্যে কালের ব্যবধান কম নয়। তথাপি এ দুই মध्ये ছন্দোগত সাদৃশ্য থাকা কিছু বিচিত্র নয়। কারণ যে পূর্বতন ছন্দোধারা থেকে চর্যাগীতির ছন্দ উদ্ভূত, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ছন্দ তারই উত্তরকালীন পবিগতি। দৃষ্টান্ত দিলেই বিষয়টা স্পষ্ট হবে।—

নী-লজলদম | কু-স্তলভা-রা-।

বেকত বিজুলি শোভে | চ-ম্পকমা-লা- ॥

শিশত শোভএ'তোর | কামসি-ন্দু-র ।

প্রভাত সমএ যেন | উয়ি গেল স্ন-র ॥

—দানখণ্ড, পা ৩৪।১

সহজেই বোঝা যায়, এ ছন্দের আদর্শ হচ্ছে সংস্কৃত-প্রাকৃত মাত্রাবৃত্তবর্গের পাদাকুলক বা পজ়াটিকা ছন্দ । কিন্তু আদর্শচ্যুতি ঘটেছে বারেবারেই । সাত জায়গায় (নীল, ভাৱা, মালা, দূর, স্নর) দীর্ঘস্বরের দ্বিমাত্রকতা মানা হয়েছে বটে, কিন্তু তাব চেয়ে বেশিসংখ্যক স্থানে মানা হয় নি । কুন্তল, চম্পক এবং সিন্দূব শব্দের রুদ্ধ দলগুলিব (কুন্, চম্, সিন্) উচ্চারণও দীর্ঘায়ত অর্থাৎ দ্বিমাত্রক । কিন্তু ওই চার পংক্তির পবেই আছে—

ললাটে তিলক য়েছ | নবশশিকলা ।

কুণ্ডলমণ্ডিত চারু | শ্রবণযুগলা ॥

এখানে সবগুলি দীর্ঘস্বব ও রুদ্ধদলই একমাত্রক বলে গণ্য হয়েছে । এখানে পাদাকুলকের সম্পূর্ণ আদর্শচ্যুতি ঘটেছে । আর এই দুই পংক্তি যে আদর্শ পয়ারপংক্তি, তা বোধ করি বলাই নিশ্চয়োজন । এব থেকে সহজেই বোঝা যায়, প্রাচীন পাদাকুলক ছন্দই আদর্শ-শ্রষ্ট হয়ে বাংলা পয়ারে পরিণত হয়েছে । আব এটা হল লৌকিক বাংলার স্বাভাবিক উচ্চারণ-প্রভাবের অনিবার্য পরিণাম । অতএব এ কথা বোধ করি সাহস করেই বলা যায় যে, এক দিকে প্রাচীন রীতি অপর দিকে লৌকিক রীতি, এই দুই রীতির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াব ফলেই উদ্ভূত হয়েছে উভয়ের মধ্যবর্তী বাংলা সাধু রীতির আদর্শ ।

চর্যাগীতিগুলিতে আদর্শ পাদাকুলকের দৃষ্টান্ত মাঝে মাঝে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তার সংখ্যা বেশি নয় । অর্থাৎ চর্যাগীতি রচনায় আদর্শভাঙা পাদাকুলকের দৃষ্টান্তই সংখ্যায় বেশি । পক্ষান্তরে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে নিখুঁত পাদাকুলকের দৃষ্টান্ত প্রায় নেই । ভাঙা-পাদাকুলকের দৃষ্টান্তও অপেক্ষাকৃত বিরল এবং সে দৃষ্টান্তগুলিতে খুঁতেব পরিমাণও অপেক্ষাকৃত বেশি । ‘নীলজলদসম কুন্তল ভাৱা’ ইত্যাদি চাব পংক্তি প্রচুর খুঁত সত্ত্বেও মূল আদর্শের খুবই কাছাকাছি এসেছে, অল্প ভাঙা দৃষ্টান্তগুলি আরও দূর্বর্তী । যেমন—

থলকমল জিগী | তোক্ষাব চরণে ।

বা-জহ-ংস জিগী | তোক্ষার গমনে ॥

—দানখণ্ড, পা ২৪।২

কা-ল আখবে' তীন | ভুবনবিচার ।

কা-ল মেঘেব জলে | জীএ সংসার ॥

—দানখণ্ড, পা ৪৭।২

চু-ন বিহনে য়েছ | তা-মূল তিতা ।

আলপ বএসে তেহু | বিরহের চিন্তা ॥

—ভাবখণ্ড, পা ৮৯।২

কা-ল কোকিল রএ | কাল বৃন্দাবনে ।

এবে' কাল হৈল মোকে | নামেব নন্দনে ॥

প্রাণ আকুল ভৈল | বাঁশীর নাদে ।

এবেঁ আসিআঁ কাহাঞিঁ | দবশন নাদে ॥

—বংশীখণ্ড, পৃ ১৭৪।২-

নানা মণি অলংকার | শোভিত শরীরে ।

পী-ত বসন শোভে | বাঁশী ধবে করে ॥

—জন্মখণ্ড, পৃ ৫।১

কাঁচ কনয়া য়েহু | দেহেব বরণ ।

কণ্ঠ কহু মণিগণ | শোভএ দর্শন ॥

—দানখণ্ড, পৃ ৩৪।২

বা-হু মৃণাল | কমল কবে ।

এগার ল-ক্ষ | দান তাহারে ॥

—দানখণ্ড, পৃ ২৮।১

এরকম আবও অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু আর প্রয়োজন নেই। বাংলা উচ্চারণের স্বাভাবিক আলোচনায় দ্বিমাত্রক রুদ্রদলের যেসব দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হয়েছে, বর্তমান প্রসঙ্গে সেগুলিও স্মরণীয়। তাই এখানে প্রধানতঃ সংস্কৃত দীর্ঘস্বরের দ্বিমাত্রকতার দৃষ্টান্তই দেওয়া হল। এই উভয় শ্রেণীর দৃষ্টান্ত থেকে সহজেই বোঝা যাবে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেব যুগে প্রাচীন রীতি কতখানি ক্ষীণ হয়ে এসেছিল। বস্তুতঃ এই দৃষ্টান্তগুলিকে প্রাচীন রীতির জীর্ণাবশেষ বলেই স্বীকার করতে হয়। চর্যাগীতির রচনায় প্রাচীন রীতিরই প্রাধান্য, নবীন রীতির অর্থাৎ বাংলার স্বাভাবিক উচ্চারণবীতির প্রভাব তখনও অতি ক্ষীণ। আর শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে দেখা যায়, প্রাচীন সাধু রীতিকে পবাভূত করে নবীন লৌকিক বীতিই জয়ী হয়েছে। তার ফলেই প্রাকৃত পাদাকুলক চন্দ্র রূপান্তরিত হল বাংলা পয়ারে। এই পয়ারই হল সংস্কারের উপরে স্বভাবের জয়লাভের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। পয়ারের বহু দৃষ্টান্ত পূর্বে উদ্ধৃত হয়েছে। আদর্শ পয়ারের আর-একটি দৃষ্টান্ত এখানে উদ্ধৃত করা গেল।—

সব দেবের মেলি সভা | পাতিল আকাশে ।

কংসেব কারণে হএ | স্থষ্টিব বিনাশে॥

—জন্মখণ্ড, পৃ ৩।১

সংস্কার ও স্বভাব, প্রাচীন ও নবীন। এই দুই বিপরীত পক্ষের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলেই বাংলা পয়ারেব উদ্ভব। অর্থাৎ প্রাচীন প্রাকৃত পাদাকুলকেরই নবীন বাংলা রূপ এই পয়ার। কিন্তু লৌকিক বাংলা উচ্চারণের শক্তিপরীক্ষা এখানেই শেষ হয় নি। স্বভাবের প্রবর্তনা তাকে চালিত করল আবও পবিবর্তনের দিকে। পূর্বে যাকে বলেছি ‘আদর্শ পয়ার’, উত্তরকালে তাই স্বীকৃতি লাভ করেছিল সাধু পয়ার বলে, সাধু সাহিত্যের প্রধানতম বাহন-রূপে। পূর্বে বলেছি সংস্কৃত সাহিত্যে অমৃষ্টপুং ছন্দের যে স্থান, উত্তরকালীন প্রাকৃত-অপভ্রংশ সাহিত্যে সেই স্থানের অধিকারী হয় পাদাকুলক বা পঙ্কটিকা ছন্দ। আবও উত্তরকালে বাংলা সাহিত্যে সেই স্থান

অধিকার কবে এই সাধু পয়াব। সাধু পয়ারের প্রথম স্পৃহিত নিদর্শন পাওয়া যায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে। তার পূর্বে পয়ারের রূপ কেমন ছিল তা জানা যায় নি। কারণ চর্যাগীতি ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মধ্যবর্তী যুগে বাংলা ছন্দোবিবর্তনের ইতিহাস রচনার কোনো নির্ভরযোগ্য উপাদান এখনও আবিষ্কৃত হয় নি। কিন্তু ছন্দোবিবর্তনের ইতিহাস শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য পর্যন্ত এসেই থেমে যায় নি। বিবর্তনের পুর্বাগতি তখনও নিরন্তর হয় নি। কারণ বিবর্তনের গতিবেগ কখনও শেষ হয় রা। প্রত্যেক যুগেই ইতিহাসেই এক দিকে থাকে অতীতের উত্তরাধিকার, আর-এক দিকে থাকে ভবিষ্যতের সম্ভাবনা। এক দিকে প্রাচীনকে সংরক্ষণের প্রবণতা, অল্প দিকে নবীনকে বরণ করবার আগ্রহ, এই দুই বিপরীত শক্তির সমন্বয়ে ফলে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেব ছন্দ একটা বিশিষ্ট রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছিল। কিন্তু তখনও তা স্বভাবের ক্রমভূমির সাক্ষাৎ পায় নি। তাই তাব মধ্যে একটা অস্থিরতার চাঞ্চল্য দেখা যায়। পয়ারকে আশ্রয় কবেই তা দেখাতে চেষ্টা করছি।

দীর্ঘষবাস্ত মুক্তদল ও স্বরাস্তব্যঞ্জনাস্ত নির্বিশেষে কল্পদল-মাত্রেরই দ্বিমাত্রক উচ্চারণ প্রাচীন ভারতীয় রীতি, পক্ষান্তরে উক্ত উভয়প্রকার ধ্বনিকেই সংকুচিত করে একমাত্রক উচ্চারণের দিকেই বাংলা ভাষার প্রবণতা,—এ কথা প্রথমেই বলা হয়েছে। বাংলা উচ্চারণের এই স্বাভাবিক প্রবণতা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে অনেকাংশে স্বীকৃত হলেও পুর্বাণুবি স্বীকৃত হয় নি। পূর্বপ্রদত্ত দৃষ্টান্তগুলিতেই তার বহু নিদর্শন পাওয়া যাবে। ফলে এই কাব্যের ছন্দে প্রাচীন ও নবীন উভয় রীতির মিশ্রণ ঘটেছে। যথা—

ম-ন্দ পবন বহে | কালিনী 'নইতীরে'।

কাহাঞিঁ সোঁঅবী মোব | চিত নহে ধীবে ॥

এবেঁ 'আকুল' কৈলে মোবে | নান্দ্রের নন্দনে।

'গাইল' বড় চণ্ডীদাসে | বা-সলীগণে ॥

—বংশীখণ্ড, পা ১৭৫।১

মে-ষ আন্ধারী অতি | ভয়ঙ্কর নিশী।

একসরী রুরোঁ মো- | 'কদম'-তলে বসী ॥

—রাধাবিরহ, পা ১৯৯।২

ফুটিল 'কদমফুল' ভরে | নোঁআইল ডাল।

এভৌ গোকুলক 'নাইল' | বা-ল গোপাল ॥

—রাধাবিরহ, পা ২২২।২

এই দৃষ্টান্তগুলিতে প্রাচীন ও নবীন রীতির মিশ্রণ স্পষ্ট। বলা বাহুল্য, এই দৃষ্টান্ত-তিনটি পয়ারবন্ধে বচিত। এরকম মিশ্রণ থেকেই সাধু পয়ারের উৎপত্তি। পূর্বে 'নীল-জলদসম কুন্তলভারা' ইত্যাদি যে দৃষ্টান্তটি (দানখণ্ড, পা ৩৪।১) উদ্ধৃত হয়েছে, এ প্রশ্নে সেটি বিশেষভাবে অবগীত। কেননা, তার মধ্যেই সাধু পয়ারের উৎপত্তির ইতিহাস

ও তাব মিশ্রপ্রকৃতি সন্দেহাতীতরূপে ধরা পড়েছে। এটির প্রথম পংক্তিটি প্রাচীন পাদাকুলক বা পজ্জাটিকা ছন্দের একটি নিখুঁত নিদর্শন। তার পরবর্তী তিন পংক্তিতে ধ্রুতের পবিমাণ ক্রমে বেড়ে গিয়েছে। অর্থাৎ ওই তিন পংক্তিতে পাদাকুলকের লক্ষণ ক্রমে ক্রমে এসেছে। আর তার পরেব দুই পংক্তিতেই দেখা দিয়েছে তৎকালীন সাধু পয়ারেব আদর্শ (দ্রষ্টব্য পূর্ববর্তী পৃ ১৮-১৯)। সুতরাং বিগুহ পাদাকুলক থেকে ভাঙা পাদাকুলক এবং তার থেকে সাধু পয়ারেব উদ্ভব, তাতে সন্দেহেব আর অবকাশ নেই। কিন্তু এই সাধু পয়ারও যে মিশ্রপ্রকৃতিব ছন্দ তাতেও সন্দেহ নেই। উক্ত দুই পংক্তি যে শুধু তৎকালেব আদর্শ পয়ার বলে গণ্য তা নয়, আধুনিক কালেও তা আদর্শ বলে স্বীকৃতিযোগ্য। আধুনিক উচ্চারণে তার রূপ হবে এই—

ললাটে তিল-ক্ যেন | নব শশিকলা।

কুণ্ড-ল্ মণ্ডিত চারু | শ্রব-ণ্ যুগলা ॥

দেখা যাচ্ছে ল-ক্, ড-ল্ ও ব-ণ্ এই তিনটি শব্দান্তস্থ রুদ্রদলের দ্বিমাত্রক উচ্চারণ এবং কুণ্ ও মণ্ এই দুটি অপ্রান্তবর্তী রুদ্রদলের উচ্চারণ দ্বিমাত্রক। রুদ্রদলের এই দ্বিমাত্রকতা প্রাচীন বীতিরই ক্ষীণ অবশেষ, আব তাব একমাত্রক উচ্চারণ নবীন বীতির লক্ষণ। সুতরাং আধুনিক সাধু পয়ারও যে মিশ্রপ্রকৃতির ছন্দ তাতে সন্দেহ নেই। আর ভাঙা পাদাকুলক যে মিশ্র প্রকৃতির ছন্দ, সে কথা তো বলাই নিম্প্রয়োজন।

আধুনিক সাধু বীতিব বিশেষ লক্ষণ এই যে,—এই বীতিতে শব্দের অন্তিম রুদ্রদলেব উচ্চারণ দ্বিমাত্রক, অপ্রান্তিক রুদ্রদলেব উচ্চারণ একমাত্রক, আব দীর্ঘস্ববেব দীর্ঘতা কোথাও স্বীকৃত হয় না। যেমন—

নিজের-র্ সে, বিশ্বের-র্ সে, | বিশ্বদেবতা-র্।

সন্তান-ন্ নহে গো মাতঃ, | সম্পত্তি তোমা-র্ ॥

—ববীন্দ্রনাথ, ‘চৈতালি’, স্নেহগ্রাস

উচ্চারণেব এরকম অনিয়মিত নিয়ন্ত্রণ ত্রীকুণ্ডকীর্ডন রচনার সময়ে উদ্ভূত হয় নি। তাই তখনকার দিনের পয়াবে অনিয়ন্ত্রিত মিশ্রণ যথেষ্ট চলত। তার বহু দৃষ্টান্ত পূর্বেই দেওয়া হয়েছে। এরকম মিশ্রণ যে আধুনিক কালে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে তা নয়। এমন কি, মধুসূদন-ববীন্দ্রনাথের মত মহাছন্দশিল্পীর রচনাতেও তা অপ্রাপ্য নয়। যেমন মধুসূদনের রচনায় পাই—

নুপুংবের ‘বান্‌বানি’, | কিঙ্কিণীর বোলী।

... ..

অখপার্শ্বে কোষে অসি | বাজিল বন্থনি।

... ..

কি ‘যা-চঞা’ করি আমি | বামেব সমীপে।

—‘মেঘনাদবধ কাব্য’, তৃতীয় সর্গ

চন্দ্রচূড়-জটাজালে আছিল। যেমতি
জাহ্নবী, ভাবন্তরস ঋষি দ্বৈপায়ন
ঢালি 'সংস্কৃত'-হ্রদে। রাখিলা তেমতি।

—‘চতুর্দশদী কবিতাবলী’, কাশীরাম দাস
না হেরিয়া শ্যামচাঁদে
তোরও কি পবাণ কাঁদে,

‘তুই’ও কি দুঃখিনী।

—‘ব্রজাঙ্গনা কাব্য’, ময়ূরী

এবার রবীন্দ্রনাথ—

‘যুগা-স্তরের’ ব্যথা প্রত্যাহেব ব্যথাব মাঝারে
মিলায় অশ্রুর বাষ্পজাল।

—‘পূরবী’, অতীত কাল

‘চৌকির’ ভাষা যেন। আরো বেশি করুণ কাতব,
শূন্ততার মুক ব্যথা। ব্যাপ্ত করে প্রিয়হীন ঘর॥

—‘শেষলেখা’, ৪

অতীতেব পালানো স্বপন। আবার করিবে সেথা ভিড়,
অ-স্মৃট গু-ঞ্জন স্বরে। আরবাব রচি দিবে নীড়।

—‘শেষলেখা’, ৫

প্রত্যাহের সব ভালোবাসী

তারি আদি সোনার কাঠিতে। উঠেছে জাগিয়া...
করেছে সে ‘অ-স্বতম’। পবন করেছে ধারে।

—‘শেষলেখা’, ৭

মুক্তিসাধনাব পথে। তোমার ইঙ্গিতে

‘মাইভেঃ’ বাজে নৈরাশ্রি-নিশীথে।

—‘পরিশেষ’, দুয়াব

এসো, এসো, এসো, হে বৈশাখ।

তাপস, নিশ্বাসবায়ে

মুমূর্ষুরে ‘দাও’ উডায়ে,

বৎসবের আবর্জনা। দূর হয়ে যাক।

—‘নটরাজ-ঋতুরঙ্গশালা’, বৈশাখ-আবাহন

বসন্তে ‘নাগ’কেশরের স্নগন্ধে মাতাল

বিশ্বের জাহ্নবী মধ্যে রচে সে আপন ইন্দ্রজাল।

—‘আকাশপ্রদীপ’, নামকরণ

এই দৃষ্টান্তগুলিতে ঋ-ন্বনি, ষা-চ্ঞা, স-ংস্কৃত, যুগা-স্তরের, চৌকির, অ-স্মৃট, গু-ঞ্জন, অ-স্বতম এই কয়টি শব্দে অপ্রান্তিক রুদ্ধদলের দ্বিমাত্রকতা ঘটেছে। অন্তত তা হয় নি,

কেন না অপ্রান্তিক রুদ্ধদলের একমাত্রকতাই বাংলার স্বাভাবিক উচ্চাধনসম্মত এবং সাধু রীতির স্বীকৃত নিয়ম। পক্ষান্তরে তুই, মাঠে, দাও, নাগ এই চারটিমাত্র শব্দে অস্তিত্ব রুদ্ধদলের একমাত্রকতা ঘটেছে। সাধু রীতিব পক্ষে এটাও ব্যতিক্রম। আধুনিক বাংলা ছন্দে এই উভয়বিধ ব্যতিক্রমই অতীব বিরল। আসলে এই ব্যতিক্রমগুলি সাধু রীতির আদিম মিশ্রপ্রকৃতির শেষ নিদর্শন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে এরকম প্রয়োগেব দৃষ্টান্ত শুধু যে অজস্র তা নয়, রুদ্ধদলের উচ্চাধন ও প্রয়োগ তৎকালে একেবারেই অনিয়ন্ত্রিত ছিল। এই অনিয়ন্ত্রণ চলেছিল দীর্ঘকাল। অবশেষে ভারতচন্দ্র (১৭০৬-৬০) এসে এ ছন্দকে নিয়ন্ত্রিত কবলেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তিনি বাংলাভাষাব ধ্বনিস্বভাবের অহুর্বর্তী না হয়ে আব-এক প্রাচীন সংস্কারেব বশবর্তী হলেন। সংস্কৃত বৃত্ত রীতির অম্লসবণে বাংলা ছন্দকে অক্ষর-সংখ্যাব নিগড়ে বেঁধে তাকে নিয়ন্ত্রিত কবলেন। এইভাবেই উদ্ভূত হল 'বাংলা অক্ষরবৃত্ত' রীতি। তাতে বাংলা ছন্দ নিয়ন্ত্রিত হল বটে, কিন্তু বাংলাভাষার ধ্বনিপ্রকৃতিও অনেকাংশে গীড়িত ও আড়ষ্ট হল। কারণ, পূর্বেই বলেছি বাংলায় অক্ষর বলতে শব্দের দল বা হবফ এবং অবস্থাভেদে দুই-ই বোঝায়। ফলে শব্দের ধ্বনিমূল্য ও অক্ষরসংখ্যাগত মাত্রার মূল্য সমতা থাকে না, তাই অনেক সময় একই ধ্বনিমূল্যের শব্দ দুইরকম মাত্রামূল্য পায়। যেমন— হইল-তৈল, বউটি-গৌরী, চাকরি-চক্রী। এই অসমতা সবচেয়ে বেশি প্রকাশ পায় বাংলা রুদ্ধস্বরের বেলায়। আমরা দেখেছি বাংলা রুদ্ধস্বরের সংখ্যা সংস্কৃতের চেয়ে অনেক বেশি। কিন্তু বাংলা 'অক্ষরবৃত্ত' রীতিতে এই ধ্বনিসম্পদের সমস্ত মূল্যই অস্বীকৃত হল। এই হিসাবে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ছন্দ অল্পদাম্পলেব চেয়ে অগ্রবর্তী ছিল, এ কথা বোধ করি অযৌক্তিক বলে গণ্য হবে না। কেন না, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সময়ে অক্ষরগণনার ভ্রান্ত সংস্কার ছিল না। ফলে ওই কাব্যে শৈল, নৌকা, পাইল, বুইল প্রভৃতি শব্দকে একই মাত্রামূল্য দিতে কোনো দ্বিধা ছিল না।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন বচনাব সময়ে অপ্রান্তিক স্বরাস্ত রুদ্ধদলের সংকোচনে কোনো দ্বিধা ছিল না। যুক্তাক্ষরচিহ্নিত, ব্যঞ্জনাস্ত-রুদ্ধদলেব (যেমন—স্ব. টি, চিন্তা, কং.স) সংকোচনের নীতিও ছিল সুপ্রচলিত। শব্দমধ্যবর্তী অযুক্ত রুদ্ধদলের প্রচলন তখন ছিল কিনা নিঃসন্দেহে বলা যায় না। কিন্তু তার একটা প্রবণতা তখনই দেখা দিয়েছিল বলে মনে হয়। নইকুলে, বুইল, জাইব, মাউলানী এবং মন্দ, ওষ.ঠ, দীর্ঘ স্ব প্রভৃতি শব্দের রুদ্ধদল-সংকোচনে অভ্যস্ত কবিব পক্ষে চলতে, করবে, আসবে প্রভৃতি রুদ্ধদলের সংকোচন ঘটানো অপ্রত্যাশিত নয়। এইজাতীয় দৃষ্টান্ত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের যুগে উদ্ভূত না হলেও তার সম্ভাবনা বোধ করি তখনই দেখা দিয়েছিল। কোনো কোনো পংক্তির রচনাভঙ্গি থেকেই এই অনুমান হয়। যেমন—

লা-গ পায়িলে তাক | 'বুলিহ' কাকু করী।

গোআলি বিকলী হৈল | বনে একসরী ॥

মনে হয় এখানে ‘বুলিহ’ (>বুলিঅ>বুইল্ও >বুইলো=বলো) শব্দের দ্বিমাত্রক উচ্চারণই অভিপ্রেত ছিল। এ প্রসঙ্গে করিল>কয়িল>কইল বা কৈল, মাবিল>মায়িল>মাইল প্রভৃতি পরিবর্তনের কথাও স্মরণীয়। বলা বাহুল্য, এগুলি ধ্বনি-সংকোচনেরই নিদর্শন।

পূর্বৈ ছয় গর্ভ তার | ‘মায়িল’ কংশাসুরে।

তাক স্ন’অরী দৈবকী | কাঁপে বড় ডবে ॥

—জম্মখণ্ড, পা ৪।১

এখানে ‘মায়িল’ শব্দের রূপান্তর মায়িল বা মাইল দ্বিমাত্রক বলেই স্বীকৃত হয়েছে।

মুছিআঁ পেলায়িবৌ বড়ায়ি | শিষের সিন্দূব।

বাহয় বলয়া মো- | ‘কবিবৌ’ শঙ্খচূর ॥

—রাধাবিরহ, পা ২২৩।১

আন্ধা মাইলৈ বড়ায়ি কি | ‘পূরিবৈ’ কাহ্নের আশে।

বা-সলী শিরে বন্দী | গাইল চণ্ডীদাসে ॥

—বাগধণ্ড, পা ১৬০।২

মো- যবৈ জাণৌ তোর | হেন দুষ্ট মতী।

তবে কেহে ‘আসিবৌ’ মো- | তোন্ধার সংহতী ॥

—তাম্বুলখণ্ড, পা ১২।২

প্রথম দৃষ্টান্তে পেলায়িবৌ (= পেলাইবৌ) ও বড়ায়ি (= বড়াই) যথাক্রমে ত্রিমাত্রক ও দ্বিমাত্রক। দ্বিতীয় দৃষ্টান্তের মাইলৈ ও বড়ায়ি (= বড়াই) যথাক্রমে দ্বিমাত্রক ও ত্রিমাত্রক; গাইল দ্বিমাত্রক। বা-সলী চতুর্মাত্রক এবং মো- তিন স্থলেই দ্বিমাত্রক। এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় ‘কাহ্নের’ শব্দের দ্বিমাত্রক প্রয়োগ। তা ছাড়া করিবৌ, পূরিবে এবং আসিবৌ শব্দের উচ্চারণরূপও সম্ভবতঃ যথাক্রমে কইরবৌ, পুইরবে ও আইসবৌ অর্থাৎ দ্বিমাত্রক। অন্ততঃপক্ষে এই শব্দগুলির প্রয়োগপদ্ধতি থেকে অনুমান করা অসংগত নয় যে, এগুলির উচ্চারণপ্রবণতা দ্বিমাত্রকতাব দিকেই। লোচনদাসের কালে এসব শব্দের দ্বিমাত্রকতা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল, সুতরাং বড় চণ্ডীদাসের কালে সে প্রবণতার সূত্রপাত হওয়া বিচিত্র নয়।

উপরের দৃষ্টান্তগুলি থেকেও তৎকালীন ছন্দের মিশ্র প্রকৃতি সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়। কোন্ কোন্ উপাদানের মিশ্রণ, তার পরিচয় দেওয়া যাবে একটু পবেই। তাব আগে সেকালের উচ্চারণ ও তার প্রয়োগ সম্বন্ধে আর-একটি কথা বলা প্রয়োজন।

আমরা দেখেছি রুদ্রদলেব সংকোচনই বাংলা লৌকিক উচ্চারণের স্বাভাবিক প্রবণতা। আবও দেখেছি যে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ছন্দেও এই স্বাভাবিক প্রবণতাকে বহুলাংশেই মেনে নেওয়া হয়েছে এবং এই ব্যাপারে বড় চণ্ডীদাস কোনো কোনো অংশে ভারতচন্দ্রের অগ্রবর্তীই ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রচনায় স্বরাস্ত রুদ্রদল শব্দের অন্ত ও মধ্য সর্বত্রই সমভাবে প্রসারিত ও সংকুচিত-রূপে প্রযুক্ত হয়ে থাকে। কিন্তু হসন্ত রুদ্রদলেব সংকুচিত প্রয়োগ প্রধানতঃ শব্দের মধ্যেই দেখা যায় এবং তাও সাধাবণতঃ পরবর্তী বর্ণের সঙ্গে যুক্তরূপে—যেমন, শঙ. খ. ব. সন্. ত। তা ছাড়া পূর্বে, আসির্বো প্রভৃতি শব্দে সংকুচিত রুদ্রদলের আভাসও অপ্রাপ্য নয়। শব্দান্তে হসন্ত রুদ্রদলের সংকুচিত প্রয়োগের দৃষ্টান্তও আছে, কিন্তু অপেক্ষাকৃত বিরল। এরকম প্রয়োগের কিছুকিছু দৃষ্টান্ত আগেই দেওয়া হয়েছে; একটু আগেই ‘কাহ্নেব’ শব্দে এরকম প্রয়োগ দেখা গিয়েছে। এখানে আরও একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল।—

মোঞে ভালো | জাণো তোক | ‘নিঠূ’ ভৈল | কাহ্ন।

এ জরমে | নাইসে আর | তো-স্কার | ধান ॥

—বাধাবিবহ, পা ২১২।২

নাই স্বরাস্ত রুদ্রদল এবং ঠূ হসন্ত রুদ্রদল। একটি আছে শব্দের আদিতে, অল্পট অস্তে। দুটিই সংকুচিত অর্থৎ একমাত্রক। এভাবে শব্দের আন্তঃনির্বিশেষে স্বরাস্ত ও হসন্ত রুদ্রদলের সার্বত্রিক একমাত্রক প্রয়োগই হল লোচনদাস-রামপ্রসাদের প্রযুক্ত লৌকিক রীতির ছন্দের বিশিষ্টতা। এই বিশিষ্ট বীতির স্পষ্ট প্রয়োগ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে নেই। কিন্তু তার আভাস আছে নানা স্থানেই। উপরের দৃষ্টান্তটিই তাব অল্পতম নিদর্শন। লৌকিক বীতির আর-এক বিশিষ্টতা চার-চার মাত্রায় পর্ববিভাগ। এই দৃষ্টান্তটিতে সে লক্ষণও স্পষ্ট। ‘আর’, ‘তোস্কার’ এবং ‘ধান’ শব্দের অকারান্ত উচ্চারণ; কিন্তু ‘তোস্কার’ শব্দের ‘তোম্’ দলটির দ্বিমাত্রক উচ্চারণ লৌকিক রীতি-বিরুদ্ধ। এই দৃষ্টান্তটিকে পুর্বোপরি লৌকিক রূপ (আধুনিক) দিলে দাঁড়াবে এরকম।—

আমি ভালোই | জানি তোমায় | নিঠূর হল | কানাই।

এই জনমে | ভোব সে ঠাই আর | নেই তা তোবে | জানাই ॥

লৌকিক রীতির আভাসেব আরও দু'একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

পাকিল দাটী | মাথার কেশ।

বামন শবীব | মাকড় বেশ ॥

—জন্মখণ্ড, পা ৩।১

বিকট দন্ত | কপট বাণী।

ওঠ আধর | উঠক জিগী ॥

—জন্মখণ্ড, পা ৫।২

আমরা দেখলাম প্রাচীন রীতিব বিগুহ পাদাকুলক থেকে ভাঙা পাদাকুলক এবং তার থেকে বাংলা সাধু পয়ার উৎপন্ন হয়েছে। এই সাধু পয়ারও আসলে একটি মিশ্র প্রকৃতির ছন্দ। শব্দমধ্যস্থ রুদ্ধদলের সংকোচন ও শব্দান্তিক রুদ্ধদলের প্রসারণ, এই সাধারণ নীতিব উপবেই সাধু পয়ারেব প্রতিষ্ঠা। অবশ্য তাব কিছুকিছু ব্যতিক্রমও দেখা যায়। কিন্তু ব্যতিক্রমগুলি ব্যতিক্রমই, সাধারণ নীতি নয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেব সুগে এই সাধারণ নীতি অনেকাংশে স্বীকৃত হয়েছিল বটে, কিন্তু তা স্থিরতা লাভ করতে পারে নি। এক দিকে প্রাচীন রীতি ও অত্র দিকে লৌকিক রীতির আকর্ষণে এই সাধু রীতি নিয়তই এদিকে -ওদিকে বিচলিত হচ্ছিল।

আধুনিক কালে গান বচনায় (যথা রবীন্দ্রনাথের জনগণমন-অধিনায়ক, দেশ দেশ নন্দিত করি, মাতৃমন্দির পুণ্য অঙ্গন) অনেক সময় বিগুহ প্রাচীন বীতি অহুত হয়, কোনো কোনো গানে অবশ্য ভাঙা প্রাচীন বীতিও চালানো হয়। প্রাচীন বীতির প্রধানতম লক্ষণ দীর্ঘস্বরের দ্বিমাত্রকতা স্বীকার। এই প্রাচীন রীতির পাবিভাষিক নাম 'প্রত্ন মাত্রাবৃত্ত' বা 'প্রত্ন কলাবৃত্ত'। দীর্ঘস্বরের দ্বিমাত্রকতা সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে গিয়ে শুধু রুদ্ধদলের সংকোচন ও প্রসারণের যোগে যে নূতন বীতির উদ্ভব হল তাকেই বলেছি 'সাধু রীতি'। এই সাধু বীতির পারিভাষিক নাম 'মিশ্রকলাবৃত্ত'। লোচনদাসের কালে কিংবা তাব কিছু আগেই বাংলা লোকসাহিত্যে রুদ্ধদলের সার্বত্রিক সংকোচনের ফলে যে নূতন ছন্দোবীতি উদ্ভূত হল তাকে বলেছি 'লৌকিক রীতি'। পাবিভাষিক নাম 'দলবৃত্ত'। আধুনিক কালে রবীন্দ্রনাথ রুদ্ধদলের সার্বত্রিক প্রসারণের নীতি মেনে নিয়ে যে নূতন ছন্দোবীতি উদ্ভাবন করেছেন তাকে বলা যায় 'নব্য কলাবৃত্ত' রীতি। তালিকা-আকারে ছন্দোবীতিগুলিব সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই।—

প্রত্ন কলাবৃত্ত— দীর্ঘস্বর ও রুদ্ধদলের সার্বত্রিক প্রসারণ ;

নব্য কলাবৃত্ত— দীর্ঘস্বরের সংকোচন ও রুদ্ধদলের সার্বত্রিক প্রসারণ ;

মিশ্র কলাবৃত্ত— দীর্ঘস্বরের সংকোচন এবং অবস্থাবিশেষে রুদ্ধদলের প্রসারণ ও সংকোচন ;

লৌকিক বা দলবৃত্ত— দীর্ঘস্বর ও রুদ্ধদলের-সার্বত্রিক সংকোচন।

এই চার রীতির উদ্ভব হয়েছে বাংলা উচ্চারণকে বিশেষ বিশেষ প্রণালীতে সুনির্দিষ্ট-ভাবে নিয়ন্ত্রণের ফলে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে মিশ্রকলাবৃত্তেবই প্রাধান্য। কিন্তু তার সঙ্গে অত্র তিন রীতির বথেষ্ট মিশ্রণ ঘটেছে। কেন না, বাংলা উচ্চারণ তখনও নির্দিষ্ট প্রণালীতে নিয়ন্ত্রিত হতে পাবে নি। তাব অতীতম কারণ এই যে, তখনকার দিনে সমস্ত পণ্ড রচনাই হয় সুরে-লয়ে গাওয়া হত, না-হয় সুর কবে আবৃত্তি কবা হত। সুরময় গান বা সুরেলা আবৃত্তি স্বাভাবিক উচ্চারণ-নিয়ন্ত্রণের তথা ছন্দোবীতি-গঠনের অতীতম প্রধান অন্তবায়।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ছন্দোবীতি-মিশ্রণেব আব-একটা বড়ো কাবণ এই যে, দীর্ঘস্বর ও

রুদ্রদল প্রয়োগে বড় চণ্ডীদাস অনেকাংশেই প্রাচীন সংস্কারের দ্বারা চালিত হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি ‘অক্ষর’-গণনার সংস্কার থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন। পক্ষান্তরে ভারতচন্দ্র উক্তপ্রকার প্রাচীন সংস্কারের বশবর্তী হন নি বটে, কিন্তু তিনি চালিত হলেন অক্ষর-গণনার নূতন সংস্কারের দ্বারা। এইভাবে অক্ষরগণনাব যে সংস্কার বাংলা সাহিত্যকে অধিকার করে বসল, বাংলা সাধুরীতির ছন্দ আজও তার প্রভাব সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠতে পারে নি। শুধু তাই নয়।

“আক্ষরিক ছন্দ বলে কোনো অদৃভূত পদার্থ বাংলায় কিংবা অত্র কোনো ভাষাতেই নেই। অক্ষর ধ্বনির চিহ্নমাত্র।”

রবীন্দ্রনাথের এই সতর্কবাণীও অনেকের কাছে ব্যর্থ হয়েছে। বস্তুতঃ ছন্দ-রচনা ও ছন্দ-বিশ্লেষণ, এই উভয় ব্যাপারেই অক্ষর-গণনার অভ্যাস অনেকেবই যেন একটা মজ্জাগত সংস্কারে পরিণত হয়েছে।

৪। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে ছন্দের বন্ধবৈচিত্র্য

রীতিনির্বিশেষে মাত্রা, পর্ব ও পদ সমাবেশের নাম ‘বন্ধ’। অর্থাৎ পর্ব, পদ ও পংক্তি গঠনের বিভিন্ন প্রণালীকেই বন্ধ বলা হয়। লৌকিক বা দলবৃত্ত রীতিব ছন্দে পর্ব সাধারণতঃ চার মাত্রা নিয়েই গঠিত হয়। অধুনাপূর্ব যুগে মাত্রাবৃত্ত বা কলাবৃত্ত রীতিব ছন্দে চাব, পাঁচ, ছয় ও সাত মাত্রার পর্ব প্রচলিত ছিল। মিশ্রকলাবৃত্ত অর্থাৎ সাধুরীতিব ছন্দেও তাই। উভয় ক্ষেত্রেই সর্বাধিক প্রচলিত ছিল চার মাত্রার পর্ব। ছয় মাত্রার পর্বও কবিসমাজে বেশ আদৃত ছিল। পাঁচ ও সাত মাত্রার প্রয়োগ অপেক্ষাকৃত বিরল।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে বিগুচ্ছ কলাবৃত্ত বা মাত্রাবৃত্ত রীতিব প্রয়োগ নেই। বিগুচ্ছ দলবৃত্ত বা লৌকিক রীতির দৃষ্টান্তও নেই। পূর্বে বলেছি ও কাব্যের ছন্দে নানা রীতিব মিশ্রণ ঘটলেও তা উত্তরকালীন সাধুরীতির খুবই কাছাকাছি এসেছিল। নিখুঁত সাধুরীতির প্রয়োগ ওই কাব্যে বিরল নয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে পর্ববৈচিত্র্যও বেশি নেই। তাতে চারমাত্রা পর্বেরই প্রাধান্য; ছয়মাত্রা পর্বও কিছুকিছু পাওয়া যায়। পাঁচ- ও সাত- মাত্রা পর্বের প্রয়োগ একেবারেই নেই।

পদ গঠিত হয় পর্ব নিয়ে। এক-এক পদে দুইটি বা তিনটি পর্ব থাকতে পারে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ওই দু-রকম পদেবই প্রয়োগ আছে। তবে দ্বিপদিক পদেবই প্রাধান্য। দৃষ্টান্ত দেওয়া বাবে যথাস্থানে।

পংক্তি গঠিত হয় পদ নিয়ে। এক-এক পংক্তিতে একটি, দুটি, তিনটি বা চারটি পদ থাকতে পারে। তদনুসারে পংক্তিকে একপদী, দ্বিপদী, ত্রিপদী ও চৌপদী নামে বর্ণনা করা হয়ে থাকে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে এই চাব-রকম পংক্তিরই প্রয়োগ আছে। তবে জীব-জগতের ছায় ছন্দোজগতেও দ্বিপদীবই প্রাধান্য। ত্রিপদীর স্থান তার পরেই। যথার্থ চৌপদী শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে নেই বলা যায়।

এবাব বিভিন্ন বকম বন্ধের দৃষ্টান্ত দেওয়া থাক। ছয় মাত্রার পর্ব অপেক্ষাকৃত বিবল। তাই প্রথমে ছয়মাত্রা পর্বের দৃষ্টান্ত দিয়ে পরে চারমাত্রা পর্বের দৃষ্টান্ত দেওয়া যাবে।

ছয় মাত্রার পর্ব

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে ছয়মাত্রা পর্বের রচনায় একপদী, দ্বিপদী ও ত্রিপদী, এই তিন বকম বন্ধের প্রয়োগ দেখা যায়। যথাক্রমে দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল।

একপদী

১০। দুইপর্বের (৬+৫) অপূর্ণ একপদী পংক্তি—

আয়িলা দেবের | স্মৃতি শুণী।
কংসের আগক | নারদ মুণী ॥...
নাচএ নাবদ | ভেকের গভী।
বিকৃত বদন | উমত মতী ॥
খণে খণে-হাসে | বিনি কাবণে।
খণে হএ খোড | খোণেকৈ কানে ॥

—জন্মখণ্ড, পা ৩।১-২

কাহার বহু ভৌ | কাহার রাণী।
কেহে সমুনাত | তোলসি পাণী ॥
বড়াব বহু মো | বড়ার কী-।
আন্ধে পাণি ভুলী | তোন্ধাত কী- ॥

কাখের কলস | নায়াঅ তোন্ধে।
কথা চারি পাঁচ | কহিব আন্ধে ॥

যাব কান্দ বসে | দোষব মাথা।
সে সি আন্ধা সমে | কহিব কথা ॥

—সমুনাতখণ্ড, পা ১৩৩।১

প্রথম পর্বে ছয় মাত্রা, দ্বিতীয় পর্বে পাঁচ। সুতরাং এটি অপূর্ণ একপদী। ছয়-পাঁচ মাত্রার এরকম অপূর্ণ একপদীকে প্রাচীন পরিভাষায় বলা হয় ‘একাবলী’। এর সঙ্গে তুলনীয় রবীন্দ্রনাথের ‘লক্ষ্মীব পরীক্ষা’র নাটকীয়-ছন্দ। পার্থক্য এই যে, ‘লক্ষ্মীব পরীক্ষা’র ছন্দ অমিশ্র কলাবৃত্ত রীতিতে রচিত এবং ছয়-ছয় মাত্রার দুই পূর্ণ পর্ব নিয়ে গঠিত।

এরকম এগাবো মাত্রার একপদী বা একাবলী ছন্দেই লৌকিক রীতির ভঙ্গি দেখা যায় সবচেয়ে বেশি।

২। দুই পর্বের (৬+৬) পূর্ণ একপদী পংক্তি—

প্রভু জগন্নাথোঁ | মোরে যত বুইল ।
 মোঞ দুখমতী | তাক না শুণিল ॥
 এবৈ আন্ধে মণে | পবিভা-বিজ ।
 সে কারণে আন্ধে | এত দুখ পাইল ॥...
 এবৈ মোঞ ভৈলোঁ | ভব যুবতী ।
 আঙ্গাক ছাড়িঅঁ | কারু গেলা কতী ॥

—রাধাবিরহ, পা ২০০।২

এবকম বাবো মাত্রার দ্বিপদীক পূর্ণ একপদীক দৃষ্টান্ত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে খুব বিবল ।

৩। তিন পর্বের (৬+৬+২) অপূর্ণ একপদী পংক্তি—

নিশি আঙ্খিআরী | তাহাত কেমনে | নাবী ।
 জিএ সে জাহার | পাসত পুরুষ | নাহী ॥
 মোরে কি না ভয়িঞা | গেল বড়া-য়ি | নাএ ।
 বিবহে বিকলী | খোজো মোঁ নান্দেয় | পোএ ॥

—রাধাবিরহ, পা ২১২।১

‘ভয়িঞা’ শব্দটির উচ্চারণরূপ ‘ভঞা’। অতএব এটি দ্বিমাত্রক । এই প্রসঙ্গে অবগীষ্য রবীন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত রচনারূপটি—

ফাঙ্কন-যামিনী | প্রদীপ জ্বলিছে | ঘরে,
 দখিন বাতাস | মবিছে বৃকের | 'পরে ।
 সোনাব খাঁচায় | ঘুমায় মুখবা | শারী,
 ছয়ার সমুখে | ঘুমায়ে পড়েছে | দ্বারী ॥

—‘কল্পনা’, ভ্রষ্ট লগ্ন

দ্বিপদী

১। চার পর্বের (৬+৬ | ৬+২) অপূর্ণ দ্বিপদী পংক্তি—

হাসিতে খেলিতে | গোপনারীগণ ॥ লাগিলা যমুনা | -তীরে ।
 কাফাঞিঁ ব মুখ | -কমল দেখিঅঁ ॥ কেহো না ভবিল | নীরে ॥

—যমুনাখণ্ড, পা ১৩২।২

চারি দিগেঁ তক | -পুষ্প মুকুলিল ॥ বহে বসন্তেব | বাএ ।

আষডালে বসী | কুয়িলী কুহলে ॥ লাগে বিষবাণ | -বাএ ॥

—বংশীখণ্ড, পা ১৭০।১

প্রাচীন মতে এই বন্ধের নাম ‘লঘু ত্রিপদী’ এবং এর তিন ‘পদে’র মাত্রাসংখ্যা যথাক্রমে ছয়-ছয়-আট । আসলে এই বন্ধকে ‘ত্রিপদী’ না বলে ‘দ্বিপদী’ বলাই সংগত । কেননা,

এর ছয় মাত্রাব বিভাগগুলি এক-একটি পর্ব, পদ নয়। প্রথম দুই পর্বের বারো মাত্রায় এক পদ (যেমন ‘একাবলী’র এগারো মাত্রায় এক পদ) এবং পরের দুই পর্বের আট মাত্রায় আর-এক পদ। এ প্রসঙ্গে লেখকের ‘ছন্দপরিক্রমা’ গ্রন্থ (পৃ ৬-৭ এবং ১২৬-২৭) দ্রষ্টব্য।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে চাবমাত্রা পর্বের তুলনায় ছয়মাত্রা পর্বের রচনাতে অধিকতর অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতা দেখা যায়। তার কারণ বোধ হয় এই যে, এইজাতীয় বচনায় সুরের খেলার অধিকতর অবকাশ ছিল। পরবর্তী কালের ষষ্ঠাত্মক পর্বের রচনাতেও সুরপ্রাধান্তের অপেক্ষাকৃত বেশি প্রবণতা দেখা যায়। তা ছাড়া সংস্কৃত ও প্রাকৃত সাহিত্যে ছয় মাত্রার আদর্শের বিরলতাও সম্ভবতঃ তাব একটি কারণ। মনে হয় গানের তালের আদর্শ থেকেই ছয় মাত্রার পর্ব রচনাব রীতি উদ্ভূত হয়েছিল।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ছয়মাত্রা পর্বের রচনায় বহুবৈচিত্র্যও অপেক্ষাকৃত কম এবং পর্বে পর্বে মিলের দৃষ্টান্তও বিরল। বাংলা সাহিত্যে ছয় মাত্রার পর্বে বৈচিত্র্য দেখা দিয়েছিল পরবর্তী কালে। তবে পর্বে পর্বে মিল বাখার প্রয়োজনীয়তা যে তখনই অনুভূত হয়েছিল তারও কিছুকিছু আভাস আছে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে। যেমন—

বত আলঙ্কার | বহুমূল সার

সব রাধা মোর | নে-।

সুবধে জড়িত | হিরাজ রচিত

বাঁশীগুলি মোরে | দে-॥

—বংশীখণ্ড, পা ১৮১।২

ত্রিপদী

১। আট-আট-চোদ্দ মাত্রার ত্রিপদী পংক্তি—

ঘরের বাহির | হৈর্ভে

তেলিনি তেল বি | -চির্ভে

কাল কাক রএ | সুখাল গাছের | ডালে।

আগেই সুনী ঘটে | নারী

হাঁসী জিঠীহো না | বারী

চলিলোঁ তাহাব | উচিত পা-ওঁ | ফলে ॥

—দানখণ্ড, পা ৫৯।২

এটির প্রথম ও দ্বিতীয় পদ একটি পূর্ণ পর্ব ও একটি অপূর্ণ পর্ব (২ মাত্রার) নিয়ে গঠিত। কাজেই এ দুটি পূর্ণ পদ নয়। তৃতীয় পদটিও অপূর্ণ, দুটি পূর্ণ পর্ব ও একটি অপূর্ণ পর্ব (২ মাত্রার) নিয়ে গঠিত।

চার মাত্রার পর্ব

চার মাত্রা পর্বের একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, অনেক সময় দুই পর্বের মধ্যবর্তী লম্বু-
ষতিটি লোপ পায় এবং ফলে এই দুই পর্ব যুক্ত হয়ে একটি আট মাত্রার 'যুক্তপর্বিক পদ'
গঠিত হয়। যেমন—

বনের হ : রিণী ঘেন | তরাসিনী | মনে ।

দশ দিশ | দেখে রাখা | চকিত ন : মনে ॥

—রাধাবিরহ, পা ২১৬।১

এখানে প্রতি পংক্তিতে দুই পদ, প্রতি পদে দুই পর্ব। শেষ পর্বটি অপূর্ণ, বস্তুতঃ
অর্ধ পর্ব। প্রথম পংক্তির প্রথম পদটি এবং দ্বিতীয় পংক্তির দ্বিতীয় পদটি যুক্তপর্বিক।
এই দুই স্থলে পর্বষতি লুপ্ত হয়েছে। এই দুটি যুক্তপর্বিক পদ গঠিত হয়েছে যথাক্রমে
তিন-তিন-দুই এবং তিন-তিন মাত্রার সমাবেশে। এটাই যুক্তপর্বিক পদ গঠনের আদর্শ
প্রণালী। দুই-তিন-তিন কিংবা তিন-দুই-তিন মাত্রাব সমাবেশ ঘটালে কানের শব্দ
পাওয়া যায় না। অর্থাৎ ওবকম মাত্রাসমাবেশ ছন্দোগত ক্রটি বলেই স্বীকার্য। কিন্তু
ওবকম শৃঙ্খলা তখনকার দিনে সম্ভব ছিল না। তা ছাড়া গানের স্ববে ও তালে এরকম
ক্রটি অনায়াসেই সেরে নেওয়া যেত। বস্তুতঃ ওবকম শৃঙ্খল বিচাষ দেখা দিয়েছে উনবিংশ
শতকে ছাপাখানার দৌলতে কবিতায় সুর-তালের প্রভাব হ্রাসের ফলে। কবিতাব ছন্দ
বন্ধন সুর-তালের আশ্রয় ছেড়ে পাঠ ও আবৃত্তির বোগে বাকৃহ্রদের অমুখ্যতা হ্রাস তখনই
এসব শৃঙ্খল নীতির আবির্ভাব ঘটল। যা হক, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ছন্দে দুই-তিন-তিন বা
তিন-দুই-তিন মাত্রাব যুক্তপর্বিক পদ একান্ত বিরল নয়। যেমন—

সকল সন্তাপ কাহ্ন | সহিবাক পারী ।

‘তোব বিবহসন্তাপ’ | সহিতে না পারী ॥

—রাধাবিরহ, পা ২১১।১

ঘর বন ভৈল তার | জাল সখিগণে ।

‘নিশাসে বাঢ়ে বিবহ’ | দারুণ দহনে ॥

—রাধাবিরহ, পা ২১৬।১

এরকম ক্রটিপূর্ণ পদের তুলনায় সুগঠিত যুক্তপর্বিক পদের সংখ্যা অনেক বেশি। অর্থাৎ
যুক্তপর্বিক পদের আদর্শটি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের যুগেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল, এটাই
উল্লেখযোগ্য ও অবগীয় বিষয়।

এইজাতীয় ছন্দে পর্ববিভাগেব চেয়ে পদবিভাগের গুরুত্বই বেশি। তাই পরবর্তী
দৃষ্টান্তগুলিতে অধিকাংশ স্থলেই পর্ববিভাগ না দেখিয়ে শুধু পদবিভাগই দেখানো
গেল।

একপদী বন্ধ

১। দুই পর্বের (৪+৪) একপদী পংক্তি—

বৃন্দাবন | মোর থানে ।
 বংশ বা : জাগু গানে ॥...
 নাম মোর | বনমালী ।
 হে-লোঁ দ : লির্বোঁ কালী ॥...
 তেজহ জাই : বার আশে ।
 গাইল বড়ু | চণ্ডীদাসে ॥

—দানখণ্ড, পা ২৫।১

২। সার্ব দুই পর্বের (৪+৪+২) একপদী পংক্তি—

যোগী যোগ | চিন্তে যেহ | -মনে ।
 কাহাঞি ছাড়ী | না জাগো মো | আনে ॥
 —বাধাবিবহ, পা ১৯৫।১

তরুদল | চালএ প : বনে ।
 কাহ আইসে | হেন তাক | মানে ॥
 না দেখিঅঁ | ছাড়এ নি : শাসে ।
 বড়ায়িক | মাজে আশো | -আসে ॥

—রাধাবিরহ, পা ১৯৮।২

বন্ধুজন | কারঅঁ বি : মনে ।
 ছন্দে বন্দে | তোষিবে ক : মনে ॥

—বাধাবিরহ, পা ২১৩।২

এরকম দশ মাত্রার একপদী-প্রয়োগ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বিরল নয় ।

দ্বিপদী বন্ধ

১। সার্ব তিন পর্বের (৪+৪ | ৪+২) বা আট-ছয় মাত্রাব অপূর্ণ দ্বিপদী পংক্তি—

পাখি নহৌ তার ঠাই | উড়ী পড়ি জাগু ।
 মেদিনী বিদাব দেউ | পসিঅঁ লুকাও ॥

—বংশীখণ্ড, পা ১৬৯।২

বলা বাহুল্য, আট-ছয় মাত্রার এবকম অপূর্ণ দ্বিপদীরই পূর্বাগত প্রচলিত নাম ‘পয়ার’ ।
 আট-ছয় মাত্রার পদবিভাগই পয়ারেব আদর্শ বিভাগ । শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অধিকাংশ
 স্থলেই এরকম নির্দোষ পদবিভাগই দেখা যায় । কিন্তু তার ব্যতিক্রমও কম নয় ।
 যেমন—

গোআলেব বহু বি- | লই'আ জাই'ব আক্ষে ।

তার মাঝে রাধাছো : পাঠা'আ দেহ তোক্ষে ॥

—তাম্বুলখণ্ড, পৃ ১৫১১

বৃন্দাবনে ভ্রমর : কোকিল কাটে রাএ ।

বিকসিত কুন্তম : দক্ষিণ বহে বাএ ॥

—বাণখণ্ড, পৃ ১৬৭১১

তোক্ষার বচনে : যমুনাক আক্ষে জাই'ব ।

তথা গেল' কেমনে : কাহা'জির' লাগ পাই'ব ॥

—বংশীখণ্ড, পৃ ১৭৭১২

আমুখিনী চন্দ্রাবলী | বিকলী বিরহে ।

এবেঁ তাক তেজিতে : উচিত তোর নহে ॥

—রাধাবিবহ, পৃ ২২৬১১

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে এরকম ব্যতিক্রম বিরল নয়। আদর্শ পদের ব্যতিক্রম সম্বন্ধে পূর্বে যে মন্তব্য করা হয়েছে, এ-সম্পর্কে তাও সর্বতোভাবে প্রযোজ্য। বস্তুতঃ আদর্শ পন্যাবে আট-ছয় মাত্রার বিভাগ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে কখনও স্বীকৃতি পায় নি। ভারতচন্দ্রও এই নীতি লঙ্ঘনে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত ছিলেন না। আসলে তৎকালে পন্যাবের এই বিভাগ একটা নীতি বলেই স্বীকৃত হত না। এমন কি, দৈর্ঘ্য গুণ্ডও (১৮১২-৫৯) এই নীতি সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন না। এই নীতি ক্রমে ক্রমে প্রতিষ্ঠালাভ কবেছে দৈর্ঘ্য গুণ্ডের পরবর্তী কবিদের হাতে। এ প্রসঙ্গে 'শতবার্ষিক জয়ন্তী-উৎসর্গ' গ্রন্থে লেখকের 'ভোরের পাখি' প্রবন্ধ (পৃ ৩৩৭-৩৯) দ্রষ্টব্য।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কোনো কোনো স্থলে পন্যাবের শেষ বর্ণটি দ্বিমাত্রক বলে স্বীকার্য। সেসব দৃষ্টান্তকে উনমাত্রক পন্যাব অর্থাৎ তেরো মাত্রার পন্যাব বা কোনো নূতন ছন্দ বলে মনে কববার কারণ নেই। যেমন—

কমল আশুভ ক্ষণে | বাড়াইলোঁ পা- ।

হাঁহী জিঠি তাত কেহো | নাহি' দিল বাধা ॥০০০

নঠ হৈল বোল ছধ | আর নঠ ঘী- ।

এডি জাএ মোক সব | গোআলার বী- ॥

—দানখণ্ড, পৃ ৫১১২

এখানে 'পা' শব্দের দ্বিমাত্রকতা স্পষ্ট। নতুবা 'বাধা' শব্দের সঙ্গে সমতারক্ষা সম্ভব হত না। ঘী এবং বী, এ দুটি একক মুক্তদলও দ্বিমাত্রক। এই দুই পংক্তির পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অংশের সঙ্গে মিলিয়ে দেখিলেও সব সম্বন্ধেই দূর হবে।

সোনার চু : পড়ী বাধা | রূপার ঘ : ডী- ।

নেতের আ : ধল তাত | দি'আ ওহা : ডী- ॥

—নৌকাখণ্ড, পৃ ৭৪/১

এখানে ‘ভী’ দশ-দুটি একক না হলেও ছন্দের খাতিরে কিঞ্চিৎ বিচ্ছিন্ন ও দ্বিমাত্রক রূপে উচ্চার্য। নতুবা পববর্তী পংক্তিগুলির সঙ্গে সমতা রক্ষিত হবে না। তবে শেষ বর্ণের এরকম দ্বিমাত্রক উচ্চারণে যে একটু ধ্বনিবৈচিত্র্য হয় তাতে সন্দেহ নেই। উদ্ধৃত শেষ দুই পংক্তি রবীন্দ্রনাথের ‘সোনাব তরী’ কবিতার এই দুই পংক্তির সঙ্গে যথাক্রমে তুলনীয়।—

‘শুভ্র ন : দীর তীরে রহিছ প : ডি।’

‘দেখে যেন | মনে হয় | চিনি উহা : রে।’

এক পংক্তিতে দ্বিপদী পয়ার ও অষ্ট পংক্তিতে দশ মাত্রার একপদীর সমাবেশ বড় চণ্ডীদাসের একটি প্রিয় ছন্দোবদ্ধ। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে নানা স্থানেই এরকম ছন্দোবন্ধের প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন—

আক্ষার করিল রাধা | বড়ি খাঁখার।

আবলি করিবোঁ প্রতিকাষ।

আপণে করিব আক্ষে | তেহেন উপাএ।

যেহু রাধা পড়ে মোব পাএ ॥

—বাগধণ্ড, পা ১৫৪।১

হা-র কেয়ব রাধা | সব মোর নে-।

বাণীশুটি আগী মোক দে- ॥

বনমালা আভরণ | তাহা তোক দিবোঁ।

যে বোলসি তাহাক করিবোঁ ॥

—বাগধণ্ড, পা ১৮৫।১-২

দুতী বোল : গিঅাঁ কাহেরু থানে।

বারেকু দয়া কবী মোরে | দেউ দরশনে ॥

—রাধাবিরহ, পা ২১৩।১

২। দশ-আট (৪+৪+২ | ৪+৪) মাত্রার দ্বিপদী পংক্তি—

গোআলজরম আক্ষে গুণ | দধি দুধে উতপতী।

এবোঁ তাক উপেখহ কেহে | তোৱ ভৈল কি কুমতী ॥

—নৌকাধণ্ড, পা ৭২।২

এরকম দ্বিপদীর প্রয়োগ বিরল। আধুনিক কালেও দেখা যায় না।

ত্রিপদী বন্ধ

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে দ্বিপদী পয়ারের তুলনায় ত্রিপদীর প্রয়োগ কম, কিন্তু তার বৈচিত্র্য কিছু বেশি। যেমন—

১। আট-ছয়-আট মাত্রার ত্রিপদী পংক্তি -

কাহাঞিঁ ব হাথে পড়ী | জুন বড়ায়ি ল—

মোএঁ হাবাইলোঁ বুধী।

উদ্ধার পাইএ যেন | স্নন বড়ায়ি ল |
 তোম্কে চিন্ত সেহী শুধী ||
 না জাণাইহ কাহাঞিঁকে | স্নন বড়ায়ি ল |
 তবেঁ নহে মোব ডর |
 স্নগিলেঁ সে আস পাইব | স্নন বড়ায়ি ল |
 কাহ বড আছিদর ||

—দানবগু, পা ৬১২

মো ববেঁ জাণিতোঁ হেন | কবিবেঁ তো ল |
 তবেঁ নাসিতোঁ এ বাটে |
 নাহি বাইতোঁ দধিঁদুধ | বিকণিতোঁ ল |
 কাহাঞিঁ মথুবান্ হাটে ||
 —বৃন্দাবনবগু, পা ১২৪।১-২

২। আট-ছয়-দশ মাত্রার ত্রিপদী পংক্তি—

স্নসব বাঁশীর নাদ | গুণিআঁ বড়ায়ি |
 রাঙ্কিলোঁ যে স্ননহ কাহিনী |
 আঘল ব্যঞ্জনে মো- | বেশোআর দিলোঁ |
 সাকে দিলোঁ কানাসোআঁ পানী ||
 —বংশীখণ্ড, পা ১৭৫।২

সহজেই বোঝা যায়, এই ছন্দোন্নপটি পূর্বগামী কোনো প্রাকৃত-অপভ্রংশ ছন্দোন্নপের বাংলা অমুকৃতিমাত্র। সেই প্রাকৃত রূপের পরিচয় দেওয়া বর্তমান প্রসঙ্গে নিম্নয়োজন। তথাপি সে কথার উল্লেখ করা গেল এইজন্ত যে, মূল প্রত্নরূপ ও তার বাংলান্নপের মধ্যবর্তী রূপটির নিদর্শনও আছে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রচনায়। এই ভাঙা প্রত্নরূপের দৃষ্টান্ত এই।—

নানা আভরণগণে | শো-ভক এ- |
 নী-ল জলদশম | দে-হা- |
 সে কাহ বিহাণে প্রাণ | আ-কুল এ- |
 ভাবি ভাবি তা-হাব | নে-হা- ||

—রাধাবিরহ, পা ২০১।১

দেখা যাচ্ছে, আট-ছয়-আট-চার মাত্রার এই মূল রূপটি তিন পদের সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। উত্তর কালে শেষ বারো মাত্রার দেড় পদ বাংলা উচ্চারণে সংকুচিত হয়ে দশ মাত্রায় পবিণত হয়েছিল। আব, এই দশ মাত্রা কালক্রমে একটি অখণ্ড দীর্ঘপদ বলে কবিসমাজে স্বীকৃতি পেয়েছিল। সেইজন্তই আট-ছয়-দশ মাত্রার পূর্বোক্ত ছন্দোন্নপটিকে চৌপদী না বলে ত্রিপদী বলেই গণ্য করা গেল।

এইজাতীয় ত্রিপদী বন্ধের দৃষ্টান্ত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে নানা স্থানেই পাওয়া যায়।

৩। আট-আট-দশ মাত্রার ত্রিপদী পংক্তি—

সোঞ বী কাহেব বাণী |

না স্বহে মোর পরাণী |

চেতন নাহিক মোব দেহে।

তেজিলো সুখ আসেস |

দিনে দিনে তহু শেষ |

ভাবিঞা সে কা-হের নেহে ||

—রাধাবিরহ, পা ২২২।১

জয়দেবের

মুখরমধীরং | ত্যজ মঞ্জীরং |

রিপুমিব কেলিষু | লোলম্ |

চল সখি কৃষ্ণং | সতিমিরপুঞ্জং |

শীলয় নীলনি | -চোলম্ ||

—গীতগোবিন্দ, গীত ১১

ইত্যাদি রচনাই যে বাংলা আট-আট-দশ মাত্রার ত্রিপদী বন্ধের আদর্শ, এ কথা সুবিদিত। বলা বাহুল্য, এই আদর্শের শেষ চার মাত্রা সংকুচিত হয়ে বাংলায় ছই মাত্রায় পরিণত হয়েছে। এই মূল আদর্শের অর্ধতৎসম রূপের অর্থাৎ বিগুদ্ব প্রত্যরূপ ও বাংলা রূপের মধ্যবর্তী অবস্থার কিছুকিছু আভাস শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রচনায় মাঝে মাঝে পাওয়া যায়। উদ্ভূত বাংলা দৃষ্টান্তটির তৃতীয় পদ-দুটিতেও সে আভাস পাওয়া যেতে পারে। ‘দেহে’ এবং ‘নেহে’ শব্দের একাবস্তুলিব দীর্ঘ অর্থাৎ দ্বিমাত্রক উচ্চারণ করলেই সে আভাস স্পষ্ট হয়ে উঠবে। গানে হয়তো তাই করা হত। আর উদ্ভূতি অনাবশ্যক।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ষথার্থ চৌপদী বন্ধের প্রয়োগ দেবা যায় না। চৌপদী বন্ধেব উদ্ভব হয় পরবর্তী কালে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বিভিন্ন রচনাতে এই বন্ধের একরকম পূর্বাভাস পাওয়া যায়। একটু পরেই ষথস্থানে তাব দৃষ্টান্ত দেওয়া যাবে।

গ্লোকবন্ধ ও মিল

কয়েকটি পদ নিয়ে যেমন গঠিত হয় পংক্তি, তেমনি কয়েকটি পংক্তি নিয়ে গঠিত হয় গ্লোক। পদের সংখ্যা অনুসারে পংক্তি ত্রিবিধ—দ্বিপদী, ত্রিপদী ও চৌপদী। তেমনি পংক্তিব সংখ্যা অনুসারে গ্লোকে বলা যায় যুগ্মক (couplet), ত্রিক (triplet) ও চতুগ্লক (quadruplet)। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে দ্বিপদী ও ত্রিপদী, এই ছ-বকম পংক্তিরই প্রাধান্য। চৌপদী পংক্তিব কিছুকিছু আভাস থাকলেও পূর্ণগঠিত চৌপদী তখনও দেখ দেয় নি। তেমনি ও-কাব্যে শুধু যুগ্মক ও ত্রিক বন্ধের গ্লোকই পাওয়া যায়, চতুগ্লক গ্লোক নেই।

শ্লোকবন্ধেব প্রসঙ্গে মিলের কথাও বলা প্রয়োজন। সংস্কৃত শ্লোকবন্ধে মিল অনাবশ্যক। কিন্তু বাংলা শ্লোকবন্ধে মিল প্রায় অত্যাঙ্গ। পংক্তিতে পংক্তিতে মিল ছাড়া বাংলা শ্লোক প্রায় কল্পনা করা যায় না। পদে পদে মিল রাখা পংক্তি-মিলের মতো অত্যাবশ্যক বলে গণ্য নয়। পর্ব-মিলের প্রয়োজনীয়তা আরও কম, ও-রকম মিল বস্তুতঃ ধ্বনিগত অলংকরণমাত্র। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের যুগে চার মাত্রার পর্বে মিল দেবার রীতি প্রচলিত হয় নি। ছয় মাত্রার পর্বে মিলেব প্রয়োজনীয়তা কিছুকিছু অল্পভূত হয়েছিল, তাব দৃষ্টান্ত আগেই দেওয়া হয়েছে। পদগত মিলের প্রথা তখনই প্রচলিত ছিল।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে এক দল ও দুই দলের মিলই দেখা যায়। যেমন—মা-না, বী-ঘী, দে-নে, মো-তো, পাই-জাই, বাএ-গাএ, বীর-ধীর, ভৈল-কৈল, ধীরে-তীরে, পঙ্কে-শঙ্কে, ইত্যাদি। তিন বা ততোধিক দলের মিল দেবার রীতি তখনও প্রবর্তিত হয় নি। “বসনে-দশনে” ধরণের যে দু-একটি মিল দেখা যায় তা আকস্মিক, ইচ্ছাকৃত নয়। মিলেব প্রধান নীতি এই যে, দুই শব্দের প্রথম বর্ণটি ভিন্ন হওয়া চাই এবং তৎপববর্তী সব স্বর ও ব্যঞ্জন যথাক্রমে পুরোপুরি অভিন্ন বা সমশ্রুতি হওয়া চাই। উপবেব দৃষ্টান্তগুলি থেকেই তা বোঝা যাবে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে এই নীতিব ব্যতিক্রম প্রচুর। যেমন—নিশী-বগী, তাহে-নেহে, টুটে-পেটে, দূতী-রাতী, বিদারী-তরী, বনমালী-অধিকাবী ইত্যাদি রকম অপূর্ণ মিলের অভাব নেই শ্রীরামকৃষ্ণকীর্তনে। বস্তুতঃ বাংলা সাহিত্যে যথার্থ মিলের আদর্শ স্বীকৃতি লাভ কবে উনবিংশ শতকের শেষার্ধ্বে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেব অধিকাংশ শ্লোকবন্ধই যুগ্মক। বর্তমান আলোচনায় বিভিন্ন প্রসঙ্গে যেসব দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হয়েছে তার থেকেই এ কথার সত্যতা প্রতিপন্ন হবে। অধিকতর দৃষ্টান্ত নিম্নয়োজন।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ত্রিকবন্ধের যেসব দৃষ্টান্ত আছে তাব বৈচিত্র্য খুব কম নয়। প্রথমে ছয়মাত্রা পর্বের বচনায় ত্রিকবন্ধের দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক।—

যবেঁ সে ফুল না | দিবেঁ।

তবেঁ সমুচিত ফল পা | -ইবেঁ।

চোরবাদেঁ তোম্বা | বাস্তিআঁ থুয়িবো | কেমনে ঘর জা | -ইবেঁ ॥

...

...

...

..

কেহে হেন কাম | কৈলে।

সব ফুল ফল | লৈলে।

বৃন্দাবন মাঝে | পসিআঁ-রাধা | সব তরু গুন | কৈলে ॥

দেখিআঁ পোড়ে ছ | -দয়ে।

যেন মোর প্রাণ | জাএ।

কাহাকে কহিবোঁ | কেনা পাতিআএ | বড়ু চণ্ডীদাস | গাএ ॥

—বৃন্দাবনখণ্ড, পা ১২৪।১

এই ছন্দোবদ্ধটিকে ত্রিপদী বলা যায় না দুই কারণে। প্রথমতঃ, এই দৃষ্টান্তেব প্রত্যেকটি ছত্রই এক-একটি পংক্তির স্বাধীন পয়েছে। প্রত্যেক অংশের প্রথম ছুটি ছত্র ছয়-দুই মাত্রাব দ্বিপদিক অপূর্ণ একপদী এবং তৃতীয় ছত্র অপূর্ণ দ্বিপদী, একটি দুই পদেব (৬+৬) পূর্ণ পদ এবং একটি দুই পদেব (৬+২) অপূর্ণ পদ নিয়ে গঠিত। যদি প্রথম দুটি ছত্রকে দুই পদ বলা হয় তা হলে এক-একটি অংশকে ত্রিপদী না বলে চৌপদী বলাই সংগত হত। এটিকে ত্রিপদীবন্ধের দৃষ্টান্ত না বলে ত্রিকবন্ধ বলে গণ্য করার দ্বিতীয় কারণ এই যে, এই রচনাটির প্রত্যেকটি অংশই তিন পংক্তিতে সম্পূর্ণ এবং এই সম্পূর্ণতার পবিচায়ক হিসাবে তিন পংক্তিতে মিল রাখা হয়েছে। যদি তা না হত, তবে প্রত্যেক অংশের তৃতীয় পংক্তি পরবর্তী অংশের তৃতীয় পংক্তির অপেক্ষা রাখত এবং ওই দুই পংক্তিতে মিল থাকত। পূর্বে যথাত্তরপদিক ত্রিপদীর যে দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে তাব সঙ্গে উদ্ধৃত দৃষ্টান্তটির তুলনা করলেই এ কথাটির সার্থকতা তথা এই দুই বন্ধের পার্থক্য বোঝা যাবে।

এবার চারমাত্রা পদ নিয়ে গঠিত ত্রিকবন্ধের দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

১। আট-আট-দশ মাত্রার ত্রিকবন্ধ—

দুতী ধরোঁ তোর পাএ,
হের মোর প্রাণ জাএ,
কহ মোরে জীবন উপাএ ॥
বহে প্রভাত সমএ
মলয় শিয়ল বাএ,
বৃন্দাবনে কুয়িলী কাচে রাএ ॥

—বাধাবিরহ, পা ১৯০।১

‘কুয়িলী’ শব্দের উচ্চারণরূপ ‘কুইলী’ অর্থাৎ দ্বিমাত্রক। ত্রিকবন্ধে অনেক সময় মিল থাকে না, বিশেষতঃ তৃতীয় পংক্তিতে। যেমন—

কিবা পুরুষ জরমে
খণ্ডিত কইল আক্ষে,
তার ফলে কাহাঞি হারায়িলোঁ ॥

—বাধাবিরহ, পা ১৯০।২

এখানে হয় ‘কাহাঞি’ দ্বিমাত্রকরূপে (কাহাই) উচ্চার্য, না-হয় ‘হারায়িলোঁ’ শব্দ ত্রিমাত্রকরূপে (হারাইলোঁ) উচ্চার্য।

২। আট-আট-চৌদ মাত্রার ত্রিকবন্ধ—

যত কৈলোঁ সংযম,
করিলোঁ ব্রতনিয়ম,
নঠ হএ কাহ মোর | সেসব ধরম ॥

—বাধাবিরহ, পা ২১০।১

বাম কবতে বদনে,
 দিখাঁ গগনে নয়নে,
 তো-স্নাক চিন্তে রাধা | নি-শ্চল মনে ॥
 খনে হাসে খনে রোষে,
 খনে কাঁপএ তরাসে,
 খনে কান্দে রাধা, খনে | কবএ বিলাসে ॥

—বাধাবিরহ, পা ২১৫।২

তিন ছত্রের এক-একটি অংশকে এক-একটি ছন্দপংক্তি বলে গণ্য করলে এবং শুধু পদের সংখ্যা গণনা করলে এই অংশগুলিকে চৌপদী বলে মনে কবা যেত। কিন্তু তা যে কবির অভিপ্রেত নয় তার প্রমাণ বিভিন্ন অংশের পারস্পরিক নিবপেক্ষতা ও ত্রিপংক্তিক মিল। যথার্থ চৌপদী স্বরূপ কি, তা দেখাচ্ছি।—

যে ডালে কবো মো ভরে
 সে ডাল ভাঙ্গিঞাঁ পড়ে,
 নাহি হেন ডাল যাতে | করো বিসরামে।

—রাধাবিরহ, পা ২১২।১

এটি চৌপদী। কেননা এটি স্বতন্ত্র নয়, অর্থাৎ এই অংশটিতে ভাবগত সম্পূর্ণতা নেই, ভাবের পূর্ণতার জন্ত পরবর্তী অংশের অপেক্ষা আছে। সেইজন্মই মিলের জন্তও তৃতীয় ছত্রটি প্রথম দুই ছত্রের অস্ববর্তী না হয়ে পরবর্তী অংশের তৃতীয় ছত্রের অপেক্ষায় রয়েছে।

এস্থলে বলা অহুচিত হবে না যে, চারমাত্রা পর্বের এরকম চৌপদী বন্ধকে অনেক সময় ছয়মাত্রা পর্বের ত্রিপদীরূপেও আবৃত্তি করা যায়। যেমন—

যে ডালে করো মো | ভবে
 সে ডাল ভাঙ্গিঞাঁ | পড়ে,
 নাহি হেন ডাল | যাতে কবো বিস | -রামে।

প্রথম দুটি পদ অপূর্ণ দ্বিপদিক, তৃতীয় পদটি অপূর্ণ ত্রিপদিক। এই অংশটিকে ষষ্ঠাঙ্গ-পদিক ত্রিপদীরূপে গণ্য কবাই হয়তো কবির অভিপ্রেত ছিল। কিন্তু কোন্ রূপটি সত্যই কবির অভিপ্রেত ছিল তা নিঃসংশয়ে বলাব উপায় নেই।

৩। দশ-দশ-দশ মাত্রার ত্রিকবন্ধ—

এ জন্মে বা না করিলেঁ। ভাগ।
 হারায়িলেঁ কা-হের লাগ।
 আর তাব না পায়িলেঁ লাগ ॥

—বাধাবিরহ, পা ১৯০।২

৪। দশ-দশ-চোদ্দ মাত্রাব ত্রিকবন্ধ—

শিশুকালে আন্ধে মতিভোলে
বডায়ি না লয়িলে। কাঙ্কের তাম্বুলে,
এবে আন্ধাব মন মজিল। বাল গোপা-লে ॥

—রাধাবিবহ, পা ২১২।২-২১৩।১

এই রচনাটিতে কোনো কোনো স্থলে, বিশেষতঃ তৃতীয় পংক্তিতে, মাত্রাসংখ্যার বড়ই অনিশ্চয়তা দেখা যায়। এটা বোধ করি সংগীতরীতির প্রয়োজনে মাঝে ‘আখর’ দেবার ফল। উপরের দৃষ্টান্তটিতে ‘বডায়ি’ এবং ‘এবে’ শব্দ-দুটি সম্ভবতঃ ও-রকম ‘আখর’ বলেই স্বীকার্য। আর এসব আখর যে ছন্দোগত মাত্রাসংখ্যাব বহির্ভূত অতিরিক্ত যোজনা, তা বলাই বাহুল্য। উপরের আখর-দুটি ছন্দপংক্তিব পুরোভাগে অবস্থিত। পংক্তিমাধ্যবর্তী আখরের দৃষ্টান্তও আছে। যেমন—

সব খন চিস্তিআঁ মুরাবী
পবাণ ধরিতে না পা-রী,
রহিব ঘোবনে আন্ধে। [কেমনে] মন নেবা-বী ॥

—রাধাবিবহ, পা ২১৩।১

এখানে ‘কেমনে’ শব্দটি সম্ভবতঃ আখর বলেই গণ্য। এভাবে আখর নিরূপণ করা সর্বত্র সহজ নয়। ছন্দের বিচারে অতিরিক্ত যোজনা বলে গণ্য হলেও ভাবের দিক থেকে আখর প্রয়োজনাতিরিক্ত নয়।

আখরের প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের আব-একটি ছন্দোগত বৈশিষ্ট্যের কথা বলা প্রয়োজন। সে বৈশিষ্ট্যটি হল ‘অতিপর্ব’-বিষয়ক। পদ্যরচনায় কখনও কখনও এমন এক-একটি শব্দ ব্যবহৃত হয় যা ছন্দের মাত্রা-হিসাবের বহির্ভূত, অথচ যা ছন্দের দোলায় নুতনত্ব সৃষ্টিব সহায়ক এবং রচনার ভাবের পক্ষেও অত্যাৱশ্যক। এরকম হিসাববহির্ভূত অতিরিক্ত শব্দকে বলা হয় ‘অতিপর্ব’ (anacrusis)। প্রাকৃত ছন্দে অতিপর্বের যথেষ্ট প্রয়োগ দেখা যায়। বাংলা ছড়া-জাতীয় লোকসাহিত্যেও অতিপর্বের প্রয়োগ বিরল নয়। আধুনিক কালে এই অতিপর্বের প্রয়োগ সর্বাধিক উৎকর্ষ লাভ কবেছে ববীন্দ্রনাথের হাতে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রচনাতেও যে অতিপর্বের নিদর্শন পাওয়া যায়, তাব ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে। একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

পুরুষ জরমে। কা-ছাঞি ল-।
আল আছিলে। বা তোব। নারী।
ইহ জবমে-। কে বা পাতিআএ।
অপণে বুঝহু মু। -বারী।
হার তিরী বামা। জাতী রাধে ল-।
আল- আন্ধাতে কব পর। -ওয়।

আন্ধার আধিক | কোণ দেহ আছে |
 কারে করসি তৌ | ভয় ॥...
 বিলম্ব করিতে | নারে রাধা ল- |
 আল বচন আন্ধার | ধব ।
 বিজন বনত | তো-ন্ধা দেখিআ |
 হাণিল কুজুম | -শব ॥

—দানখণ্ড, পা ৬৬।২-৬৭।১

বলা বাহুল্য, এটি ছয়মাত্রা পর্বের অপূর্ণ দ্বিপদীবন্ধে রচিত। ‘অপূর্ণ’ ও ‘পবতয়’ শব্দের উচ্চারণরূপ সম্ভবতঃ যথাক্রমে ‘অপূর্ণ’ ও ‘পবৃত্তয়’ অর্থাৎ দ্বিমাত্রক ও ত্রিমাত্রক। লক্ষণীয় বিষয় এই যে, অতিপর্ব ‘আল’ শব্দটি প্রত্যেক শ্লোকেই একটি নির্দিষ্ট স্থানে স্থাপিত হয়েছে। এটাই অতিপর্ব স্থাপনের স্বাভাবিক রীতি। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে সর্বত্র এই রীতি অনুসৃত হয় নি। বক্তব্যেব প্রয়োজনে ছন্দপংক্তিব অনির্দিষ্ট স্থানেও স্থাপিত হয়েছে। অনির্দিষ্ট ও অনির্দিষ্ট, এই দুইরকম অতিপর্বই সুরে ও তালে সংগীতের অঙ্গীভূত বলে স্বীকৃত হয়, যদিও তা সর্বত্র ছন্দের অঙ্গ বলে গণ্য নয়। বলা বাহুল্য, আখরও বস্তুতঃ একজাতীয় অতিপর্ব।

আধুনিক কালে অতিপর্ব ছন্দোবদ্ধ রচনার মূলপাঠ থেকে বিচ্ছিন্নভাবে মুদ্রিত থাকে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে অতিপর্ব বা আখর শুধু যে অনির্দিষ্ট তা নয়, তৎকালীন প্রথা অনুসারে সেগুলি মূলপাঠের সঙ্গে অবচ্ছিন্নরূপেই লিখিত আছে। ফলে অনেক স্থানেই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ছন্দোনিরূপণ সহজসাধ্য নয়। এখানেই অতিপর্ব বা আখর নির্দেশের গুরুত্ব। অতিপর্ব বা আখর চিনে নিতে পারলে ছন্দের আসল রূপটিও স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে। তাতে গ্রন্থের পাঠনির্ণয়ও অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হয়।

দেখা গেল শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ছন্দে বন্ধবৈচিত্র্য কম নয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন একটি গীতিনাট্য-জাতীয় বৃহৎ কাব্যগ্রন্থ। নাটকীয় ঘটনাবাহুল্য ও সংলাপ এবং ভাব-ও বস-গত বৈচিত্র্য এই গ্রন্থেব একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। এই বিশিষ্টতার সঙ্গে সংগতি বক্ষাব জন্মই এর বিভিন্ন ধরনের রচনার ছন্দে এবং সংগীতের সুরে ও তালে স্বভাবতঃই নানারকম বৈচিত্র্য ঘটতে হয়েছে। এই হচ্ছে এ গ্রন্থেব ছন্দোবৈচিত্র্যের অন্ততম মূলকারণ। আর, এইজন্যই এটি বাংলা ছন্দের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য স্থানেব অধিকারী হয়েছে।

৫। উপসংহার

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যেব ছন্দোবাহিত্য ও ছন্দোবদ্ধতার একটা মোটামুটি পরিচয় দেবার চেষ্টা করা গেল। আরও স্পষ্টভাবে ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে এ গ্রন্থের ছন্দোনিরূপণের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। এই প্রসঙ্গে বলা উচিত যে, এ গ্রন্থের বিভিন্ন রচনার শীর্ষে যে

তালের নির্দেশ দেওয়া আছে সেগুলি সম্বন্ধেও অমূল্যদান ও আলোচনা হওয়া বাঞ্ছনীয়। কেননা, গীতিরচনার তালবিভাগ অনেক সময়ই ছন্দোবিভাগ নির্ণয়ের সহায়ক হয়। আশা করা যায়, এ ক্ষেত্রেও অন্ততঃ কিছুপরিমাণে তা হবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলতে পারি যে, 'ক্ৰীড়া' তালের গীতিরচনাগুলিকে অনেক স্থলেই ছয় মাত্রাব পর্বে বিভক্ত করা যায়। কিন্তু গীতিব্যাকরণে নিজের অনভিজ্ঞতাবশতঃ তালজ্ঞানেব সহায়তায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ছন্দোবিশ্লেষণে সাহসী হই নি। ফলে শুধু সাধারণ ভাষাজ্ঞান ও ছন্দোজ্ঞানের উপবেই নির্ভর করতে হয়েছে। এইমাত্র সম্বল নিয়ে অতি সাধারণভাবে যে পরিচয়টুকু দেওয়া হল, আশা করি তার থেকেও বোঝা যাবে যে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেব ছন্দসম্পদ, বিশেষতঃ তার বহুবৈচিত্র্য, উপেক্ষণীয় নয়। এই কাব্য রচনাব কালেই যে তিনরকম ছন্দোন্নীতির পূর্বাভাস সূচিত হয়েছিল এবং বহুবিধ ছন্দোবন্ধেবও উদ্ভব হয়েছিল তা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যেব ইতিহাসে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এতদিন পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেব গুরুত্ব স্বীকৃত হচ্ছিল প্রধানতঃ ভাষাতত্ত্বের দিক্ থেকে। এখন দেখা যাচ্ছে ছন্দতত্ত্বের বিচারেও তার গুরুত্ব কম নয়। ভাষাতত্ত্বের দিক্ থেকেও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ছন্দোনিরূপণের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। কেন না, ছন্দোনিরূপণের দ্বারাই বাংলাভাষাব তৎকালীন উচ্চারণরূপ নির্ণয় করা সম্ভব। ছন্দের হকে না ফেললে অনেক ক্ষেত্রেই ভাষার যথার্থ উচ্চারণরূপ নির্ণয় করা সম্ভব নয়। আব, বাংলার স্বাভাবিক উচ্চারণ অমুবর্তনের ফলে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ছন্দ যে কোনো কোনো বিষয়ে আধুনিক কালেরও অগ্রবর্তী ছিল, সে কথা পূর্বেই বলেছি। কারণ বড়ু চণ্ডীদাসের ছন্দোবোধ তথাকথিত অক্ষরসংখ্যার সংস্থারে আচ্ছন্ন ছিল না। এ দিক্ থেকে বিচার করলে দেখা যাবে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেব ছন্দোবিশ্লেষণ এ গ্রন্থের পাঠ-নিরূপণের পক্ষেও কিছুপরিমাণে সহায়ক। অর্থাৎ যথার্থ সম্পাদনের প্রয়োজনেও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুঙ্খানুপুঙ্খ ছন্দোনিরূপণ অত্যাবশ্যক।

পরিশেষে দুটি সিদ্ধান্তের বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রথমতঃ, সমগ্রভাবে বিচার করলে বড়ু চণ্ডীদাসকে বাংলার অগ্রতম শ্রেষ্ঠ ছন্দশিল্পী বলেই স্বীকার করতে হবে। অধুনাপূর্ব বাংলা সাহিত্যে খুব কম লেখকের রচনাতেই ছন্দের এত বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। বস্তুতঃ ছন্দশিল্পী হিসাবে বড়ু চণ্ডীদাসকে জয়দেব ও ভারতচন্দ্রের সঙ্গে এক পর্যায়েই স্থান দিতে হয়। বড়ু চণ্ডীদাস অবশ্য জয়দেব ও ভারতচন্দ্রের মতো ছন্দোবিলাসী ছিলেন না, আর তাঁব ছন্দোগত কাককর্মও অপর দুজনের তুলনায় হুম্মার্জিত বা সুসজ্জিত নয়। পাবিপাট্য ও স্মারকতার বিচারে তাঁর রচনা ও-দুজনেব তুলনায় হীনপ্রভ বলেই মনে হবে, কিন্তু সহজাত বৈচিত্র্যপ্রবণতা এবং রচনাগত অকৃত্রিমতা বা সাবলীলতার বিচারে তাঁকে কিছুতেই ওঁদের তুলনায় হীনশক্তি মনে করা যায় না। এই হিসাবে তাঁর সঙ্গে একমাত্র ছন্দশিল্পী রামপ্রসাদেরই তুলনা করা যায়। দ্বিতীয়তঃ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে ছন্দোবিকাশের যে পরিণত রূপ দেখা যায় তা আকস্মিক হতে পারে না, তাকে একক প্রতিভার সৃষ্টি বলেও মনে করা যায় না। সম্ভেহ নেই, বাংলা

হৃদয় দীর্ঘকাল ধরে বিবর্তিত হয়ে অবশেষে বড়ু চণ্ডীদাসের প্রতিভার স্পর্শে এসে এমন বিচিত্র ও পরিণত রূপ লাভ করেছে। চর্যাগীতি ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মধ্যে যে বিপুল ব্যবধান, তা শুধু কালগত বা ভাষাগত নয়, ছন্দোগতও বটে। এই ব্যবধানকালে ছন্দোবিবর্তনের ইতিহাস রচনা এখনও নূতন আবিষ্কারের অপেক্ষায় আছে। সে ইতিহাস যখন রচিত হবে তখনই বাংলা ছন্দের বিবর্তনধারায় বড়ু চণ্ডীদাসের স্থান নির্ধারণ সম্ভব হবে।

৫ চৈত্র ১৩৭২

কৌলীয়া প্রথার উৎপত্তি

দীনেশচন্দ্র সরকার

বাংলাদেশের কুলপঞ্জিকা সংজ্ঞক গ্রন্থাবলীর কাহিনীতে কৌলীয়া উৎপত্তির সহিত দুইজন প্রাচীন নরপতির নাম সংযুক্ত দেখা যায়। এই নরপতিদ্বয়—আদিশুব ও বল্লালসেন। অল্পরূপভাবে মিথিলাদেশের কিংবদন্তী অহুসারে কর্ণাট বংশীয় অন্তিম রাজা হবিসিংহ বা হরসিংহ সেখানে কৌলীয়া প্রথা প্রবর্তন করিয়াছিলেন।

বাংলার কৌলীয়া মূলতঃ এবং প্রধানতঃ রাঢ়ীয় ও বাবেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের সমাজকে প্রভাবিত করে। এই সমাজ দুটির নাম দক্ষিণ পশ্চিম বাংলার রাঢ়দেশ এবং উত্তর বাংলার বরেন্দ্র দেশের সহিত সম্পর্কিত। ধীরে ধীরে কৌলীয়া প্রথা প্রভাব বৈজ্ঞানিক, কায়স্থ প্রভৃতি অন্যান্য সম্প্রদায়ের সামাজিক ব্যবস্থাতে বিস্তৃত হইয়াছিল। মিথিলার কৌলীয়া প্রথা ইতিহাসও অল্পরূপ। মধ্যযুগে মিথিলা এবং বাংলার সমাজব্যবস্থার মধ্যে যে একটা যোগসূত্র ছিল, তাহার প্রমাণ আছে। বাঙালী রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ সমাজের গাঙ্গুলী (গঙ্গোপাধ্যায়) গাঙ্গি মৈথিল ব্রাহ্মণদিগের গঙ্গুলী মূল গ্রামের সহিত অভিন্ন, তাহাতে সন্দেহ নাই। ‘গাঙ্গি’ শব্দ সংস্কৃত ‘গ্রামী’ শব্দের বিকার। ইহা পরিবারবিশেষের মূল বাসস্থানের দ্বারা নির্দেশিত।

কৌলীয়া প্রথা বাংলার সমাজব্যবস্থায়, বিশেষতঃ রাঢ়ীয় ও বাবেন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাজে, ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। ইহার কুফল আজ বাঙালীর অতীত সামাজিক ইতিহাসে একটি অধ্যায়ে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দিকেও বাঙালী সমাজ হইতে ইহা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় নাই এবং আজও যে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায় ও গঙ্গোপাধ্যায় এবং বঙ্গ কায়স্থ সমাজে ঘোষ, বসু, গুহ ও মিত্র কিংবা সামাজিক মর্যাদার অধিকারী, ইহা কৌলীয়া প্রথাই চিহ্নবিশেষ।

রাঢ়ীয় ও বাবেন্দ্রদিগের কৌলীয়া প্রথা মোটামুটি একরূপ। ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণেরা কুলীন, সিদ্ধশ্রোত্রিয়, সাধ্যশ্রোত্রিয় এবং কষ্ট বা কাষ্ঠশ্রোত্রিয়—এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন। নিয়ম ছিল যে, কুলীনের পুত্র কুলীন, সিদ্ধশ্রোত্রিয় ও সাধ্যশ্রোত্রিয় বংশে বিবাহ করিতে পারিবে; সিদ্ধশ্রোত্রিয়ের পুত্র সিদ্ধ ও সাধ্য শ্রোত্রিয় কুলের কন্যা বিবাহ করিবে; কিন্তু সাধ্য এবং কষ্ট শ্রোত্রীয় স্বকীয় শ্রেণীর বাহিবে বিবাহ করিতে পারিবে না। জীলোকের বেলায় ব্যবস্থা ছিল ইহার বিপরীত। সাধ্যশ্রোত্রিয় কন্যার বিবাহ সাধ্য ও সিদ্ধশ্রোত্রিয় এবং কুলীন বংশে হইতে পারিত; সিদ্ধশ্রোত্রিয়ের কন্যার বিবাহ সিদ্ধশ্রোত্রিয় এবং কুলীন শ্রেণীতে বিবাহিত হইত; কিন্তু কুলীন ও কষ্টশ্রোত্রিয় কন্যাদের বিবাহ নিজ নিজ শ্রেণীতে সীমাবদ্ধ ছিল। এই ব্যবস্থার ফলে কুলীন সমাজে বহুবিবাহ

প্রচলিত হয়। কুলীন ব্রাহ্মণেরা অনেকে শতাধিক বিবাহ করিতেন এবং বংশের একবার কবিতা বিভিন্ন খণ্ডরূপে পদার্পণ পূর্বক বণ্যাসম্ভব অর্থ আদায় করিতেন; ঐ অর্থই তাঁহাদের অনেকের জীবিকা নির্বাহ হইত। ‘বিক্রমপুত্রের ইতিহাস’ লেখক শর্গীয় যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ঢাকা জেলার মুন্সীগঞ্জ মহকুমার বজ্রযোগিনী গ্রামবাসী কৃষ্ণসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্নীসংখ্যা ছিল ২৮৭টি। ঐ শতাব্দীর শেষভাগে অভয়চন্দ্র দাস মহাশয় হইজেন কুলীন ব্রাহ্মণের কথা বলিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন ৬০ জন হতভাগিনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং অপরজনের পত্নীর সংখ্যা ছিল শতাধিক। এই ব্রাহ্মণবংশের একটি কবিতা খাতা ছিল; উহাতে তাঁহারা কোন্ কোন্ গ্রামে কাহার কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন, তাহা লিখিত ছিল। প্রতি বংশের শীতকালে তাঁহারা ঐ খাতা লইয়া একে একে প্রত্যেক স্ত্রীকে দর্শন দিতেন এবং খণ্ডবের আর্থিক অবস্থা অহুসারে অর্থ আদায় করিতেন। আবার অনেক কুলীন স্বামী কদাচিৎ বিভিন্ন স্ত্রীকে দর্শন দিতেন। ইহার ফলে সমাজে নানা রকমের ছন্নীতি প্রবেশ করিয়াছিল। কথিত আছে, জৈনক কুলীন নিজ খণ্ডরের সহিত নামসাদৃশ্য-বশতঃ ভুল কবিতা জামাতারূপে অপর এক ব্রাহ্মণের গৃহে উঠিয়াছিলেন এবং কিছুদিন পবে ঐ ব্রাহ্মণের প্রকৃত জামাতার আবির্ভাবে ভুলটি ধরা পড়ে। এইরূপ কেলেঙ্কারীর কাহিনী অগণিত। এই জাতীয় একটি কাহিনীর ভিত্তিতেই কথাসিদ্ধী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁহার ‘বামুনের মেয়ে’ উপন্যাস বচনা করিয়াছেন।

কুলপঞ্জিকার কাহিনী অহুসারে, বাংলাদেশে বেদবিদ ব্রাহ্মণের অভাব হেতু আদিশূর নামক রাজা যজ্ঞ সম্পাদনের জন্ত বর্তমান উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত কান্ধকুজ কিংবা কোলাঞ্চ হইতে পাঁচজন পণ্ডিত ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন। বলা হইয়াছে, এই পঞ্চ ব্রাহ্মণই বর্তমান রাঢ়ীয় ও বাবেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের আদিপুরুষ এবং তাঁহাদের পাতৃকা ও ছত্রবাহী পাঁচজন কায়স্থজাতীয় ভৃত্যের বংশধরগণই পবে কুলীন কায়স্থরূপে পরিগণিত হইয়াছেন। বাংলাদেশের স্থানীয় ব্রাহ্মণেরা সাতশতী নামে পরিচিত ছিলেন। অবশ্য কালক্রমে তাঁহারা সকলেই আপনাদিগকে রাঢ়ীয় ও বাবেন্দ্র বলিয়া পরিচয় দিয়া ঐ ঐ সমাজে মিশিয়া যাইতে সমর্থ হইয়াছেন।

আদিশূর কর্তৃক রাঢ়ীয় ও বাবেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের আদিপুরুষগণের বাংলাদেশে আনয়নের কাহিনী ঐতিহাসিক সমাজে গৃহীত হয় নাই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত History of Bengal, Vol I গ্রন্থে এ বিষয়ে নিম্নোক্ত সমালোচনা দেখা যায় : “As regards Adisura, different genealogies of his family are given in different texts; he is referred to as the grandfather (mother’s father) of Ballalasena in some and as that of a remote ancestor of Ballalasena in others. He is said to have been the ruler of Bengal and Orissa, but some authorities add Anga, Kalinga, Karnata, Kamarupa,

Saurashtra, Magadha, Malava and Gurjara to his dominions. Some say that the whole affair (i.e. the bringing of the Brahmanas) was peaceful, as Adisura had married the daughter of the Kanauj king, while, according to others, he fought with him (i.e. the king of Kanauj): and his capital, where he received the Brahmanas, is placed by some at Gauda and by others at Vikramapura. The reasons why the Brahmanas were brought by him are variously stated. Six different authorities put forward names of different religious ceremonies for the performance of which the Brahmanas were requisitioned. According to a seventh account, the king of Kasi (not Kanauj as in the other texts) being asked by Adisura to pay tribute refused to do so, and in reply tauntingly referred to Adisura's dominions as bereft of Brahmanas and Vedic sacrifices whereupon Adisura defeated him in battle and brought the five Brahmanas. The date of this event is also variously put down as Saka 654, 675, 804, 854, 864, 914, 954, 994 and 999, while three sets of names are given as those of the five Brahmanas."

এ সম্পর্কে আরও কিছু বলিবাব আছে। প্রথমতঃ, বাংলাদেশের ঐতিহাসিক উপাদানে আদিশুর নামক কোন বাজার অস্তিত্বের প্রমাণ নাই। কিন্তু নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে মৈথিল পণ্ডিত বাচস্পতি মিশ্র তদীয় সমসাময়িক জর্নৈক আদিশুররাজের উল্লেখ করিয়াছেন। এই আদিশুর সম্ভবতঃ পালসম্রাটগণের সামন্তরূপে মৈথিলী এবং উত্তর বাংলায় কিয়দংশ শাসন করিতেছিলেন। পালেরা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন বলিয়াই হয়ত ব্রাহ্মণলেখকের রচনায় ইঁহাকে কিছু প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। আবার এই আদিশুরের কোনও কীর্তি বা জয় তাঁহার নাম পূর্বভারতে পণ্ডিত ব্রাহ্মণ আনয়নের কাহিনীর সহিত যুক্ত হইতে পারে। এই অহুসানে কিছুমান সত্য থাকিলেও মৈথিলী কৌলীয়াপ্রথার নিকট বাংলার ঋণ স্বীকার কবিতো হয়।

দ্বিতীয়তঃ, আদিশুর কাহিনীতে শকাদেব উল্লেখ হইতে বোধ হয় যে, কাহিনীটি সেন আমলে বাংলাদেশে শকাদেব ব্যবহার সপ্রতিষ্ঠিত হইবাব পবে কল্পিত হইয়াছিল। তৃতীয়তঃ, চোলবংশীয় রাজা তৃতীয় কুলোত্তমের (১১৭৮-১২১৬ খ্রীষ্টাব্দ) আমলের একখানি শিলালেখ পাঠে অহুসিত হয় যে, আদিশুর কাহিনীটি মূলতঃ দক্ষিণ ভারত হইতে সেনবাজগণের সময়ে বাংলাদেশে আনীত হইয়াছিল। সেনেরা কর্ণাটদেশ হইতে আসিয়া বাংলায় উপনিবিষ্ট হন। বিদেশে স্প্রতিষ্ঠিত স্বদেশীয় বাজবংশের প্রসাদলোভী অনেকে সে সময়ে দক্ষিণ ভারত হইতে বাংলায় আসিয়া বাসস্থাপন করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। অবশ্য বাংলায় দক্ষিণ ভারতীয়দের উপনিবেশ স্থাপন পাল আমলেই

আরম্ভ হয়। পালবংশীয় রাজগণের মধ্যে অনেকে দক্ষিণী রাজবংশের কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের প্রসাদভোজীদের মধ্যে কর্ণাট এবং চোল জাতির উল্লেখ আছে। সুতরাং আদিমযুগে একটি দক্ষিণ ভারতীয় কিংবদন্তীর বাংলায় প্রবেশ খুব সম্ভব বলিয়া মনে হয়।

উপরে যে চোল শিলালেখের উল্লেখ করিয়াছি, উহাতে বলা হইয়াছে যে, অরিন্দম নামক একজন প্রাচীন নরপতি অন্তর্বেদী অর্থাৎ কান্ডুকুজ অঞ্চল হইতে অনেক পণ্ডিত ব্রাহ্মণ আনায়া চোল দেশে স্থাপন করিয়াছিলেন। এই ব্রাহ্মণদিগের সহিত তাঁহাদের পাতৃকা ও ছত্রবাহী ভূত্বরূপে যে শূদ্রগণ দক্ষিণে গিয়াছিল, তাহাবা বর্তমান তিরুচিবাঙ্গলী জেলায় পাঁচটি গ্রাম লাভ কবে এবং সেখানে বসতি স্থাপন করে। অরিন্দম এবং আদিশূরের কাহিনীদ্বয়ে আশ্চর্যজনক সাদৃশ্য দেখা যায়। আমাদের মনে এই যে, সেন আমলে অবিন্দমের কাহিনী বাংলায় প্রবেশ করিয়া কয়েক শতাব্দী পবে কুলপঞ্জিকার আদিশূরের কাহিনীতে আল্পপ্রকাশ করে। যে সকল কুলপঞ্জিকায় আদিশূরের কাহিনী উল্লিখিত হইয়াছে, উহার কোনটিই অত প্রাচীন নহে।

আদিশূর কর্তৃক যে পাঁচজন পশ্চিম দেশীয় ব্রাহ্মণ বাংলায় আনীত হইয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে; কুলপঞ্জিকাতে তাঁহাদের নামের তিনটি স্বতন্ত্র তালিকা পাওয়া যায় : (১) শান্তিল্যগোত্রীয় ক্ষিতীশ, ভারদ্বাজগোত্রীয় মেধাতিথি বা তিথিমৈধা, কান্দপগোত্রীয় বীতরাগ, বাৎস্তগোত্রীয় সুধানিধি এবং সাবর্ণগোত্রীয় সৌভরি; (২) শান্তিল্যগোত্রীয় ভট্টনারায়ণ, কান্দপগোত্রীয় শ্রীহর্ষ, বাৎস্তগোত্রীয় ছান্দড়, ভারদ্বাজগোত্রীয় দক্ষ এবং সাবর্ণগোত্রীয় বেদগর্ভ; (৩) শান্তিল্যগোত্রীয় নারায়ণ, বাৎস্তগোত্রীয় ধরাদর, কান্দপগোত্রীয় সুবেণ, ভারদ্বাজগোত্রীয় গৌতম, এবং সাবর্ণগোত্রীয় পরাশর। ইহা ছাড়াও বৈষম্য আছে; যেমন বেদগর্ভকে কখনও কখনও বাৎস্তগোত্রীয় বলা হইয়াছে। যাহা হউক, বলা হইয়াছে যে, ঐ পঞ্চগোত্রীয় ব্রাহ্মণদিগের বংশধরগণ সেনবংশীয় বল্লালসেনের (১১৫৯-৭৯ খ্রীষ্টাব্দ) নিকট কৌলীজ মর্যাদা প্রাপ্ত হন। কথিত আছে, রাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণদিগের ৫৬টি গাঞি মধ্যে বল্লাল ১৯ ব্যক্তিকে কৌলীজ দেন এবং বারেন্দ্রদিগের ১০০ গাঞি মধ্যে ৮ জন কুলীন, ৮ জন সৎ শ্রোত্রিয় ও ৮৪ জন কষ্টশ্রোত্রিয় বলিয়া নির্ধারিত করেন। বল্লালের পুত্র লক্ষ্মণসেন নাকি রাষ্ট্রীয় কুলীনেব সংখ্যা বাড়াইয়া ২১ করিয়াছিলেন এবং ১৪ জন গৌণ কুলীনের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। আবার পরবর্তীকালে রাজা দনোজ্যর্মাধব রাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণদিগকে কুলীন, সাধ্যশ্রোত্রিয়, সিদ্ধশ্রোত্রিয়, সুসিদ্ধ শ্রোত্রিয় এবং অরি বা কষ্টশ্রোত্রিয়—এই পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। বল্লালের নিয়মে সম্ভবতঃ রাষ্ট্রীয় ও বারেন্দ্র এবং কুলীন ও অকুলীনে বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল না; কিন্তু দনোজ্যার নিয়মে অরি বা কষ্টশ্রোত্রিয়ের কন্যা বিবাহ করিলে কুলীনেব কুলভঙ্গ হইত। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের সমাজে উদয়ন ভাট্টী পরিবর্ত-মর্যাদা স্থাপন করেন। তাঁহার ব্যবস্থিত আটটি পটী-বিভাগের ফলে বিবাহব্যবস্থা আরও কঠোর হয়। উদয়নেব নিয়মে

কাপক্সাঙ্গণেব জঙ্গ স্পর্শ কবিলেও কুলীনের কুলভঙ্গ হইত। রাজা কংসনারায়ণ শ্রোত্রিয়দিগকে সিদ্ধ, সাধ্য ও কষ্ট ভেদে শ্রেণীবদ্ধ কবিলেন। তাঁহার নিয়মে কাপক্সার সহিত কুলীনপুত্রের বিবাহ হইলে কোন কোন অবস্থায় কুলীনেব কুলভঙ্গ হইত না। পঞ্চদশ শতাব্দীতে দেবীবর ঘটক রাষ্ট্রীয় সমাজে মেলবন্ধন করিয়া পালটী ঘরে বিবাহেব ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত করেন। ইহা উদয়নেব পরিবর্ত-মর্যাদা ও পটীবন্ধনের অনুরূপ। ইহারই ফলে কুলীনবা বহুবিবাহের প্রশ্রয় দিতেন এবং অনেক কুলীন কস্তার বিবাহই হইত না। সমাজেব নৈতিক স্বাস্থ্য ইহাতে বিশেষভাবে কলুষিত হইয়াছিল।

বল্লাল কর্তৃক কৌলীয়া স্রষ্ট্রি কাহিনীটি ঐতিহাসিকেরা গ্রহণ করেন নাই। কারণ সেন যুগের সাহিত্য ও তাত্ত্বশাসনাদি হইতে ইহার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় নাই। আবার বৈষ্ণ জাতিব কুলপঞ্জিকা হইতে জানা যায় যে, ঐ সমাজে বিত্তা, অর্থ, সদাচার প্রভৃতি গুণের জন্ত লোকে কৌলীয়া মর্যাদা লাভ করিত এবং সমাজপতি, কুলপঞ্জিকাকার ও ঘটকেবাই সামাজিক মর্যাদা নির্ধারণ করিতেন। অধিকন্তু রাষ্ট্রীয় ও বারেন্দ্র সমাজের প্রভাবেই বৈষ্ণসমাজে কৌলীয়েব উদ্ভব হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। ষাছা হুটক, ১৬৭৫ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত ভবত মল্লিকের ‘চন্দ্রপ্রভা’তে বল্লালের নামোল্লেখ নাই এবং অর্থ সদাচার প্রভৃতিকেই কৌলীয়েব কারণ বলা হইয়াছে :

আচারাদয় এব হি সন্তি যেমাং মহামুগাম্।

ত এব হি কুলীনাঃ স্মার্য কুলং পারলৌকিকম্ ॥

ধনেন কুলমিত্যুক্তং সদাচারবতাং হি তৎ ॥

১৬৫৩ খ্রীষ্টাব্দে রচিত ‘কবিকঠোব’ বা ‘সবৈষ্ণকুলপঞ্জিকা’তে কিন্তু স্পষ্ট কবিয়াই বলা হইয়াছে যে, প্রাচীনদিগেব মতে আচারাদিই কৌলীয়েব কারণ, কিন্তু আধুনিকদের মতে বৈষ্ণবংশীয় নরপতি বল্লালসেন বৈষ্ণসমাজে কৌলীয়েব প্রবর্তন কবিয়াছিলেন :

আচারো বিনয়ো বিত্তা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্।

নিষ্ঠা বৃত্তিস্তপো দানং নবধা কুললক্ষণম্ ॥

প্রাচীনমতমেতদ্বি বদন্ত্যাধুনিকাঃ পুনঃ।

পূরা বৈষ্ণকুলোদ্ভূতবল্লালেন মহোজসা।

ব্যবস্থাপি চ কৌলীয়াং ছহিসেনাদিবংশজে ॥

সুতরাং বল্লালকর্তৃক বৈষ্ণসমাজে কৌলীয়াপ্রবর্তনেব কাহিনী সপ্তদশ শতাব্দী অপেক্ষা প্রাচীন নহে। আবার বল্লালকে বৈষ্ণগণ বৈষ্ণ এবং কায়স্থগণ কায়স্থ বলিয়া দাবী করেন ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি কর্ণাটদেশীয় ব্রহ্মক্ষত্রিয় বা কর্ণাটক্ষত্রিয় ছিলেন।

সম্প্রতি পালবংশীয় তৃতীয় বিগ্রহপালেব (আনুমানিক ১০৫০-৮০ খ্রীষ্টাব্দ) বনগাঁও তাত্ত্বশাসন হইতে পূর্বভারতীয় ব্রাহ্মণসমাজে কৌলীয়েব উদ্ভব এবং কুলপঞ্জিকা সাহিত্যের উৎপত্তির কারণ জানা গিয়াছে। বনগাঁও প্রাচীন মিথিলা বা তীরভুক্তি অর্থাৎ বর্তমান তীর্থহত বা উত্তববিহারের সাহাবসা জেলায় অন্তর্গত। এই জেলাটি ভাগলপুর জেলায়

গঙ্গার উত্তরতীরবর্তী অংশ লইয়া কিছুকাল পূর্বে গঠিত হইয়াছে। তাত্রাশাসনটি বিগ্রহপালের রাজত্বের ১৭শ বর্ষে অর্থাৎ আনুমানিক ১০৬৭ খ্রীষ্টাব্দে গঙ্গাতীরবর্তী কাঞ্চনপুর্ব হইতে বিদ্যুৎ সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে প্রদত্ত হইয়াছিল।

বনগাঁও তাত্রাশাসনদ্বারা বিগ্রহপাল তীরভুক্তি নামক প্রদেশের হোদ্রয় সংজ্ঞক বিষয় বা জেলার অন্তর্গত বসুকাবর্ত গ্রামের একাংশ নিষ্কর দান করিয়াছিলেন। দানপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণের নাম ঘাণ্টকশর্ম্মা। তিনি উত্তরবিহারের ইট্টাহাক বা ইট্টহোক গ্রামে বাস করিতেন; কিন্তু তাঁহার পবিত্রাব্যের আদি বাসস্থান ছিল কোলাঞ্চ। তিনি শান্তিল্যগোত্রীয় ও ছন্দোগ্যাখ্যাধ্যায়ী এবং যীমাংসা, ব্যাকরণও তর্কশাস্ত্রে নিপুণ ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম তুঙ্গ এবং পিতামহের নাম যোগেশ্বরী।

বনগাঁও তাত্রাশাসনের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ইহার নিম্নোক্ত ক্রোড়পত্র।—

ক্রোড়াঞ্চান্নিরিয়ায় কাচ্ছ ইতি যঃ সদ্ভ্রাহ্মণানাং স্থিতি-
 ত্ত্বান্দু গোহণকো দ্বিজোন্তমগৃহং বিশ্রামভূর্বজ্ঞনাম্।
 অন্মাদিক্কহলেতি যত্র বিবদো যোগেশ্বরো যৎসুতঃ
 খ্যাতস্তুঙ্গ ইতো'পি নির্মলবশা ঘটিশনামাস্তজঃ ॥
 যো গোড়াধিপতেরসীমগুণভু রাজে বিধেয়ো দিশাং
 ভূপালেবু বিধায় মৈত্ৰ্যমসমং সন্তুষ্টিচিন্তাচিতঃ।
 কৃত্বা শাসনমেতদাঙ্গহলতঃ কামপ্যবস্থ্যস্থিতিং
 বিশ্রামায় চ দীনদুঃখিতজনস্তাভুদিহৈবাপ্রমম্ ॥

ক্রোড়পত্রটি হইতে জানা যায় যে, বসুকাবর্ত গ্রামটি বিগ্রহপালের ঘটিশ নামক জনৈক মৈথিল ব্রাহ্মণ কর্মচারীর জাগীর বা জমিদারীর অন্তর্গত ছিল এবং তিনি রাজকোষে যথোপযুক্ত অর্থ জমা দিয়া রাজা বিগ্রহপালের দ্বারা উহা একাংশ কোলাঞ্চ ব্রাহ্মণ ঘাণ্টকশর্ম্মাকে নিষ্কর দানের ব্যবস্থা করাইয়াছিলেন। জনৈক কোলাঞ্চ ব্রাহ্মণের প্রতি একজন মৈথিল ব্রাহ্মণের এইরূপ অতিভক্তির কারণ কি? অবশ্যই তিনি কোলাঞ্চ ব্রাহ্মণটির সহিত আপনার কত্কা কিংবা স্বীয় পরিবারের অপর কাহাবও বিবাহের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য এই যে, মৈথিল ব্রাহ্মণ ঘটিশ অপব একজন কোলাঞ্চ ব্রাহ্মণের বক্তবিন্দু তাঁহার ধমনীতে প্রবাহিত বলিয়া গর্ব প্রকাশ করিয়াছেন। এই কোলাঞ্চ ব্রাহ্মণ ছিলেন ঘটিশের পিতামহের পিতামহীর পিতামহ। কোলাঞ্চ (ক্রোড়াঞ্চ) হইতে তীরভুক্তিতে আসেন কাচ্ছ; তাঁহার পুত্র গোহণক; গোহণকের কত্কা ইক্কহলা; তাঁহার গর্ভজাত বিবদ; বিবদের পুত্র যোগেশ্বর; যোগেশ্বরের পুত্র তুঙ্গ এবং তুঙ্গের পুত্র ঘটিশ। অতিদূরবর্তী কোলাঞ্চ ব্রাহ্মণের রক্তেব এই দাবী হইতে মৈথিল ব্রাহ্মণেরা পশ্চিমদেশীয় ব্রাহ্মণের সহিত বিবাহসম্পর্কের প্রতি কিরূপ মর্যাদা আরোপ কবিতেন, তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। এই আগ্রহ হইতেই কৌলীভপ্রথার উদ্ভব। আবার

এইরূপ দূরসম্পর্কেব বিবরণ লিখিয়া না রাখিলে দীর্ঘকাল পরে প্রমাণ করা সম্ভব ছিল না। তাই কুলপঞ্জিকার উৎপত্তি।

মধ্যযুগের ভারতীয় রাজগণ যে-সকল ব্রাহ্মণকে নিজের ভূমি দান করিয়াছেন বলিয়া জানা যায়, তাঁহাদের অনেকের পরিবাহের আদিবাস স্থান ছিল ক্রোড়াক্ষ, (কোলাক্ষ, ক্রোড়াক্ষ, ক্রোড়াক্ষ ইত্যাদি), মুক্তাবস্ত, শ্রাবস্তি তর্কারী প্রভৃতি আধুনিক উত্তরপ্রদেশের অন্তর্গত গ্রামসমূহ। ইহাদের মধ্যে শ্রাবস্তি, মুক্তাবস্ত ও তর্কারী বর্তমান গোণ্ডা-বহরাইচ জেলাস্থয়ের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে এবং কোলাক্ষ কাশ্মুজের নিকটে অবস্থিত ছিল বলিয়া মনে হয়। এই ব্রাহ্মণেরা যে বহুসংখ্যায় বাংলাদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। দশম-একাদশ শতাব্দীর শিলালেখ সমূহ হইতে জানা যায় যে, উত্তর বাংলার হিলি-বালুরঘাট অঞ্চলের প্রাচীন পাহনিযোজন নামটি পরিবর্তিত হইয়া শ্রাবস্তি নাম হয় এবং ঐ অঞ্চলের আর একটি স্থানের নাম হয় তর্কারী। উত্তর প্রদেশের শ্রাবস্তি ও তর্কারীবাসী ব্রাহ্মণদিগের উপনিবেশ বলিয়াই যে উত্তর বাংলার স্থানবিশেষের নাম শ্রাবস্তি ও তর্কারী হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। এইরূপ নামকরণের একটি স্পষ্ট বিচিত্র উদাহরণ মাদ্রাজের দক্ষিণ আর্কট জেলার পাটলিপুত্রম্। প্রাচীন মগধ রাষ্ট্রের রাজধানী বর্তমান পাটনার নিকটবর্তী পাটলিপুত্রের ভট্ট ব্রাহ্মণেরা উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়াই দক্ষিণ ভারতের ঐ স্থানটির নাম হইয়াছিল পাটলিপুত্রম্।

॥ প্রমাণপঞ্জী ॥

মহিমালক্ষ্য মজুমদাবকৃত 'গৌড়ে ব্রাহ্মণ'; লালমোহন ভট্টাচার্য বিজ্ঞানিধি প্রণীত 'সম্বন্ধ-নির্ণয়'; J. N. Bhattacharya—Hindu Castes and Sects; নগেন্দ্রনাথ বসু কৃত 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস' ও 'বিশ্বকোষ' (৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩০৬ হইতে); H. H. Risley—People of India; R. P. Chanda—The Indo-Aryan Races, History of Bengal, Vol. I, ed. R. C. Majumder; দীনেশচন্দ্র সরকার রচিত প্রবন্ধাবলী—Epigraphia Indica, Vol XXIX, pp 48ff.; Journal of the Asiatic Society, Letters, Vol XVIII, 1952, pp 171ff.; Indian Historical Quarterly, Vol. XXXVI, pp. 189ff.; J. N. Banerjea Volume. 1960, pp. 211ff.; বিশ্বভাবতী পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ, ১৩৭১ সাল, পৃষ্ঠা ১৩১ হইতে; ইত্যাদি।

পাতঞ্জল মহাভাষ্য

বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

বঙ্গাহ্বাদ

(পূর্বাহ্বাস্তি)

(পূর্বপক্ষ্যাক্ষেপবাতিক)

বার্তিক : ॥ * ॥ ভক্তানুবৃত্তিনির্দেশে সৰ্বণাগ্রহণমনগ্ৰহাৎ ॥ * ॥

ভাষ্য : ভক্তানুবৃত্তিনির্দেশে সৰ্বণানাং গ্রহণং ন প্রাপ্নোতি—“অস্ত্য চৌ” “যন্তেতি চ” ॥

কিং কারণম্ ?

অনগ্ৰহাৎ । ন হেতেহেণো যেহ্মবৃত্তৌ ॥

কে তর্হি ?

যেহ্মরসমায় উপদিষ্টে ॥

অনুবাদ : অনুবৃত্তিনির্দেশে (অর্থাৎ লক্ষ্যসংস্কারের জন্ত বিহিত শূত্রে যেখানে বর্ণ-নির্দেশ করা হইয়াছে, সেই স্থলে) সৰ্বণসমূহের গ্রহণ হইতে পারে না—যেমন, “অস্ত্য চৌ” (৭.৪.৩২), “যন্তেতি চ” (৬. ৪. ১৪৮) ॥

কি কারণে (“অস্ত্য চৌ”, “যন্তেতি চ” প্রভৃতি শূত্রে নির্দিষ্ট অ-কার ই-কাব প্রভৃতির দ্বারা তাহাদের সৰ্বণেবও গ্রহণ হইবে না) ?

যেহেতু (তাহারা অক্ষরসমায় পঠিত অ-কাব কিংবা ই-কাবের জ্ঞায়) অণ্- (-প্রত্যাহারান্তর্বর্তী) নহে । (“অস্ত্য চৌ”, “যন্তেতি চ” প্রভৃতি) অনুবৃত্তি স্থলে যে (সকল অ-কার কিংবা ই-কার উচ্চারিত হইয়াছে) ইহাও অণ্- (-প্রত্যাহারান্তর্বর্তী বর্ণ) নহে ॥

তবে কাহারা (অণ্) ?

যে-সকল (বর্ণ) অক্ষরসমায় উপদিষ্ট হইয়াছে (তাহারা কেবল অণ্) ॥

টিপ্পণী : পূর্বপক্ষী এক্ষণে একটি আপত্তি উত্থাপন করিতেছেন : বর্ণসমায় উপদিষ্ট অ-কার, ই-কার প্রভৃতি বর্ণ এবং আ-কার, ঈ-কার উ-কার প্রভৃতি যে সকল বর্ণ অক্ষর-সমায় উপদিষ্ট হয় নাই—উহারা যদি পবম্পর অত্যন্ত ভিন্ন হয়, তবে শূত্রে যে সকল স্থানে লক্ষ্য সংস্কারের জন্ত অ-কার, ই-কার প্রভৃতির নির্দেশ করা হইয়াছে, সে-সকল স্থলে আ-কাব, ঈ-কারাদির গ্রহণ হইতে পারে না । কেননা, গো-ব্যক্তি যেমন অশ্ব-ব্যক্তি হইতে অত্যন্ত ভিন্ন, সেইরূপ অ-কাব ব্যক্তিও আ-কাব ব্যক্তি হইতে অত্যন্ত ভিন্ন হওয়ায় অ-কারের দ্বারা আ-কারের গ্রহণ হইতে পারিবে না । ই-কার, উ-কার প্রভৃতির স্থলেও

সেই একই রূপ হইবে ॥ কিন্তু এই আপত্তিই উত্তবে বলা যাইতে পারে : “অকঃ সর্বর্ণে দীর্ঘঃ” (৬.১.১০১)—পূর্বোক্ত এই শ্রুতি যেমন “অণুদিং সর্বর্ণস্ত চাপ্রত্যয়ঃ” (১.১.৬৯) সর্বর্ণগ্রাহক এই শ্রুতিমুদারে অ-কারের দ্বারা আ-কারের গ্রহণও সিদ্ধ হইয়া থাকে, সেইরূপ যে সকল শ্রুতি শ্রুতকার অমুবন্ধরহিত অ-কার, ই-কার প্রভৃতি বর্ণ উচ্চারণ করিয়া কোনও কার্য বিধান করিয়াছেন, সেই সকল স্থলেও অ-কার, ই-কার প্রভৃতির দ্বারা বধাক্রমে সর্বর্ণ আ-কার, ঈ-কার প্রভৃতিরও গ্রহণ হইবে ।

কিন্তু এই সমাধানের বিরুদ্ধে পূর্বপক্ষী বলেন : “অকঃ সর্বর্ণে দীর্ঘঃ” (৬.১.১০১)—শ্রুতি অ-কারের দ্বারা যে সর্বর্ণ আ-কারেরও গ্রহণ হইয়া থাকে, তাহার অস্ত্র কারণ আছে । সেখানে অকারের পর ক-কার যোজনায় দ্বারা শ্রুতকার ইচ্ছিতে জানাইয়াছেন যে, সেই অ-কারটি আক্ষরসমাম্বায়িক অ-কার । এবং “অণুদিং সর্বর্ণস্ত চাপ্রত্যয়ঃ” (১.১.৬৯) শ্রুতিও অ-কারের উত্তর ণ-কার যোজনায় দ্বারা শ্রুতকার আক্ষরসমাম্বায়িক অণু-প্রত্যাহারান্তর্গত অ-কারাদি বর্ণেরই সর্বর্ণ-গ্রাহকত্ব অমুশাসন করিয়াছেন । কিন্তু যে সকল শ্রুতি অ-কারাদি বর্ণের উত্তর শ্রুতকার ক-কারাদি কোনও ইৎসংজ্ঞক বর্ণ যোজনা করেন নাই, সেই সকল স্থলে উচ্চারিত অ-কারাদি বর্ণের আক্ষরসমাম্বায়িকত্ব শ্রুতি না হওয়ায় “অণুদিং সর্বর্ণস্ত চাপ্রত্যয়ঃ” (১.১.৬৯) শ্রুতিমুদারে আ-কারাদি সর্বর্ণের গ্রহণ সিদ্ধ হইতে পারে না । যেমন, “অস্ত চৌ” (৭.৪.৭২) শ্রুতি পাণিনি চি-প্রত্যয় [“অভূততত্ত্বাবে কৃত্ততিষোগে সম্পত্ত-কর্তরি চিঃ” (৫.৪.৫০)] পরে থাকিলে অ-কারান্ত অল্পেব অন্ত্যবর্ণের (অর্থাৎ অ-কারের) স্থানে ঈ-কারাদেশ বিধান করিয়াছেন । [“ঈ ভ্রা-ধোঃ” (৭.৪.৩১) শ্রুতি হইতে “ঈ” অমুবৃত্ত হইতেছে ।] কিন্তু তিনি শ্রুতি কেবলমাত্র ক-কারাদি চিহ্নরহিত অ-কার (‘অস্ত’) উচ্চারণ করিয়াছেন । সুতরাং সেই অ-কারটি আক্ষরসমাম্বায়িক অ-কার না হওয়ায় উহার দ্বারা সর্বর্ণ আ-কারের গ্রহণ হইতে পারিবে না । ফলে, ‘গুরু’ প্রভৃতি যে সকল শব্দ অ-কারান্ত সেই সকল শব্দের উত্তর চি প্রত্যয় হইলেই কেবলমাত্র তাহাদের অন্ত্য অ-কারের স্থানে ঈ-কারাদেশ হইবে । যথা—গুরুভবতি । কিন্তু ‘মালা’, ‘খটী’ প্রভৃতি যে সকল শব্দ আ-কারান্ত, চি প্রত্যয় পরে থাকিলে তাহাদের অন্ত্য আ-কারের স্থানে ঈ-কারাদেশ হইতে পারিবে না । সুতরাং ‘মালীভবতি’, ‘খটীভবতি’ প্রভৃতি চি প্রত্যয় নিম্ন পদ সিদ্ধ হইবে না । সেইরূপ “যন্তোতি চ” (৬.৪.১৪৮) শ্রুতি ঈ-কার এবং ষ-কারাদি এবং অজাদি তদ্ধিত প্রত্যয় পরে থাকিলে আচার্য ই-কারান্ত এবং অ-কারান্ত ভ-সংজ্ঞক অল্পেব [দ্রষ্টব্য : “যচি ভম্” (১.৪.৪০)] অন্ত্য বর্ণের (অর্থাৎ ই-কার এবং অ-কারের) লোপ বিধান করিয়াছেন । কিন্তু যেহেতু তিনি ই-কার এবং অ-কারের উত্তর ক-কারাদি কোনও ইৎসংজ্ঞক বর্ণ যোজনা করেন নাই, সেই হেতু উহাদের আক্ষর-সমাম্বায়িকত্ব শ্রুতি না হওয়ায় “অণুদিং সর্বর্ণস্ত চাপ্রত্যয়ঃ” শ্রুতিমুদারে ঈ-কার অথবা আ-কারের গ্রহণ হইতে পারিবে না । ফলে, ই-কারান্ত এবং অ-কারান্ত ভ-সংজ্ঞক অল্পেবই কেবলমাত্র ঈ-কার এবং ষাদি ও অজাদি তদ্ধিত প্রত্যয় পরে থাকিলে অন্ত্য লোপ হইবে,

ঈ-কারান্ত অথবা আ-কারান্ত অঙ্গের স্থলে এই বিধি প্রযুক্ত হইবে না। অতএব দাক্ষী, আত্রেয়ঃ, গোবী, দাক্ষিঃ প্রভৃতি পদই সিদ্ধ হইবে; “বিনতায়্য অপত্যং পুমান্” এই অর্থে আ-কারান্ত বিনতা-শব্দেব উত্তর “ঈভ্যো ঢক্” (৪.১.১২০) স্ত্রীরাহসাবে ঢক্ প্রত্যয় যোগে “বৈনতেয়ঃ” এইরূপ পদ সিদ্ধ হইতে পারিবে না।^১

কৈয়ট ‘অমুবৃত্তি নির্দেশ’ শব্দের অর্থ করিয়াছেন : “বৃত্তিঃ শাস্ত্রস্ত লক্ষ্যে প্রবৃত্তিঃ। ভদ্রলুগভো নির্দেশোহমুবৃত্তিনির্দেশঃ ॥”—প্রদীপ।

“(প্রদীপে) ভদ্রলুগভ ইতি। সাফাৎ লক্ষ্যসংস্কারকবোধজনক ইত্যর্থঃ ॥”

—নাগেশ : উদ্যোত।

(একদেশিসমাধানবার্তিক)

বার্তিক : ॥১॥ একত্বাদকারন্ত সিদ্ধম্ ॥১॥

ভাষ্য : একোহয়মকারে যশ্চাক্ষরসমাম্মায়ে, যশ্চানুবৃত্তৌ, যশ্চ ধাত্বাদিষুঃ ॥

ভাষ্যানুবাদ : যে (অ-কার) অক্ষরসমাম্মায়ে (উপদিষ্ট হইয়াছে), যে (অ-কার) অমুবৃত্তি (নির্দেশে দৃষ্ট হইয়া থাকে), এবং যে (অ-কার) ধাত্বাদিষু—সেই অ-কার এক(ই) (ব্যক্তি)।

টীকণী : “একত্বাদকারন্ত সিদ্ধম্” এই বার্তিকটি পূর্বপক্ষিকর্তৃক প্রদর্শিত আক্ষেপেব সমাধানরূপে পঠিত হইয়াছে। কিন্তু ইহা সিদ্ধান্তবার্তিক নহে। ইহা একদেশীর সমাধান বুদ্ধিতে হইবে। এই বার্তিকে বলা হইতেছে : পূর্বপক্ষী যে আপত্তি কবিয়াছেন যে, অমুবৃত্তি-নির্দেশস্থ অ-কারাদি বর্ণের দ্বারা সর্বর্ণের গ্রহণ হইবে না; কেন না সেই অ-কার অণ-প্রত্যাহারান্তর্বর্তী অ-কার নহে—ইহা যুক্তিযুক্ত নহে। কেন না, অ-কার মাত্র একটিই আছে। ভিন্ন ভিন্ন অ-কার নাই। সুতরাং অক্ষরসমাম্মায়ে যে অ-কার পঠিত হইয়াছে, অমুবৃত্তি নির্দেশস্থ অ-কার এবং ধাত্বাদিষু অ-কার তাহার সহিত সম্পূর্ণরূপে অভিন্ন। অতএব আক্ষরসমাম্মায়িক অ-কার যেমন ‘অণ্’ অমুবৃত্তিনির্দেশস্থ এবং ধাত্বাদিষু অ-কারও তুল্যভাবে ‘অণ্’। সুতরাং অমুবৃত্তি-নির্দেশস্থ অ-কারাদির দ্বারাও তুল্যভাবে সর্বর্ণের গ্রহণ হইতে পারিবে ॥

কিন্তু প্রশ্ন হইতে পাবে : উদাস্ত, অমুদাত্তাদি স্বরভেদে, ঙ্রতবিলম্বিতাদি বৃত্তিভেদে অ-কারের ত’ ভিন্নরূপে প্রতিভাস হইয়া থাকে? সুতরাং উচ্চারণভেদে অ-কারও ভিন্ন হইবে না কেন? ইহাব উত্তরে একদেশী বলেন : ক্ষোটিবরূপ নিত্য অ-কার ব্যক্তি অভিন্ন হইলেও উচ্চারিত ধ্বনিভেদবশতঃ তাহা ভিন্নরূপে প্রতিভাত দিয়া থাকে। যে ধ্বনি (sound) আমরা উচ্চারণ করিয়া থাকি, তাহাই অ-কাবাদি বর্ণ নহে। উচ্চারণ ধ্বনির দ্বারা সেই নিত্য অ-কাবাদি বর্ণব্যক্তি অভিব্যক্ত হইয়া থাকে মাত্র। সুতরাং যদিও

১। ঙ্র “এবমিকাবাদবোধপি ‘ইকো যণ্টি’—ইত্যাদৌ এব গ্রাহকাঃ স্মার্ত্ত্ব “এবনেকাচো—” ‘যন্তেতি চ’ ইত্যাদৌ”—ভট্টোজ দীক্ষিতঃ শব্দকৌস্তভ, পৃ. ৪৫ (চৌধাষা সংস্করণ, কাশী)।

ব্যঞ্জক ধ্বনির ভেদবশতঃ ব্যঙ্গ্য বর্ণক্ষোভও ভিন্নরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে বটে তথাপি বস্তুতঃ অ-কারাদি বর্ণক্ষোভ নিত্য এবং এক। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে : একই মুখ খড়া, তৈল, আদর্শ প্রভৃতি বিভিন্ন আশ্রয়ে প্রতিবিম্বিত হইলে যেমন ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করে, কিন্তু ইহার দ্বারা যেমন বিষস্থানীয় মুখের অনেকত্ব সাধিত হইতে পারে না, সেইরূপ উচ্চাৰ্যমাণ ব্যঞ্জক ধ্বনিভেদে ব্যঙ্গ্য অ-কারাদি বর্ণ নিত্য, এক এবং অভিন্ন হইলেও অনিত্য, অনেক এবং ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে। কিন্তু এই ভেদপ্রতীতি পারমার্থিক নহে, ইহা অবাস্তব এবং মিথ্যা। ব্যঞ্জকগত অনিত্যত্ব, বহুত্ব, ভিন্নত্ব প্রভৃতি ধর্ম ব্যঙ্গ্য বর্ণে উপচরিত হওয়ার ফলেই এইরূপ ভেদপ্রতিভাস ঘটয়া থাকে।

একদেশী ব্যক্তি-ক্ষোভ পক্ষ আশ্রয় কবিত্ব পূর্বপক্ষীর আক্ষেপের এইরূপ সমাধান নির্দেশ করিয়াছেন, বুঝিতে হইবে। সেইজন্য ‘ছায়া’ টীকায় বলা হইয়াছে—“দুষ্মিত্ত্বমেকদেশিমতেন উত্তরমাহ—একত্বাদিতি ॥”

দ্র° : “একত্বাদিকারস্তেতি” একৈবাকার ব্যক্তিঃ, উদাস্তাদিভেদপ্রতিভাসমুৎপাদ্য ব্যঞ্জক-ধ্বনিকৃতঃ, খড়া-তৈলাদর্শাদিভেদে প্রতিবিম্বপ্রতিভাসভেদবৎ। অ-কারস্য নিদর্শনার্থ-ত্বাদিকারাদীনামপ্যেক্যং বোদ্ধব্যম্”—কৈয়টঃ ‘প্রদীপ’ ॥

(আক্ষেপবাস্তবিক)

বাস্তবিক : ॥*॥ অনুবন্ধসঙ্করস্ত ॥*॥

ভাষ্য : অনুবন্ধসঙ্করস্ত প্রাপ্নোতি। “কর্মণ্যণ্” “আতোহমুপসর্গে কঃ” ইতি কেহপি গিংকৃতং প্রাপ্নোতি ॥

ভাষ্যানুবাদ : (অ-কার ব্যক্তি এক হইলে) কিন্তু অনুবন্ধ (-কার্য্য-) সমূহেব (মধ্যে ভেদাতাবশতঃ পরস্পর) সঙ্কর (-দোষের) প্রাপ্তি হইবে। “কর্মণ্যণ্” (৩.২.১), “আতোহমুপসর্গে কঃ” (৩.২.৩) (প্রভৃতি স্থলে) ক-প্রত্যয় (স্থলে) ও গিৎ-প্রযুক্ত কার্য্যের প্রাপ্তি হইবে ॥

টিপ্পণী : এক্ষণে পূর্বপক্ষী একদেশীর ব্যক্তি-ক্ষোভের বিরুদ্ধে যুক্তি দেখাইতেছেন : যদি অ-কার ব্যক্তি এক এবং অভিন্নই হয়, তবে ‘ক’, ‘অণ্’, ‘ট’ প্রভৃতি প্রত্যয়ের মধ্যে কোনও ভেদ থাকিবে না। কেননা ‘ক’, ‘অণ্’, ‘ট’ প্রত্যয়ের ক্, ণ্, এবং ট বর্ণাঙ্কমে ইংসংজ্ঞক (অর্থাৎ অনুবন্ধ) হওয়ায় উহাদের লোপ হইলে কেবল অ-কারমাত্রই প্রত্যয়রূপে অবশিষ্ট থাকিবে। এবং একদেশিমতে অ-কারের একত্ব সিদ্ধ হওয়ায় ‘ক’, ‘অণ্’, ‘ট’ প্রভৃতি প্রত্যয়ের মধ্যে পরস্পর কোনও ভেদই থাকিবে না। ফলে ‘ক’ প্রত্যয়ের স্থলে যে সকল কার্য্য বিহিত হইয়াছে, ‘ট’, ‘অণ্’ প্রভৃতি প্রত্যয়ের স্থলেও সেই সকল কার্য্য হইতে পারিবে। সেইরূপ ‘ট’ ‘অণ্’ প্রভৃতি প্রত্যয়ের স্থলে বিহিত কার্য্য ‘ক’, ‘অণ্’ প্রভৃতিব স্থলেও হইবে। যথা—‘গাং দদাতি’ এই স্থলে ‘আতোহমুপসর্গে কঃ’ (৩.১.৩) স্ত্রজ্ঞানসাবে গো-উপপদের পববর্তী দা-ধাতুর উত্তর ‘ক’ প্রত্যয় যোগে ‘গোদঃ’ এই পদটি সিদ্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু একদেশীয় সমাধান স্বীকার করিয়া লইলে

‘ক’ প্রত্যয় এবং ‘অণ্’ প্রত্যয়ের মধ্যে কোনও ভেদ না থাকায় ‘অণ্’ প্রত্যয়ের কার্য-সমূহও ‘ক’ প্রত্যয়ের স্থলে হইবে। ফলে, ‘ক’ প্রত্যয় পরে থাকিলেও গিত্ত্ব প্রযুক্ত ‘আতো যুক্ত চিৎকৃতোঃ’ (৭. ৩. ৩৩) স্মৃত্যনুসারে দা-ধাতুর ‘যুক্ত’ আগম প্রাপ্ত হইবে, এবং ‘গোদায়ঃ’ এইরূপ পদও সিদ্ধ হইবে। সেইরূপ ‘গোদ’ শব্দের ক্রীলিঙ্গে ‘গোদা’ পদের স্থায় ‘ট’ প্রত্যয়স্থলে প্রাপ্ত ‘টিড্‌চাণঞ—(৪. ১. ১৫) স্মৃত্যনুসারে ‘ভীপ্’ যোগে ‘গোদী’ এইরূপ পদও হইতে পারিবে ॥

অতএব একদেশীয় ব্যক্তিস্ফোট সিদ্ধান্ত মানিয়া লইলে অনুবন্ধ কার্যের মধ্যে পরস্পর সঙ্কর উপস্থিত হওয়ায় অনিষ্ট পদ সিদ্ধ হইবে। সুতরাং একদেশি-প্রদর্শিত অ-কারাদি বর্ণের একত্ব স্বীকাব করিয়া লওয়া যায় না ॥

দ্র°—“অনুবন্ধ-সঙ্কর ইতি। একত্বে কাণ্‌টাদীনাং ভেদাভাবাৎ গোদাদৌ ভীবাদি প্রাপ্নোতি ॥”—প্রদীপ।

অপি চ—“(প্রদীপে) ভীবাদীতি ॥ ‘টিড্‌চে—’ ত্যাদিনা। আদিনা গিত্ত্বপ্রযুক্তযুক্ত। পর্যায়েণ কিত্ত্ব গিত্ত্ব-প্রযুক্ত কার্যায়োরপ্যবিরোধ ইতি ভাবঃ ॥”—উদ্যোত ॥

(আক্ষেপবার্তিক)

বার্তিক : ॥*॥ দ্রব্যবচোপচারাঃ ॥*॥

ভাষ্য : দ্রব্যবচোপচারাঃ প্রাপ্নুবন্তি। তন্তথা—দ্রব্যেযু নৈকেন ঘটনানেকো যুগপৎ কার্যং কৰোতি, এবমিমমকারং নানেকো যুগপৎক্কারয়েৎ ॥

ভাষ্যানুবাদ : (যদি অ-কাব ব্যক্তি এক এবং অভিন্ন হয়, তবে তাহাব স্থলে) দ্রব্যের স্থায় ব্যবহার প্রাপ্ত হইবে। যেমন—দ্রব্যের স্থলে একটি ঘটের দ্বারা অনেক (ব্যক্তি) যুগপৎ কার্য করিতে পারে না, সেইরূপ (অ-কার ব্যক্তি একটি হইলে) অনেক (ব্যক্তি) যুগপৎ সেই একটি (অ-কার-) কে উচ্চারণ করিতে পারিবে না ॥

টিপ্পণী : পূর্বপক্ষী একদেশিসম্মত অ-কারাদি বর্ণব্যক্তির একত্বের বিরুদ্ধে আব একটি আপত্তি উল্লেখ করিতেছেন। লোকে দেখা যায় যে একটি দ্রব্যের সাহায্যে কোনও এক সময়ে একটিমাত্র কার্যই নিষ্পন্ন হইতে পারে। যুগপৎ অনেকবিধ কার্য নিষ্পন্ন হইতে পারে না। যেমন, একটি ঘটের সাহায্যে কোনও এক ব্যক্তি একক্ষণে উদকাহরণ প্রভৃতি কোনও একটিমাত্র ক্রিয়াই নিষ্পাদন করিতে পারে। বহু ব্যক্তি একই ঘটের সাহায্যে একই ক্ষণে বহুবিধ কার্য সম্পাদন করিতে পারে না। এই নিয়মানুসারে, অ-কারের একত্ব সিদ্ধ হইলে একই ক্ষণে অনেক ব্যক্তি সেই একই অ-কারের উচ্চারণ করিতে পারিবে না। কিন্তু ব্যবহারে দেখা যায় যে যুগপৎ অনেক ব্যক্তি অ-কারের উচ্চারণ করিতেছে। অতএব স্বীকাব করিতে হয় যে, একদেশিসম্মত অ-কারাদি বর্ণের একত্ব-সিদ্ধান্ত অবৈজ্ঞানিক ॥

দ্রষ্টব্য : “জব্যবদিত্তি ॥ উপচারো ব্যবহারঃ। যথা একেন ঘটেনোদকাহরণাদি-
ক্রিয়াং যুগপদনেকো ন কবোতি, তথৈব একমকারং যুগপদনেকো নোচ্চারয়েদিত্যর্থঃ ॥”
—প্রদীপ ॥

(প্রথমাক্ষেপনিয়াকবণবার্তিক)

বার্তিক : ॥৩॥ বিষয়েণ তু নানালিঙ্গকরণাং সিদ্ধম্ ॥৩॥

ভাষ্য : যদয়ং বিষয়ে বিষয়ে নানালিঙ্গমকারং কবোতি—“কর্মণ্যণ্” “আতোহমুপসর্গে
কঃ” ইতি, তেন জ্ঞায়তে—অমুবন্ধসঙ্করোহন্তীতি। যদি হি স্ত্রাং, নানা-
লিঙ্গকরণমনর্থকং স্ত্রাং ; একমেবায়ং সর্বগুণমুচ্চারয়েৎ ॥

ভাষ্যানুবাদ : (আচার্য) যে বিষয়ভেদে অ-কারকে নানা (-বিধ) লিঙ্গ (-বিশিষ্ট
ভাবে উপদেশ) করিয়াছেন,—যেমন, “কর্মণ্যণ্” (৩.২.১), “আতোহমুপসর্গে কঃ”
(৩.২.৩) প্রভৃতি স্ত্রো, তাহার দ্বারা জানা যাইতেছে যে, “অমুবন্ধ (-কার্য-) সমূহের
(যথো ভেদাভাব বশতঃ পরস্পর) সঙ্কর (-দোষের প্রসঙ্গ) হইবে না।” (কেন না,)
যদি (অমুবন্ধসঙ্কর) হইত, (তবে বিষয়ভেদে অ-কারের উদ্ভব) নানা লিঙ্গ যোজনা
অনর্থক হইত। (তাহা হইলে, আচার্য) সর্ববিধ অমুবন্ধবিশিষ্ট একটিমাত্র (অ-কারই)
উচ্চারণ করিতেন।

টিপ্পনী : একদেশী বর্তমান বার্তিকে অ-কারের একত্বের বিরুদ্ধে পূর্বপক্ষি-প্রদর্শিত
প্রথম আক্ষেপ—“অমুবন্ধসঙ্করস্ত” ধ্বংস করিতেছেন। একদেশী বলিতেছেন : “অ-কার-
ব্যক্তি এক হইলে ‘ক’ ‘অণ্’ ‘ট’ প্রভৃতি প্রত্যয়ের মধ্যে কোনও ভেদ না থাকায় সর্বত্রই
কিছু, গিছু এবং টিছু প্রযুক্ত কার্য হইবে—পূর্বপক্ষী যে এইরূপ আপত্তি উত্থাপন করিয়া-
ছিলেন, সেই আপত্তি অযৌক্তিক। যদি ‘ক’ ‘অণ্’ ‘ট’ প্রভৃতি প্রত্যয়স্ব অ-কারের
কার্যভেদ স্ত্রকারের অভিপ্রেত না হইত, তবে তিনি একই অ-কারকে যথাক্রমে ক-কার,
ণ-কার এবং ট-কার অমুবন্ধ যোজনা করিয়া উচ্চারণ করিতেন না। কিন্তু যেহেতু বিভিন্ন
স্ত্রো স্ত্রকার অ-কারকে বিভিন্ন লিঙ্গ বা চিহ্ন বা অমুবন্ধ-যুক্তভাবে উপদেশ করিয়াছেন,
ইহার দ্বারা ইহাই স্থচিত হইতেছে যে, অ-কার ব্যক্তিটি এক এবং অভিন্ন হইলেও অমুবন্ধ-
ভেদবশতঃ বিভিন্ন স্থলে কিছু, গিছু, টিছু-প্রযুক্ত বিভিন্ন প্রকার কার্য হইবে। যদি ক,
অণ্, ট প্রভৃতি প্রত্যয়ের মধ্যে পরস্পর কার্যভেদ স্ত্রকারের অভিমত না হইত [‘ক’
প্রত্যয়ের স্থলেও যদি গিৎ-কার্য কিংবা টিংকার্যও হউক—স্ত্রকার এইরূপ ইচ্ছা করিতেন]
তাহা হইলে স্ত্রকার বিভিন্ন স্থলে অ-কারকে বিভিন্ন অমুবন্ধ যুক্তভাবে উচ্চারণ না করিয়া
‘ক্’, ‘গ্’, ‘ট্’ প্রভৃতি সকল প্রকার অমুবন্ধ যুগপৎ যোজনা করিয়া অ-কার উচ্চারণ
করিতেন—“কর্মণ্যণ্” (৩.২.১) প্রভৃতি স্ত্রো না করিয়া “কর্মণি কণট্”—ইত্যাদি স্ত্রো
করিতেন। অতএব অ-কার ব্যক্তি স্বতঃ এক এবং অভিন্ন হইলেও বিভিন্ন অমুবন্ধের সহিত

সম্পর্কবশতঃ তাহার ভিন্ন ভিন্ন কার্য ঘটয়া থাকে—ইহাই স্বরূপকাবে অভিপ্ৰায়। সুতরাং পূর্বপক্ষী যে “অম্ববন্ধসঙ্কর”—এই বার্তিকে একদেশি-সম্মত অ-কার্যব একত্বের বিরুদ্ধে অম্ববন্ধপ্রযুক্ত কার্যের পরস্পর সঙ্কর দোষ উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

দ্রষ্টব্য : “গুণা অম্ববন্ধাঃ, কার্যাদিশ্রিতত্বাহপকারকত্বাৎ। তত্র “কর্মণি কণ চ” ইতি ত্রয়াদিত্যর্থঃ ॥”—প্রদীপ।

(দ্বিতীয়াক্ষেপবার্তিক)

বার্তিক : ॥১॥ একাজনেকাজ্ গ্রহণেচ্চ চানুপপত্তিঃ ॥১॥

ভাষ্য : একাজনেকাজ্ গ্রহণেচ্চ চানুপপত্তির্ভবতি ॥

তত্র কো দোষঃ ?

কিরিণা—গিরিণা—ইত্যেকাজ্ লক্ষণমন্তোদাস্তত্ত্বং প্রাপ্নোতি ।

ইহ চ ঘটন ভরতি—ঘটিক ইতি, দ্ব্যজ্ লক্ষণে ন প্রাপ্নোতি ॥

ভাষ্যানুবাদ : পূর্বপক্ষী একদেশি-সমাদানের বিরুদ্ধে দোষান্তর উদ্ভাবন করিতেছেন : “যদি অ-কারাদি বর্ণব্যক্তির একত্ব সিদ্ধ হয়, তবে নানারূপ অনিষ্টপ্রসঙ্গ হইবার সম্ভাবনা। যথা : “সাবেকাত্তৃতীয়াদিবিভক্তিঃ” (৬.১.১৬৮)—স্বরবিধায়ক এই স্বত্রে আচার্য কর্তৃক সপ্তমীর বহুবচনে (‘সু’-বিভক্তি পরে থাকিলে) যে সকল শব্দ ‘একচ্’, সেই সকল শব্দের উত্তর তৃতীয়া প্রভৃতি বিভক্তির উত্তর উদাস্তস্বর বিহিত হইয়াছে। যেমন, ‘বাচ্’ শব্দের সপ্তমীর বহুবচনে ‘বাক্’ এইরূপ পদ হইয়া থাকে। অতএব ‘সু’ বিভক্তি পরে থাকিলে ‘বাচ্’ শব্দটি একচ্, অর্থাৎ একস্বরবর্ণবিশিষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং তৃতীয়া প্রভৃতি বিভক্তিতে ‘বাচ্’ শব্দের পববর্তী বিভক্তিটিই উদাস্ত হইবে। এবং যেহেতু প্রকৃতি-প্রত্যয়-সমুদায়ান্নক পদে একটিমাত্র অক্ষরই কেবলমাত্র উদাস্ত হইতে পারে [ত্র° “অমুদাস্তং পদমেকবর্জম্” (৬.১.১৫৮)], সেইহেতু তৃতীয়াদি বিভক্তির উদাস্ত হইলে প্রকৃতিভাগ (‘বাচ্’) অমুদাস্ত হইবে। সুতরাং তৃতীয়াদি বিভক্তিতে ‘বাচা’ ‘বাগ্ভ্যাম্’ প্রভৃতি পদ অন্তোদাস্ত হইবে। এক্ষণে অ-কাবাদি বর্ণ যদি এক এবং অভিন্ন হয়, তাহা হইলে ‘গিবি’ শব্দটিও ‘বাচ্’ শব্দের স্থায় ‘একচ্’ বলিয়া গণ্য হইবে। যেহেতু গ-কারের উত্তর ই-কার এবং র-কারের উত্তর ই-কার এই উভয় ই-কারই অভিন্ন। সুতরাং ‘গিরি’ শব্দে একটিমাত্র ই-কার থাকায়, ‘বাচ্’ শব্দের স্থায় ইচ্চাও একচ্, হইবে। ফলে, তৃতীয়াদি বিভক্তিতে “সাবেকাত্তঃ—” স্বত্ৰাহুসারে ‘গিরিণা’ ‘গিরিভ্যাম্’ প্রভৃতি পদ অন্তোদাস্ত হইবে। সেইরূপ ‘কিরিণা’, ‘কিরিভ্যাম্’ ইত্যাদি পদও অন্তোদাস্ত হইবে। কিন্তু ইহা অনিষ্ট।

[প্রশ্ন হইতে পারে : ভাষ্যকার কি জ্ঞাত অ-কারস্বয়যুক্ত ‘ঘট’ প্রভৃতি শব্দ উদাহরণরূপে প্রদর্শন না করিয়া ই-কারান্ত ‘গিবি’, ‘কিরি’ শব্দস্বর উদাহরণরূপে উল্লেখ করিলেন ? ইহার উত্তরে কৈয়ট বলিয়াছেন,—“ন গো-শ্বনং-সাববর্ণ-রাডঙ-তুঙ-কৃৎভ্যঃ” (৬.১.১৮২)—এই

স্বত্রানুসারে প্রথমার একবচন স্ব-বিভক্তিতে যে সকল প্রাতিপাদিক অ-বর্ণান্ত একাচ্-
হইলেও সেই সকল প্রাতিপাদিকের পরবর্তী তৃতীয়াদি বিভক্তির উদাস্তত্ব প্রতিষিদ্ধ হওয়ায়
ভাষ্যকার ‘ঘট’ প্রভৃতি অ-কারান্ত শব্দ উদাহরণরূপে উল্লেখ না করিয়া ‘গিরি’ প্রভৃতি
ই-কারান্ত প্রাতিপাদিকই উদাহরণরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। ঙ্—“কিরিণেতি ।
‘ন গো-শ্বনৃ-সাববর্ণে’-তি প্রতিষেধাদকারো নোদাহতঃ ॥”—কৈয়ট ।]

অনেকাজ্-গ্রহণ স্থলেও অনিষ্ট প্রসঙ্গ হইবে। যথা—“নৌ-দ্যচঠন্” (৪.৪.৭) স্বত্রে
আচার্য ‘তরতি’ এই অর্থে [ঙ্ ‘তরতি’ (৪.৪.৫.)] নৌ-শব্দ এবং দ্যচক্ প্রাতিপাদিকের
উত্তর ‘ঠন্’ প্রত্যয় বিধান করিয়াছেন। যেমন—‘নাবা তরতি নাবিকঃ’। সেইরূপ ‘ঘটেন
তরতি’ এই অর্থে ‘ঘট’ শব্দের উত্তর ঠন্ প্রত্যয়যোগে ‘ঘটিক’ এই ইষ্ট পদটি সিদ্ধ হইয়া
থাকে। কিন্তু অ-কার ব্যক্তি যদি এক হয়, তবে ‘ঘট’-শব্দে একটিমাত্র অ-কারেরই
দ্বিগুচ্চারণ হওয়ায় ‘ঘট’ শব্দটি ‘দ্যচ্’ না হইয়া ‘একাচ্’ হইবে এবং ফলে ‘নৌ দ্যচঃ—’
স্বত্রানুসারে ‘তরতি’ অর্থে ‘ঘট’ শব্দের উত্তর ‘ঠন্’ প্রত্যয় হইতে পারিবে না। অতএব
একদেশিমত অ-কারাদি বর্ণব্যক্তির একত্ব মানিয়া লইলে ‘ঘটিকঃ’ প্রভৃতি ইষ্ট পদ সিদ্ধ
হইতে পারিবে না। ‘বাহকঃ’ প্রভৃতি পদসিদ্ধির জ্ঞাত্য “নৌ দ্যচঃ—” স্বত্রে ‘দ্যচ্’ গ্রহণের
সার্থকতা আছে। কেননা, একদেশিমতে ‘বাহ’ প্রভৃতি পদই স্বার্থতঃ ‘দ্যচ্’ ॥

ঙ্ঠব্য : “ঘটেনেতি ॥ এক এবাকারো দ্বিগুচ্চার্থত ইতি দ্যচ্ ভাষ্যঃ ।

ঠংস্ত বাহকাদিষু কৃতার্থঃ ॥”—প্রদীপ ।

(জ্ঞাপকনিরাকরণভাষ্য)

ভাষ্য : নৈনতদন্তি জ্ঞাপকম্ । ইংসংজ্ঞাপ্রকণ্ডার্থমন্তং স্তাৎ । ন স্বয়মস্ববন্ধৈঃ শল্যক-
বচ্ছক্য উপচেতুম্ । ইংসংজ্ঞায়াং হি দোষঃ স্তাৎ । আয়ম্য হি স্বয়োরিৎ-
সংজ্ঞা স্তাৎ ।

কয়োঃ ?

আন্তস্তয়োঃ ॥

ভাষ্যানুবাদ : এক্ষণে পূর্বপক্ষী “বিষয়েণ তু নানালিঙ্গকরণাং সিদ্ধম্”—একদেশীয়
এই পূর্বোক্ত সমাধান পুনরায় খণ্ডন করিতেছেন। একদেশী বলিয়াছিলেন : স্বত্রকার
যে ‘ক’, ‘অণ্’, ‘ঈ’ প্রভৃতি প্রত্যয়স্থ অ-কাবকে ক-কার, ণ-কার, ট-কার প্রভৃতি
বিভিন্ন অস্ববন্ধের দ্বারা চিহ্নিত ক বয়াছেন, তাহার দ্বারা তিনি জ্ঞাপন করিতেছেন যে,
অস্ববন্ধভেদে একই অ-কারের কার্যভেদ লক্ষিত হইয়া থাকে ; যদি অস্ববন্ধকার্যের পরস্পর
অভেদই স্বত্রকারের অভিপ্রেত হইত তবে স্বত্রকার “কর্মণি কণ্ঠ্”—এইভাবে সর্বাস্ববন্ধযুক্ত
অ-কার বিধান করিতেন। সুতরাং বিষয়ভেদে অ-কাবের নানালিঙ্গকরণই জ্ঞাপক যে
‘ক’ প্রভৃতি প্রত্যয় স্থলে অস্ববন্ধসংকররূপ দোষ প্রসক্ত হইবে না। এক্ষণে পূর্বপক্ষী
বলিতেছেন : “বিষয়ভেদে অ-কারের বিভিন্ন অস্ববন্ধকরণের দ্বারা অস্ববন্ধসংকররূপ
দোষের অভাব জ্ঞাপিত হইতে পারে না। কেননা, স্বত্রকার যে ‘কণ্ঠ্’—এইরূপ

সর্বাহুবন্ধযুক্ত অ-কার নির্দেশ করেন নাই, তাহার অর্থ হেতু আছে। কি সেই হেতু? 'উপদেশেহজহুনাসিক ইং', 'হলন্ত্যম্', 'ন বিভক্তৌ তুস্মাঃ' 'আদি ঙ্গিটুডবঃ', 'ষঃ প্রত্যয়শ্চ', 'চু-টু', 'ল-শ-কৃতকৃতি', 'তস্ম লোপঃ' (১.৩.২-৩)—এই কয়টি শ্রুত আচার্য বিভিন্ন স্থলে প্রত্যয়াদির অন্তর্স্থিত অথবা আদিস্থিত অহুবন্ধের ইংসংজ্ঞা এবং লোপ আদেশ বিধান কবিয়াছেন। সুতরাং যদি আচার্য 'ক' প্রভৃতি প্রত্যয়ের স্থলে সর্বাহুবন্ধযুক্ত 'কণ্টু' প্রত্যয় বিধান করিতেন, তাহা হইলে 'ল-শ-কৃতকৃতি' (১.৩.৮) শ্রুতাহুসারে 'কণ্টু' প্রত্যয়ের আদিস্থিত ক-কারের এবং 'হলন্ত্যম্' (১.৩.৩) শ্রুতাহুসারে অন্ত্য ট-কারের ইংসংজ্ঞা হইত এবং 'তস্ম লোপঃ' (১.৩.২) শ্রুতাহুসাবে এই উভয়েরই লোপ হইত। কিন্তু 'কণ্টু' প্রত্যয়েব মধ্যবর্তী ণ-কারের ইংসংজ্ঞা কিংবা লোপ-বিধায়ক কোনও শ্রুত না থাকায়, উহার ইংসংজ্ঞা অথবা লোপ হইত না, এবং 'কণ্টু' প্রত্যয়ের 'অণ্' ভাগটুকু মাত্র প্রত্যয়রূপে অবশিষ্ট থাকিত। সুতরাং 'আতোহুপসর্গে কঃ' প্রভৃতি শ্রুতাহুসারে সিদ্ধ পদে ণ-কারেরও শ্রবণ হইত। সেইজন্তই শ্রুতকার যুগপৎ সর্বাহুবন্ধযুক্ত 'কণ্টু' ইত্যাদি প্রত্যয় বিধান না করিয়া বিষয়ভেদে অ-কারের উত্তর বিভিন্ন অহুবন্ধ যোজনা করিয়াছেন। অতএব ইহাব দ্বারা একদেশিসম্মত অর্থ জ্ঞাপিত হইতে পারে না।"

দ্রষ্টব্যঃ শল্যকবদ্বিতি ॥ শল্যকঃ প্রাণিবিশেষঃ। স যথা কণ্টকভূলৈত, পক্ষ্যৈর্য্যাপ্যতে।^১ নৈবং সর্বাহুবন্ধযুক্তোহকারঃ শক্ত্যো নির্দেষ্টুম্। আতন্তয়োরেব ইংসংজ্ঞাবিধানাং মধ্যপাতিনাং শ্রবণপ্রসঙ্গাৎ ॥—প্রদীপ ॥

(আক্ষোপনিরাকবণবাস্তিকব্যাক্যাস্তরভাষ্য)

ভাষ্যঃ এবং তর্হি—

॥ বিষয়েণ তু পুনর্লিঙ্গকরণাং সিদ্ধম্ ॥

১ প্রদীপকারের ব্যাক্যাহুসারে 'শল্যক' একপ্রকার পক্ষী, এইরূপ প্রতীত হইতেছে। কিন্তু 'ছায়া' টীকায় কণ্টক ভূষিষ্ঠ পক্ষনখ প্রাণীকেই শল্যক বলা হইয়াছে। দ্র° "এতেন পক্ষিভ্যং ত্যোত্যাতে। বস্তুতস্ত কণ্টকভূষিষ্ঠঃ পক্ষনখো যুগ ইতি বোধ্যম্।"—ছায়া ॥

'শল্য' শব্দের অর্থ কণ্টক বা শঙ্কু। তু°—"বা পুংসি শল্যাং শঙ্কুর্না"—অমর^১ ২. ৮. ৯৪। অমরকোষে 'শল্য' ('শল্যক') শব্দটি (১) বৃক্ষবিশেষ এবং (২) প্রাণিবিশেষরূপে অর্থে পঠিত হইয়াছে। দ্রষ্টব্যঃ—[১] 'শল্যচ্চ মদনঃ'—২. বনৌষধিবর্গ (৪). ৫৩। 'শল্যমন্ত্যাস্তি শল্যঃ।' মদন্যতি মদনঃ। আহ চ—'মদনঃ শল্যকো রাকঃ (বাপ?) পিণ্ডী পিণ্ডীতকন্তথা। তন্ত্বরঃ করহাটশ্চ শ্বসনো বিষপ্লপকঃ ॥"—(ধনুস্তরিনির্ঘণ্ট, ১. ১৬৮)°—ক্ষীরস্বামিটীকা।

[২] "স্বাবিণ তু শল্যস্তল্লোম্মি শললী শললং শলম্।"—অমর^২, ২. সিংহাদিবর্গ (৮). ৭।—"শলতি শল্যানি কিরতি বা শল্যো বিলেশঃ"—ক্ষীরস্বামী। শল্যক = porcupine (M. Williams).

যদ্বয়ং বিষয়ে বিষয়ে পুনর্লিঙ্গম্কারং করোতি—“প্রাগ্দীব্যতোহণ্” “শিবাদিভ্যোহণ্” ইতি, তেন জ্ঞায়তে—নামুবন্ধসঙ্করোহতীতি। যদি হি স্তাৎ পুনর্লিঙ্গকরণমনর্থকং স্তাৎ ॥

ভাষ্যানুবাদ : এইরূপ (আপত্তি যদি উত্থাপিত হয়,) তাহা হইলে (“বিষয়েণ তু নানা—” এই বার্তিকটির)—

বিষয়েণ তু পুনর্লিঙ্গকরণাৎ সিদ্ধম্

(এইরূপ পাঠ কল্পনা কবা হউক) ।

যেহেতু, (আচার্য্য) বিষয়ভেদে (একই) অ-কারকে বারবার (একই) লিঙ্গ- (বা অমুবন্ধ-) যুক্ত (ভাবে নির্দেশ) করিয়াছেন—যেমন, “প্রাগ্দীব্যতোহণ্” (৪.১.৮৬), “শিবাদিভ্যোহণ্” (৪.১.১১২)—সেই হেতু ইহা জানা যাইতেছে যে, অমুবন্ধ (-কার্য-) সমূহের (মধ্যে ভেদাভাববশতঃ পরস্পর) সংকর (-দোষেব প্রসঙ্গ) হইবে না। (কেননা,) যদি (অমুবন্ধ সংকরদোষ) হইত, (তাহা হইলে) (একই অ-কারের) বারবার (একই) লিঙ্গ (বা অমুবন্ধ-যুক্তভাবে নির্দেশ) অনর্থক হইত ॥

টিপ্পনী : পূর্বপক্ষিপ্রদর্শিত আপত্তি খণ্ডনের জন্ত ভাষ্যকার “বিষয়েণ তু নানা-লিঙ্গ করণাৎ সিদ্ধম্”—পূর্বপাঠিত এই একদেশিবার্তিকের পাঠান্তর কল্পনা করিয়া অত্র একটি ব্যাখ্যা দিতেছেন। তিনি এক্ষণে বার্তিকেব ‘নানা’ শব্দ স্থলে ‘পুনঃ’ শব্দ পাঠ করিতেছেন। ঙ্—“বিষয়েণেত্যেতদন্তথা ব্যাচষ্টে নানাশব্দমপনীয় পুনঃশব্দং পঠিহ্ম।”—প্রদীপ ॥

তাৎপর্য এই : স্বত্রকার “প্রাগ্দীব্যতোহণ্” (৪.১.৮৬)—স্বত্রে “তেন দীব্যতি জয়তি খনতি জিতম্” (৪.৪.২)—স্বত্রেব পূর্বপর্যন্ত যে সকল অর্থ নির্দিষ্ট হইয়াছে, সেই সকল অর্থে, অপবাদ বিষয় পরিহার করতঃ, উৎসর্গতঃ সকল প্রাতিপদিকেব উত্তর ‘অণ্’ প্রত্যয় বিধান করিয়াছেন। ‘প্রাগ্দীব্যতোহণ্” (৪.১.৮৬)—স্বত্রেব অধিকারস্থ পববর্তী “শিবাদিভ্যোহণ্” (৪.১.১১২)—স্বত্রে শিবাদিগণীয় প্রাতিপদিকের উত্তর স্বত্রকাব “অণ্” প্রত্যয় বিধান করিয়াছেন। যদি অমুবন্ধ-সংকরই স্বত্রকারেব অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে “প্রাগ্দীব্যতোহণ্” স্বত্রাধিকারস্থ “শিবাদিভ্যোহণ্” (৪.১.১১২) স্বত্রে পুনরায় অ-কারের গিংকরণ অনর্থক হইত। কেবলমাত্র ‘অ’-কার বিধান করিলেও “প্রাগ্দীব্য-তোহণ্”—এই অধিকারস্থত্র বলে শিবাদিগণীয় প্রাতিপদিকের উত্তরও ণ-কারামুবন্ধ প্রযুক্ত কার্য (অর্থাৎ আদিবৃদ্ধি প্রভৃতি) হইতে পারিত। কিন্তু স্বত্রকাব “শিবাদিভ্যোহণ্” (৪.১.১১২) স্বত্রে শিবাদিগণীয় প্রাতিপদিকের উত্তর শুদ্ধ নিরমুবন্ধ অ-কার বিধান না করিয়া যে পুনরায় ণ-কারামুবন্ধযুক্ত ‘অণ্’ প্রত্যয় বিধান করিয়াছেন, ইহাব দ্বারা স্পষ্টই জ্ঞাপিত হইতেছে যে, অমুবন্ধ সংকর স্বত্রকারের অভিপ্রেত ছিল না। ঙ্—“যদি অমুবন্ধ-সংকরঃ স্তাৎ অকারমেব শিবাদিভ্যো বিদধ্যাৎ।”—প্রদীপ ॥

১ ঙ্—“অধিকারঃ পবিভাষা বিধিবা ইতি ত্রিষণি দর্শনেযু অপবাদবিষয়ং পরিহৃত্য অণ্ প্রবর্ততে।”—বায়ন-জয়াদিত্যকৃত ‘কাশিকায়ন্তি’ (৪.১.৮৬) ।

(প্রথমব্যাপ্যভূগমভাষ্য)

ভাষ্য : অথবা পুনবস্ত—॥ বিষয়েণ তু নানালিঙ্গকরণাং সিদ্ধম্ ॥ ইত্যেব ॥

নমু চোক্তম্—ইংসংজ্ঞাপ্রকৃপ্তার্থমেতৎ স্তাৎ-ইতি ॥

মৌষ দোষঃ, লোকতঃ এতৎ সিদ্ধম্। তদ্ব্যথা—লোকে কশ্চিদেবং দেবদন্তমাহ—
ইহ মুণ্ডো তব, ইহ শিখী তব—ইতি বল্লিঙ্গো যত্রোচ্যতে তল্লিঙ্গস্ত্রোপতিষ্ঠতে।

এবময়মকারো বল্লিঙ্গো যত্রোচ্যতে তল্লিঙ্গস্ত্রোপস্থান্ততে ॥

ভাষ্যানুবাদ : অথবা—॥ বিষয়েণ তু নানা লিঙ্গকরণাং সিদ্ধম্ ॥

(বার্তিকের) এইপ্রকার (পাঠ)-ই হউক ॥

কিন্তু (ঐক্লপ পাঠের বিরুদ্ধে ত' পূর্বেই) বলা হইয়াছে যে,—“ইংসংজ্ঞা প্রকৃপ্তির
(অর্থাৎ সিদ্ধির) জন্ত এইরূপ (বিষয়ভেদে অ-কারের ভিন্ন ভিন্ন লিঙ্গ কবা) হইয়াছে।”

ইহা দোষ নহে। লোক (-ব্যবহার) হইতে ইহা সিদ্ধ হইয়া থাকে। যেমন—
লোকে কোনও (প্রভুস্থানীয় রাজপুরুষ) ব্যক্তি (গুচপুরুষস্থানীয়) দেবদন্তকে (এই)
বলিয়া (আজ্ঞা করিয়া) থাকে—“এইস্থানে মুণ্ডিত (-মস্তক) হও, এইস্থানে জটাধারী
হও, এইস্থানে শিখায়ুক্ত হও।” (সেই গুচপুরুষও) যেখানে (অর্থাৎ যে-দেশে বা যে
কালে) যে-চিহ্ন (ধারণ করিতে) আদিষ্ট হইয়া থাকে, সেইখানে (অর্থাৎ সেই দেশে বা
সেই কালে) সেই চিহ্ন (-ই ধারণ করিয়া) উপস্থিত হয়। সেইরূপ এই অ-কার
(-ব্যক্তিটি এক হইলেও) যে (-সকল প্রকৃতির) উত্তর যে-চিহ্নযুক্ত ভাবে বিহিত হইয়া
থাকে, সেই (সকল প্রকৃতির) স্থলে সেই (সেই) চিহ্ন (বা অমুবন্ধ-নিমিত্ত কার্য সম্পাদন
করতঃ) উপস্থিত হইবে ॥

টিপ্পনী : ভাষ্যকার এক্ষণে—“বিষয়েণ তু নানালিঙ্গকরণাং সিদ্ধম্”—বার্তিকের এইরূপ
প্রথমোক্ত পাঠ গ্রহণ করিয়াই পূর্বপক্ষ-শঙ্কিত ‘অমুবন্ধ-সংকর’ দোষেব প্রসক্তি নিবাকরণ
করিতেছেন। পূর্বপক্ষী ঐক্লপ পাঠেব বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন যে, “স্বত্রকার
কর্তৃক বিভিন্ন বিষয়ে অ-কারের উত্তর বিভিন্ন অমুবন্ধযোজনাব দ্বারা অমুবন্ধসংকর দোষেব
অভাব জ্ঞাপিত হইতে পারে না। কেননা, উহার অর্থ প্রয়োজন আছে। একই সঙ্গে
সর্বামুবন্ধযুক্ত অ-কার বিধান কবিলে মধ্যবর্তী বর্ষের ইংসংজ্ঞা সিদ্ধ হইতে পাবে না,
সেইজন্তই স্বত্রকার সর্বামুবন্ধযুক্ত অ-কার উপদেশ না কবিয়া বিষয়ভেদে ভিন্ন ভিন্ন অমুবন্ধযুক্ত
অ-কার বিধান কবিয়াছেন। অতএব ইংসংজ্ঞা সিদ্ধিই বিষয়ভেদে অ-কারের ভিন্ন ভিন্ন
অমুবন্ধ নির্দেশেব উদ্দেশ্য। সুতরাং তাহার দ্বারা অমুবন্ধসংকর দোষেব অভাব জ্ঞাপিত
হইতে পারে না।”—ইহার উত্তরে ভাষ্যকার একটি লৌকিক উদাহরণ প্রদর্শন কবিয়া
পূর্বোক্ত জ্ঞাপক সমর্থন করিতেছেন : রাষ্ট্রের সংবন্ধনের জন্ত গুচ পুরুষ বা চুরের (spy)
নিয়োগ রাজনীতিশাস্ত্র বিহিত।^১ রাজা তাহার স্বরাষ্ট্র এবং পররাষ্ট্রের বিভিন্ন সংবাদ

১ কোটিলীয় ‘অর্থশাস্ত্রে’র ১ম অধিকরণের ৭ম এবং ৮ম প্রকরণে বিস্তৃতভাবে ‘গুচ’
পুরুষোৎপত্তি এবং ‘গুচপুরুষপ্রাণিধি’র বর্ণনা আছে। তুলনীয় :—

আহরণের নিমিত্ত বিশ্বস্ত চার নিয়োগ করিয়া থাকেন। গুঢ়পুরুষগণ বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন দেশে স্থান কালানুসারে বিভিন্ন বেশ ধারণ করিয়া গুপ্তভাবে বিচরণ করিয়া থাকে। একই ব্যক্তি কখনও মুণ্ডিতমস্তক হইয়া থাকে, কখনও লম্বিত জটা মস্তকে ধারণ করে, কখনও বা দীর্ঘ শিখা ধারণ করে। কিন্তু এই সকল বিভিন্ন রূপ ধারণের যেমন বিভিন্ন স্থানে ও কালে বিভিন্ন উপযোগিতা থাকিলেও, একই স্থানে কিংবা একই কালে এই সকল বিজাতীয় রূপধারণ করিয়া তদুপযোগী বিভিন্ন কার্য সম্পাদন কবা একটি চারের পক্ষে অসম্ভব, সেইরূপ “কর্মণ্যন্”, “আতোহম্পসর্গে কঃ” প্রভৃতি বিভিন্নস্থত্রে বিভিন্ন প্রকৃতির উত্তর স্বরূপাবণ-কার, ক-কার প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন অমুবন্ধযুক্ত অ-কারের বিধান করায়, সেই সেই প্রকৃতির স্থলে বিহিত অ-কারের সেই সেই অমুবন্ধপ্রযুক্ত কার্য হইবে। অতএব “কর্মণ্যন্” স্থত্রে বিহিত অ-কার পরে থাকিলে গিত্তপ্রযুক্ত কার্যই হইবে, কিন্তুপ্রযুক্ত কার্য হইবে না। “আতোহম্পসর্গে কঃ” স্থত্রে বিহিত অ-কার পবে থাকিলে কিন্তু-প্রযুক্ত কার্যই হইবে, গিত্তপ্রযুক্ত কার্য নহে। ইহাই স্বরূপকারেব অভিপ্রায়। সূত্ররাং লৌকিক চারাদি-দৃষ্টান্তের দ্বারাও অ-কারাদিব একত্র সিদ্ধ হইতে পারে, এবং অমুবন্ধসংকব দোষের প্রসক্তিও হইতে পারে না।

দ্রষ্টব্য : “যথা লোকে ইতি (ভাষ্যে)। প্রভুজ্ঞয়া গুঢ়চারাদিবিতি শেষঃ ॥ এবং চ লোকব্যবহারদৃষ্টান্তেনৈবাসম্বয়ঃ সিদ্ধ ইত্যর্থঃ ॥ যত্র দেশে কালে বা ॥”

—নাগেশঃ ‘উদ্যোত’।

ভাষ্য : যদপ্যুচ্যতে—

॥ একাজনেকাজ্গ্রহণেষু চানুপপত্তিঃ ॥ ইতি ॥

(দ্বিতীয়াক্ষোপনিয়াকবণ বার্তিক)

বার্তিক : ॥ একাজনেকাজ্গ্রহণেষু চাবুস্তিসংখ্যানাৎ ॥

ভাষ্য : একাজনেকাজ্গ্রহণেষু চাবুস্তে: সংখ্যানাদনেকাচ্ছং ভবিষ্যতি। তত্তথা—
সপ্তদশ সামিধেহো ভবন্তি “ইতি” ত্রিঃ প্রথমামদ্বাহ নিরুস্তমাম্” ইত্যাবুস্তিতঃ
সপ্তদশত্বং ভবতি।

এবমিহাপ্যাবুস্তিতোহনেকাচ্ছং ভবিষ্যতি ॥

ভাষ্যানুবাদ : আবার যে বলা হইয়াছে—

* ॥ (যে সকল স্থত্রে) ‘একাচ্’ অথবা ‘আনকাচ্’ (শব্দ) উচ্চারণ

‘মুণ্ডো জটিলো বা বৃত্তিকামস্তাপসব্যঞ্জনঃ। স নগরাভ্যাশে প্রভূতমুণ্ডজটিলান্তেবাসী
শাকং যবনযুষ্টিং বা মাসদ্বিসাশাস্তবং প্রকাশমশ্রীয়াৎ, গুঢ়মিষ্টমাহাবম্ ॥’—অর্থশাস্ত্র
(মহীশূর সংস্করণ, ১৯২৪), পৃ. ১৯। ভাষ্যকার কি বর্তমান ভাষ্যাংশে কোটিল্যের
উপরি-উদ্ধৃত অমুশাসনেব প্রতিই ইঙ্গিত কবিয়াছেন।

(-কবতঃ কোনও কার্য বিহিত হইয়াছে, সে সকল স্থলেও ইষ্ট ব্যবহার) অমুগপত্তি (হইবে) ॥ *
(তাহার উত্তরে বলা হইতেছে)—

* ॥ একাজনেকাজ্জ্বেহণেয়ু চাবুস্তিসংখ্যানাং ॥ *

ভাষ্য : (যে সকল স্থলে) ‘একাচ্’ কিংবা ‘আনকাচ’ (শব্দ) উচ্চারণ (-কবতঃ কোনও কার্য বিহিত হইয়াছে, সেই সকল স্থলে) (একই অ-কারাদি বর্ণের) আবুস্তির গণনার দ্বারা (‘ঘট’ প্রভৃতি শব্দের) ‘অনেকাচ’ত্ব (সিদ্ধ) হইবে। যেমন—“সতেবটি সামিধেনী (-ঋক্ পাঠ করিতে) হইবে”—ইত্যাদি (বৈদিক বিধিস্থলে), “প্রথম (ঋক্)টিকে তিনবার পাঠ করিবে, অন্তিম (ঋক্)টিকে তিনবার পাঠ করিবে—(এইরূপ নিদে-শামুসারে ত্রয়োদশ সংখ্যক সামিধেনী ঋকের প্রথম ও অন্তিম ঋক্ দ্বয়েব তিনবার করিয়া) আবুস্তিব দ্বারা সপ্তদশ সংখ্যা (সিদ্ধ) হইয়া থাকে, সেইরূপ এই স্থলেও (একই অকারাদি বর্ণের) আবুস্তিব দ্বারা (‘ঘট’ প্রভৃতি শব্দের) অনেকাচ-ত্ব (সিদ্ধ) হইবে।

টিপ্পনী : বার্তিককার এক্ষণে পূর্বপক্ষি-প্রদর্শিত দ্বিতীয় আশঙ্কা নিরাকরণ করিতেছেন : পূর্বপক্ষী আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে, অকারাদি বর্ণের একত্ব স্বীকৃত হইলে ‘ঘট’ প্রভৃতি শব্দের দ্ব্যচ-ত্ব সিদ্ধ হইবে না। ফলে—“নৌ-দ্ব্যচঠন” (৪.৪.৭)—এই নৃত্যামুসারে ‘ঘট’ শব্দের উত্তর দ্ব্যচ-ত্বপ্রযুক্ত ‘ঠক্’ প্রত্যয় উৎপন্ন হইতে পারিবে না। সুতরাং ‘ঘটিকঃ’ এইরূপ পদ অসিদ্ধ হইবে। ইহার উত্তরে একদেশী বলিতেছেন যে, অ-কার ব্যক্তি এক হইলেও উহার দুইবার, তিনবার কিংবা ততোধিক বার আবুস্তির দ্বারা ‘ঘট’ প্রভৃতি শব্দের অনেকাচ-ত্ব সিদ্ধ হইতে পারিবে, এবং অনেকাচ-ত্ব প্রযুক্ত কার্ণও হইতে পারিবে। এই সমাধানের সমর্থনে ভাষ্যকার বেদ হইতে একটি বিধান উদাহরণরূপে উদ্ধার কবিতেছেন। দর্শ, পূর্ণমাস—এই দুইটি বাগ বেদে প্রকৃতিবাগরূপে পরিচিত। এবং অগ্নিষ্টোমাদি অত্যাশ্চর্য বাগ বিকৃতি বাগরূপে পরিচিত। প্রকৃতি বাগে যখন অগ্ন্যাধান করিতে হয়, তখন পনেরটি ঋক্মন্ত্র পাঠ করিয়া অগ্নিতে সমিধ্ প্রক্ষেপ করিতে হয়। এই ঋক্গুলিকে ‘সামিধেনী’ ঋক্ বলা হইয়া থাকে। সামিধেনী ঋক্গুলির সংখ্যা এগার। কিন্তু, বিধি রহিয়াছে ‘পনেরটি সামিধেনী ঋক্ পাঠ করিবে।’ সুতরাং ত্রাশ্রয়গ্রন্থ সমূহে এইরূপ উক্ত হইয়াছে যে, এগারটি মূল সামিধেনী ঋকের প্রথমটি তিনবার অন্তিমটি তিনবার পাঠ করিতে হইবে। এই প্রকারে পনেরটি সামিধেনী সিদ্ধ হইবে। বিকৃতি বাগেও এই পনেরটি সামিধেনী পাঠ করিতে হয়; কিন্তু বিশেষ এই যে, সামিধেনী ঋক্গুলিব মধ্যে অতিরিক্ত দুইটি ঋক্ পাঠ করিতে হয়। এই অতিরিক্ত ঋক্দ্বয়কে ‘ধাষ্যা’

১ ঙ্গ—“পাষ্য-সাম্নাষ্য-নিকাষ্য-ধাষ্যা মান-হবি-নিবাস-সামিধেনীমু”—পা°৩.১.১২৯।
“সামিধেনীশব্দ ঋক্বিশেষত্ববাচকঃ”—কাশিকাবৃন্তি। অপি চ—“সর্বা ঋচো ন সামিধেনী-শব্দোনাচ্যন্তে। কিং তর্হি? সমিধাধানমন্ত্রঃ। তথাহি সমিধাধানমন্ত্রে সামিধেনীশব্দো ব্যুৎপাততে।”—কাশিকা-বিরণ-পঞ্জিকা।

বলা হইয়া থাকে। সুতরাং বিকৃতি যাগে মূল একাদশ ‘সামিধেনী’ এবং দুইটি ‘ধায্যা’ ঋকু—এই তেরটি ঋকের মধ্যে প্রথম ও অন্তিম মন্ত্রদ্বয়ে তিনবার করিয়া আবৃত্তির দ্বারা যেমন সপ্তদশ সংখ্যা পূরণ করা হইয়া থাকে, সেইরূপ ‘ঘট’ প্রভৃতি শব্দ স্থলেও একই অ-কারের দুইবার আবৃত্তির দ্বারা দ্ব্যচত্ব সিদ্ধ হইবার পক্ষে কোনও বাধা থাকিবে না ॥

(আক্ষেপভাষ্য)

ভাষ্য : ভবেদাবৃত্তিঃ কার্যং পরিহৃতম্। ইহ তু ঋকু—‘কিরিণা’ ‘গিরিণা’ ইত্যেকাজ্-লক্ষণমন্তোদাস্তত্বং প্রাপ্নোত্যেব ॥

ভাষ্যানুবাদঃ : আবৃত্তির দ্বারা (অনেকাচত্ব-নিবন্ধন) কার্য্য (সিদ্ধ) হইয়া থাকে,— (এইরূপ যুক্তির দ্বারা পূর্বোক্ত দূষণ) পরিহৃত (হইতে পারে বটে)। কিন্তু—‘কিরিণা’, ‘গিরিণা’ প্রভৃতি (এই সকল) স্থলে একাচত্ব-নিবন্ধন অন্তোদাস্তত্ব (ত’) হইবেই ॥

টিপ্পণী : পূর্বে পূর্বপক্ষী আপত্তি করিয়াছিলেন যে, অ-কারাদি বর্ণের একত্ব সিদ্ধ হইলে ‘ঘট’ শব্দের উত্তর দ্ব্যজ্-লক্ষণ ‘ঠন্’ প্রত্যয় হইতে পারিবে না; সেইরূপ ‘গিরিণা’, প্রভৃতি পদে একাচত্ব-নিবন্ধন “সাবেকাচত্বতীয়াদিবিভক্তিঃ” (৬. ১. ১৬৮) স্মারানুসারে অন্ত্য আ-কার উদাস্ত হইবে; কিন্তু তাহা অনিষ্ট। যদিও “একাজনেকাজ্-গ্রহণে চাবৃত্তিসংখ্যানাং”—এই বার্ত্তিকোক্ত যুক্তি অনুসারে আবৃত্তির দ্বারা ‘ঘট’ প্রভৃতি শব্দের অনেকাচত্ব সিদ্ধ হইতে পারে বটে, তথাপি এই অনেকাচত্ব মুখ্য অনেকাচত্ব নহে,—কিন্তু গৌণ। কেন না, ‘ঘট’ শব্দের মূলীভূত স্বর অ-কারটি একই। অতএব আবৃত্তির দ্বারা গৌণ অনেকাচত্ব সিদ্ধ হইলেও, অ-কারাদি বর্ণের একত্বনিবন্ধন মুখ্য একাচত্ব বাধিত হইতে পারে না। সুতরাং ‘গিরি’, ‘কিরি’ প্রভৃতি শব্দে আবৃত্তির দ্বারা গৌণ দ্ব্যচত্ব সিদ্ধ হইলেও ই-কার ব্যক্তির অভিন্নত্ব-নিবন্ধন মুখ্য একাচত্ব অবাধিত হওয়ায় “সাবেকাচত্বতীয়াদিবিভক্তিঃ” (৬. ১. ১৬৮)—স্ববিধায়ক এই স্মারানুসারে ‘গিরিণা’, প্রভৃতি পদের অন্ত্যস্বর উদাস্ত হইবেই। এই অনিষ্টেব প্রতিষেধ হইবে কিরূপে? সুতরাং আবৃত্তির দ্বারা অনেকাচত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে—এই যুক্তি স্বীকার করিয়া লইলেও, ‘কিরিণা’, ‘গিরিণা’ প্রভৃতি স্থলে মুখ্য একাচত্বনিবন্ধন অনিষ্ট অন্তোদাস্তত্বের প্রাপ্তি হইবেই। উপরি-উক্ত ভাষ্যাংশে পূর্বপক্ষী একদেশি-প্রদর্শিত পূর্বোক্ত সমাধানের বিকল্পে পুনরায় আক্ষেপ উত্থাপন করিতেছেন ॥

তুলনীয় : “ভবেদিত্তি। গিরিণেত্যাদৌ আবৃত্তিতেদেহপি মুখ্যমেকাচত্বং ন নিবর্ত্তত ইতি ভাবঃ ॥”—প্রদীপ ॥

“(ভাষ্যে) ভবেদাবৃত্তিঃ কার্য্যং পরিহৃতমিতি ॥ আবৃত্ত্যা কার্য্যং সিদ্ধমিতি কৃত্বা দূষণং পরিহৃতং ভবেদিত্যশয়ঃ ॥ মুখ্যমিতি (প্রদাপে)। আবৃত্তিকৃতদ্ব্যচত্বেন স্বগতৈ-কাচত্বস্ত বাধাবোগ ইতি ভাবঃ ॥”—উদ্ভোত ॥

(সমাধানভাষ্য)

ভাষ্য : এতদপি সিদ্ধম্ ।

কথম্ ?

লোকতঃ । তদ্ বথা—ঋষিসহস্রমেকাং কপিলামেকৈকশঃ সহস্রকৃষ্ণো দত্তা
তয়া সৰ্বে তে সহস্রদক্ষিণাঃ সম্পন্নাঃ ॥

এবমিহাপ্যনেকাচত্বঃ ভবিষ্যতি ॥

ভাষ্যানুবাদ : ইহাও (অর্থাৎ গোণ অনেকের দ্বারা মুখ্য একের বাধও) সিদ্ধ
(হইয়া থাকে) ॥ কি প্রকারে (ইহা সিদ্ধ হইতে পারে) ? ॥

লোক (ব্যবহার) হইতে । যেমন, (গো-সহস্র সজে দীক্ষিত) সহস্রসংখ্যক ঋষি
একটি মাত্র কপিলা (গাভী-) কে (আবৃত্তির দ্বারা) প্রত্যেকে সহস্রবার করিয়া দান
করিয়া সকলেই সহস্র (-গো-) দক্ষিণা (দানের ফলভাক্) হইয়া থাকেন । সেইরূপ,
এখানেও (একই অ-কারাদি বর্ণের আবৃত্তির দ্বারা) আনকাচত্ব (সিদ্ধ) হইবে ॥

টিপ্পণী : ভাষ্যকার এক্ষণে আর একটি উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া পূর্বপক্ষ-প্রদর্শিত
শব্দার সমাধান করিতেছেন । পূর্বপক্ষী আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে, 'গিরি (ণা)', 'কিরি
(ণা)' প্রভৃতি স্থলে (একই ই-কারের আবৃত্তিনিবন্ধন গোণ অনেকাচত্ব সিদ্ধ হইলেও,
ই-কারের একত্ব-প্রযুক্ত মুখ্য একাচত্ব বাধিত হইতে পারে না ? সুতরাং একাচত্ব নিবন্ধন
কার্যও হইতে পারিবে । ইহার উত্তরে ভাষ্যকার বলিতেছেন যে—আবৃত্তিনিবন্ধন গোণ
সংখ্যার দ্বারা মুখ্য সংখ্যা বাধিত হইয়া থাকে, ইহা লৌকিক ব্যবহারে দেখা যায় ।
উদাহরণ স্বরূপ তিনি বৈদিক যজ্ঞে দক্ষিণা দান বিধির উল্লেখ করিতেছেন । বেদে গো-
সহস্র-সজ্ঞ নামে একটি সজ্ঞের উল্লেখ আছে) এই সজ্ঞে সহস্রসংখ্যক ঋষি দীক্ষিত
হইয়া থাকেন, তাঁহারাই একাধারে বজ্রমান এবং ঋত্বিক্ । এই সজ্ঞে প্রত্যেক ঋত্বিকের
দক্ষিণার পরিমাণ সহস্র গাভী । কিন্তু সহস্র ঋত্বিককে প্রত্যেককে সহস্র গাভী দান করা
অসম্ভব । সেইজন্ত, তাঁহারাই প্রত্যেককে পর্যায়ক্রমে বজ্রমানরূপে কপিলবর্ণ একটিমাত্র,
গাভীকেই সহস্রবার করিয়া একজন ঋত্বিককে 'দান কবিয়া সহস্র সংখ্যক গো-দক্ষিণা
দানেব ফল লাভ করিয়া থাকেন, এবং তাঁহাদের যজ্ঞও ফলবান হইয়া থাকে । এখানে
গো-গত মুখ্য একত্ব যেমন সহস্রবার আবৃত্তিজন্ত গোণ সহস্রসংখ্যকদের দ্বারা বাধিত
হইয়া থাকে, সেইরূপ 'গিরি', 'কিরি' প্রভৃতি শব্দস্থলেও ই-কারাদি বর্ণেব একত্ব প্রযুক্ত
মুখ্য একাচত্ব দুইবার আবৃত্তিরজন্ত গোণ দ্ব্যচত্বের দ্বারা বাধিত হওয়ায় 'কিরিণা' 'গিরিণা'
প্রভৃতি উদাহরণে একাচত্ব প্রযুক্ত "সাবেকাচত্বতীরাদিবিভক্তিঃ" (১৬. ১. ১৬৮) সূত্রানুসারে
অস্তোদাস্তত্ব হইতে পারিবে না । সুতরাং পূর্বপক্ষপ্রদর্শিত শব্দা নিমূর্জক ।'

১ তু° সর্বেষামধিনো মুখ্যাস্তদধেনাধিনোহপরে ।

তৃতীয়নিত্যতীয়াংশচতুর্থ্যাংশাচ্চ পাদিনঃ ॥—মহু° ৮. ২১০ ।

(তৃতীয়াধিপনিরাকরণভাষ্য)

ভাষ্য : যদপ্যুচ্যতে—দ্রব্যবচোপচারঃ প্রাপ্তবন্তি । ভবেৎ যদসংভবি কার্যং তন্মানেকো যুগপৎ কুর্য্যাৎ । যতু খলু সংভবি কার্যম্নেকোহপি তদ্যুগপৎ কৰোতি । তত্থা—ঘটন্ত দর্শনং স্পর্শনং চ ।

সংভবি চেদং কার্যমকারন্তোচ্চারণং নাম, অনেকোহপি তদ্যুগপৎ করিষ্যতি ॥

ভাষ্যানুবাদ : আব যে বলা হইয়াছিল,—“(যদি অ-কার ব্যক্তি এক এবং অভিন্ন হয়, তবে তাহার স্থলে) দ্রব্যের স্থায় ব্যবহার প্রাপ্ত হইবে”—(তাহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে,) যে কার্য অসম্ভব তাহা অনেক ব্যক্তি যুগপৎ করিতে পারে না । কিন্তু যে কার্য সম্ভব তাহা অনেক ব্যক্তিও যুগপৎ করিয়া থাকে । যেমন,—(একই) ঘটের (যুগপৎ অনেক ব্যক্তি কর্তৃক) দর্শন অথবা স্পর্শন । (সেইরূপ অনেক কর্তৃক একই) অ-কারের (যুগপৎ) উচ্চারণ (-রূপ) কার্য (টিও) সম্ভব । (স্তূতরাং) অনেক ব্যক্তি যুগপৎ তাহা (অর্থাৎ অ-কারের যুগপৎ উচ্চারণ) করিতে পারিবে ।

টিপ্পণী : “দ্রব্যবচোপচারঃ”—এই তৃতীয় আক্ষেপ বার্ত্তিকে বার্ত্তিককার একদেশিসম্মত অকারের একত্বের বিরুদ্ধে পূর্বপক্ষি-শক্তি আপত্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন : একই ঘটের দ্বাৰা যেমন যুগপৎ অনেক ব্যক্তি জলাহবণাদি ক্রিয়া-সম্পাদন করিতে পারে না, সেইরূপ অ-কারের একত্ব সিদ্ধ হইলে অনেক ব্যক্তি কর্তৃক যুগপৎ একই অ-কারের উচ্চারণরূপ কার্যও সম্ভব হইতে পারিবেনা—ইহাই ছিল পূর্বপক্ষির উপরি-উক্ত আক্ষেপের তাৎপর্য । বার্ত্তিককার স্বয়ং “বিষয়েণ তু নানালিঙ্গকরণং সিদ্ধম্” এবং “একাজনেকাজ্জ্ঞেহণেশু চাবৃতিসংখ্যানাং”—এই দুইটি বার্ত্তিকে পূর্বপক্ষিপ্রদর্শিত প্রথম দুইটি আক্ষেপ নিরসন করিয়াছেন । কিন্তু পূর্বপক্ষির তৃতীয় আক্ষেপ (অর্থাৎ “দ্রব্যবচোপচারঃ”)—ইহার নিরসনের জন্ত বার্ত্তিককার কোনও স্বতন্ত্র বার্ত্তিক প্রণয়ন করেন নাই । কিন্তু পূর্বপক্ষির এই আক্ষেপটির নিরসন না হইলে একদেশিসম্মত অ-কারের একত্ব-সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না । সেই জন্ত ভাষ্যকার স্বয়ং ঐ তৃতীয় আক্ষেপটির সমাধান করিতেছেন । তিনি বলিতেছেন : কতকগুলি কার্য অনেক ব্যক্তি কর্তৃক যুগপৎ অহুষ্ঠিত হইতে পারে, কতকগুলি পারে না । যে-সকল কার্য সম্ভব সেই সকল কার্য অনেকে যুগপৎ অহুষ্ঠান করিতে

“Medhatithi gives the total as 112, and the shares as 56, 28, 16, 12; Gov., Kull., Nar., and Ragh. the total as 100, and the shares as 48, 24, 16 and 8. But Nand. says that the total of the fee, whatever it may be, shall be divided into 25 shares, and the several classes shall receive 12, 6, 4, and 3 such shares respectively. See also *Asv. Srauta-Sutra* IX. 4. 3-5. The rule, given in this verse applies to all ordinary cases.”—Buhler, G : *Laws of Manu*, p. 292 (SBE. vol. XXV.).

পারিবে। যদিও একই ঘটের দ্বারা জলাহরণাদি ক্রিয়া সম্পাদন যুগপৎ অনেক ব্যক্তির দ্বারা অসম্ভব, তথাপি একই ঘটের দর্শন কিংবা স্পর্শন যুগপৎ অনেক ব্যক্তি করিতে পারে। সুতরাং সকল অবস্থাতেই একই বস্তুব সাহায্যে যুগপৎ অনেকে একই-কার্য্য নিষ্পাদন কবিতে পারে না—এইরূপ বলা চলে না। অ-কার ব্যক্তি এক হইলেও, ইহা নিত্য এবং ব্যঙ্গ। উচ্চার্য্যমান ধ্বনির দ্বারা সেই অ-কার ব্যক্তির অভিব্যক্তি ঘটিয়া থাকে। অতএব একই সময়ে বহু ব্যক্তি স্থান-করণাদিব সাহায্যে ধ্বনি নিষ্পন্ন করিয়া সেই এক এবং নিত্য অ-কারের অভিব্যক্তি সাধন করিতে পারে। এবং তাহাই অ-কাবের উচ্চারণ রূপে লোকে প্রসিদ্ধ। সুতরাং পূর্বপক্ষি-প্রদর্শিত তৃতীয় আক্ষেপটিও অসিদ্ধ ॥

তুলনীয়ঃ ॥ সম্ভবি চেতি ॥ “একশৈবাকারস্ত যুগপৎ স্থান-

করণ-নিষ্পন্ন-ধ্বনি-ব্যঙ্গত্বাৎ সর্বৈকচ্চারণং

শক্যম্-ইত্যর্থঃ ॥”—প্রদীপ ॥

(ক্রমশঃ)

রূপকাত্মক-শব্দ-প্রয়োগে রবীন্দ্রমানস

বীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস

রবীন্দ্রনাথের রচনা ভাবে ও ভাষায় রূপকান্বিত। ভাষাতেও ভাবের অমররূপ রূপক অপরিপাণ্ড। অনেক শব্দ বিশেষ বিশেষ ভাবনার প্রতীক। এ সম্পর্কে কিছু আলোচনা আছে ডক্টর সুকুমার সেন মহাশয়ের ‘বঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস’ (৩য় খণ্ড) বইতে ‘কথার আভা’ অধ্যায়ে।

সরসীলাল সবকার মহাশয়ের ‘রবীন্দ্র কাব্যে ত্রয়ো পরিচয়’ বইয়ে ‘শাস্ত্রম্ শিবম্ অদ্বৈতম্’ উপনিষদের এই মন্ত্র তাল, গান ও গতিরূপে কী ভাবে কবির অবচেতনার মধ্য দিয়ে রচনায় অভিব্যক্ত হয়ে উঠেছে তা দেখানো হয়েছে। সেখানে বিশেষ বিশেষ শব্দ তাল, গান ও গতির প্রতীক রূপে গণ্য।

সকল কবিরই কিছু কিছু নিজস্ব শব্দ থাকে। নিজস্ব এই অর্থে যে সেই শব্দগুলিই কবি বার বার ব্যবহার করেন। তাবই ফলে একটি বিশেষ ব্যঞ্জনা ও পরিমণ্ডল সেই সেই শব্দ ঘিরে রচিত হয়। অনেক সময়ে তা মানস গঠনেরও পরিচায়ক। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শব্দ কবির সাময়িক মনোজগতের স্পষ্ট ইঙ্গিত বহন করে। যেমন—‘চোখের বালি’তে ‘ক্লিষ্ট’ শব্দটি কবি নানা ভাবে ব্যবহার করেছেন। ‘মানসী’তে ‘মায়া’।

কবির চিরন্তন মানসতন্ত্রের পরিচয়ও বিশেষ বিশেষ শব্দের পৌনঃপুনিক প্রয়োগের মধ্যে ফুটে উঠেছে। ‘জাগ্রত’ শব্দটির কথাই ধরা যাক। এই শব্দটির বার বার সাক্ষাৎ মেলে রবীন্দ্ররচনায়। শব্দটি এককভাবে, কখনো বা সমাসবদ্ধরূপে, কখনো বা সংযোগ-মূলক ধাতুরূপে নানানভাবে প্রযুক্ত। শব্দটির পৌনঃপুনিক প্রয়োগ নিঃসন্দেহেই স্তোভনা করে রবীন্দ্রমানসের অন্তর্ভুক্ততা। যজ্ঞ, মহোৎসব, অতিথিশালা, যজ্ঞশালা, সদাব্রত প্রভৃতি শব্দও রবীন্দ্রনাথের উদার-বিশাল ‘বিশ্বমানবিকতার স্তোভক’। শব্দপ্রয়োগেব মধ্য দিয়ে কবিমানস বিশেষরূপে ব্যক্ত। শব্দ কবির অবচেতন মনের অভিজ্ঞান বহন করে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—“তোমাদের নালিশ এই যে, খেলা, ছুটি, আনন্দ, এই সব কথা আমার কাব্যে বার বার আসিয়া পড়িতেছে। কথাটা যদি ঠিক হয় তবে বুঝিতে হইবে, একটা কোনো সত্যে আমাকে পাইয়াছে। তার হাত আমাব আর এড়াইবার জো নাই। অতএব, এখন হইতে আমি বিধাতার মতোই বেহায়া হইয়া এক কথা হাজার বার বলিব।”—‘সাহিত্যের পথে’, ২৩/৩৭০ পৃ.। ‘খেলা’, ‘ছুটি’, ‘আনন্দ’ প্রভৃতি শব্দ যে কবির ইচ্ছা বা অনিচ্ছাসত্ত্বেও এসে যাচ্ছে তার সংগত কারণ কবির বিশেষ মানসতন্ত্র। কবির উপনিষদ চিন্তাভাবনা ও ভূমাপ্রীতির জন্ম উদার, নিখিল, বিশ্ব, মহৎ, মহা; মহান ইত্যাদি কথাও বারবার আসতে থাকে। যরণকে তিনি মহামরণরূপে দেখেন। যহাদিন, মহা-

সংগীত, মহাসংঘ, মহামহোৎসব, মহাবীণা, মহানন্দর, মহাসন, মহাসত্য প্রভৃতি তাঁর বিশেষ মানসতন্ত্রেরই পরিচায়ক। ‘মহা’র একটি সম্ভার্যক উদার অর্থ ববীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য।

সমস্ত বিশ্বচরাচর রবীন্দ্রনাথের কাছে একটি সামঞ্জস্যস্থলে গ্রথিত। বিশ্বনিখিলে একটি ঐক্যতান ধ্বনিত। এই কাবণেই কিনা জানি না রবীন্দ্র-রচনায় ‘বীণা’ শব্দের প্রয়োগ অপরিহার্য। নিচের তালিকাবিধৃত রূপকসমাসগুলিতে ‘বীণা’ শব্দ উত্তরপদ রূপে পাই। ডক্টর লক্ষ্মীনার সেন মহাশয়ের মতে ‘বীণা’ রূপক ববীন্দ্রনাথের নিজস্ব।^১

অগ্নিবীণা (গী. ১১।২৫৬।১)^২; অন্তরবীণা (আ. ২৭।২০০।২৬); অরণ্যবীণা (প্র. ১।৮১।৬); অরুণবীণা (ন. ১৮।২৪৫।২২); আকাশবীণা (পু. ১৬।৩২।২৭); আঁধার-বীণা (গীতবিতান ১।১৪৪।১৯); আলো-বীণা (গী. ১১।২৬৭।৩); আলোকবীণা (ব. ১৫।১২৯।১১); ইন্দ্রিয়বীণা (নৈ. ৮।২৯।২০); কিরণবীণা (গীতবিতান ১।২০০।২২); চিত্তবীণা (গীতবিতান ১।৬।৫); জীবনবীণা (শ্রা. ২০।৭৪।১০); জ্যোৎস্না-বীণা (প. ১৩।১১।৭); দেহবীণা (গী. ১১।১৬৭।২২); পৃথিবী (ন. ২২।৮০।৬); পুরান-বীণা (গীতবিতান ১।৪৩।৩); বহুবীণা (পু. ১৪।৪৩।৫); বিশ্ববীণা (ব. ১৫।৩২৯।২৭); বেদনা-বীণা (ন. ২৪।১৪০।১৭); ভুবনবীণা (গীতবিতান ১।৯।১০); মরণবীণা (গীতবিতান ১।১৩২।২২); মরমবীণা (গীতবিতান ২।৩৪৫।১১); মর্ত্যবীণা (চিঠিপত্র ৯।২০৭।৭); হৃদয়বীণা (গীত-বিতান ১।১১০।১৬)। এ ছাড়া আরও নিশ্চয়ই আছে।

আবেষ্টন, কাবা, কারাগার, জাল, ডোর, নিগড়, পবিবেষ্টন, পাশ, ফাঁদ, ফাঁস, ফাঁসি, বন্ধ, বন্ধন, বাঁধন, বেড়া, বেড়াজাল, বেষ্টন, রজ্জু, শিকল, শিকলি, শৃঙ্খল, স্বত্র—এই সব বন্ধনবাচক শব্দের রূপকসমাস বা রূপক সম্বন্ধপদের অজস্র প্রয়োগ ববীন্দ্রনাথের অশ্রুতম বৈশিষ্ট্য। সাহিত্যে এই সকল শব্দের রূপকাত্মক প্রয়োগ নতুন কিছু নয়। কিন্তু এই জাতীয় শব্দ ব্যবহাবেব অজস্রতাও রবীন্দ্রপ্রতিভার স্বাক্ষর বহন করে। এই শব্দগুলিও রবীন্দ্র-মানসের অভিজ্ঞান বহন করে। জন্মস্থানীন কবির কাছে বন্ধন যে কত প্রকারের হতে পারে, তারই নিদর্শন এই সব শব্দ ও শব্দগুচ্ছ। ‘অর্থের শৃঙ্খলপাশ’ বা ‘জাতিজালপাশ’ প্রভৃতির মতো বন্ধনবাচক শব্দের উপযুক্ত পরিপ্রয়োগ ভাবের তীব্রতাব্যঞ্জক। শব্দগুলির রূপকাত্মক প্রয়োগের একটি তালিকা পর পৃষ্ঠায় দেওয়া গেল। অতিপ্রচলিত প্রয়োগ এই তালিকার ধরা হয় নি। তবে তালিকাতুচ্ছ সবগুলির যে রবীন্দ্রনাথই প্রথম প্রয়োগকর্তা

১ ‘বাল্মীকী সাহিত্যের ইতিহাস (৩য় খণ্ড) বইয়ের ‘কথার আভা’ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

২ বিশ্বভারতী প্রকাশিত রবীন্দ্ররচনাবলীর ক্ষেত্রে বঙ্গনীভূক্ত বর্ণ ও সংখ্যাগুলি গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত নাম খণ্ড, পৃষ্ঠা ও পংক্তি নির্দেশক। এ. কেবল গ্রন্থ পরিচয়। অ—১, অ—২ অচলিত সংগ্রহ ১ম ও ২য় খণ্ড। রচনাবলীবহিভূত গ্রন্থের ক্ষেত্রে পূর্ণ নামের পরে সংখ্যা-গুলি খণ্ড, পৃষ্ঠা ও পংক্তি বা পৃষ্ঠা ও পংক্তি ধরতে হবে। র. ব. ববীন্দ্ররচনাবলী (সরকারি সংস্করণ)। এ ক্ষেত্রে গ্রন্থনাম অঙ্গুলিখিত।

তা নাও হতে পারে।' প্রয়োগগুলির একটিমাত্র আঁকর উল্লেখ প্রমাণস্বরূপ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। বলা বাহুল্য এ তালিকা সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ ও নিঃশেষিত নয়। প্রয়োগ-সূচী :

আবেষ্টন—অশ্রদ্ধার আবেষ্টন (চিঠিপত্র

৯২৬৭৬-৭)

কারা—ঐশ্বৰ্যের কাবা (সা. ২৪।১০৫।১)

বিরহকারা (শা. ২২।১০৯।১৯)

মরুকারা (ন. ২৪।৪৩।১১)

মোহকারা (গীতবিতান ১৮০।১৪)

রজনীকারা (গীতবিতান ৩৮৫০।৫)

কারাগার—

কাগজের কারাগার (বি. ৫।৪৩৯।৪)

দেহ কাবাগাব (ক. অ-১।৩৪।২৩);

পুষ্পকারাগার (মা. ৪।১৬৯।১৬);

প্রেমের কারাগার (মা. ২।১৮৯।১৯);

বন্ধ কারাগার (ভ. অ-১।১৮৫।৩);

ভবকারাগার (দ্বিপত্র ১।৫।১১);

মর্ম কাবাগার (ভ. অ-১।১৭১।৮);

শয়নকারাগার (সু. ভা. ১।৫৯০।২৫);

শিক্ষার কারাগার (প্র. ১।৭।৪৬৮।২-৩);

সত্য কারাগাব (বি. ২।৩২৭।২৯);

স্নেহ কারাগার (চৈ. ৫।৩১।১৩);

গণ্ডি—

গ্রাম্যগণ্ডি (শো. ১।৬।৩৮০।২৪);

দৃষ্টান্তগণ্ডি (শ. ১২।৫৭৭।৯);

বাল্যগণ্ডি (শা. ১৫।৪৮২।১১);

মায়াগণ্ডি (গ. ১।৭।২৪৯।১৯);

সমাজগণ্ডি (পা. ২২।৪৫১।১৫);

গর্ত—

মোহগর্ত (কা. ৭।৯৮।২১)

গর্ত—

আরামগর্ত (আ. ৯।৪৬৯।১);

গ্রস্থি—

আচারের গ্রস্থি (পু. ১।৬।১০৯।১০);

কালের গ্রস্থি (বা. ২।৬।৩৬৯।১৬);

দুঃখের গ্রস্থি (মা. ১২।১৮৬।৫);

পার্সেটের গ্রস্থি (ঘো. ৯।১৮৮।১৪);

বন্ধনগ্রস্থি (ন. ১৮।১৯৮।৬);

মিলনগ্রস্থি (বী. ১২।২।২৩);

সংসারের গ্রস্থি (মা. ১২।১৮৭।২৪);

চক্র—

জীবনচক্র (প. স. ২।৬।৫৩১।১০);

দৃষ্টিচক্র (ভারতপথিক রামমোহন রায়

২৩৬); মোহচক্র (চো. বা. ৩।৪৯১।২৫);

জাল—

অজুলিজাল (গ. ১।৪।২৪৭।১২);

অদৃষ্টজাল (শে. ১।৮।২০।৭);

অধীনতাজাল (ম. ২।৭।২৯২।৫);

অবসাদজাল (ছ. ২।১।৩৪৩।২১);

অভিজ্ঞতারজাল (প্র. ১।১।৮৮।২৮);

অভিলাষেরজাল (গ. ১।৭।১৭৩।১৩);

অভ্যাসের জাল (শ্রী. ২২।১৭।১৪);

অভ্যাসজাল (গ. ১।৯।২৮।১২);

অস্তিত্বের জাল (আ. ২।৩।৭৭।১৩);

আকাজ্জার জাল (প. স. ২।৬।৫৭৯।১৫);

আচারবন্ধন (পু. ২।৭।৪৯২।২২);

আঁধারজাল (শে. অ-১।৪৭।৮);

আধিপত্যজাল (পা. ২২।৪৬০।১৫);

৩ 'জালে'র এক অর্থ সমূহ। বস্তুত এই অর্থে কেশজাল, জটাজাল, ধূলিজাল প্রভৃতি প্রচলিত। কিন্তু স্পষ্টতই 'জালের' এই অর্থ রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রেত নয়।

- আধিব্যাধিজাল (চিঠিপত্র ৮।১২৫।৩) ;
 আবশ্যের জাল (গো. ৬।২৪৮।১০) ;
 আবশ্য কুহেলিকাজাল (বী. ১২।৬৬।২২) ;
 আয়ের জাল (কা. ২৪।৪৩০।৬) ;
 আশাজাল (ব. ১৫।৩৪০।৯) ;
 ইংরাজ সমাজের জাল (বা. ১০।৩৮৫।১৮) ;
 ইতিহাস জাল (ব. ১৫।১২৬।৩) ;
 উপকরণ জাল (ধ. ১৩।৩৬১।১০) ;
 উর্দাজাল (ক. কো. ২।১০৭।১৭) ;
 ঋণের জাল (গো. ৬।৫৩০।১০) ,
 ঋণজাল (পা. ২২।৪৫৪।১৯) ;
 ঐক্যজাল (লো. ৬।৫৭৯।২৭) ;
 কর্তব্যের জাল (প্র. ৪।৫৬১।৪) ;
 কর্মজাল (আ. ৩।৫৭৬।২৫) ;
 কলুষজাল (প. ১৫।১৯৩।২৪) ;
 কল্পনার জাল (সো. ত. ৩।১৩২।২৮) ;
 কল্পনাজাল (আ. ২।৫০৮।১৭) ;
 কল্পনাসূত্রে বোনাজাল (আ. ২৩।৮০।১৫) ;
 কাহিনীজাল (প. ১৩।৫।২৩) ;
 কিরণজাল (শৈ. অ-১।৫১০।১৫) ;
 রত্নভরণ কিরণজাল (প্রা. ৫।৫৪৭।১৯) ;
 কিরণকুন্তল জাল (প্র. প্র. ১।১৮৬।১) ;
 কীর্তিজাল (ব. ১৫।১৪৮।৭) ;
 কুজাটজাল (গীতবিতান ২।৪৩৩।৫) ;
 মাঝার কুজাটজাল (ন. ১৮।২০২।১৬) ;
 কুন্তলজাল (প্র. ১।৭৯।১৭) ;
 কুশাশার জাল (বী. ১২।৬৯।২) ;
 কুহেলিজাল (ন. ২২।৭৭।১৬) ;
 কূটকৌশলজাল (শা. ১৬।৪৯২।২১) ;
 কৃত্রিমতার জাল (প্র. ১১।৫১০।৫) ;
 কেশজাল (সো. ত. ৩।১২০।২৫) ;
 কোশলজাল (গো. ৬।৫৪২।২৩) ;
 ক্লাস্তিজাল (গীতবিতান ১।২৬৪।২১) ;
 ক্ষণকালের জাল (বা. ১২।৪০৯।২৩) ,
 ক্ষুদ্রতাজাল (চা. ৪।৫০২।১) ;
 গন্ধজাল (কা. ১২।১০২।১৬) ;
 গল্পের জাল (ছে. ২৬।৬০২।২৮) ;
 গানের জাল (প. ২০।২০২) ;
 গীতশ্রোতাজাল (জ. ২৫।৯৯।২৩) ;
 গোলামির জাল (চ. ৭।৪৫৩।১৬) ;
 ঘটনাজাল (নৌ. ৫। স্বচনা -২।১) ;
 ঘনছায়াজাল (গীতবিতান ২।৪৬১।১৯) ;
 ঘরের জাল (ছে. ২৬।৬৩০।২০)
 চক্রান্তজাল (স. স. ২৬।৬৩৮।৯) ;
 চাকরির জাল (দু. ১১।৪১৬।১২) ;
 চাতুরীজাল (বি. ৪।১৩৩।৬) ;
 চিন্তাজাল (মা. ৪।১৭৪।১৯) ;
 চিন্তাজাল (বি. ২।৩২৩।১৯) ;
 চিরমোঁনজাল (ব. ১২।১৬।১৫) ;
 চিহ্নজাল (সা. প. ২৩।৩৭৫।১৯) ;
 চেতনার জাল (ন. ২৪।৩১।৩) ;
 ছন্দোজাল (আ. ২৩।১১৭।১৯) ;
 ছলনাজাল (শে. ২৬।৫০।১৭) ;
 ছায়ার জাল (দু. ১১।৪৫০।১৫) ;
 ছুটিতে কাজেতে জালবোনা
 (দু. ১১।৪১৮।২০) ;
 জঞ্জাল (আ. ৩।৬৩৫।২২) ;
 জটোরঞ্জিৎজাল (কা. ৫।৯৪।১৫) ;
 জড়সংস্কার জাল (ফে. ১৯।৩৮০।২১) ;
 জড়সংস্কার জাল (থু. ২৭।৪৯১।১২) ;
 জড়তার জাল বুনি (থু. ২৭।৪৯০।২৮-২৯) ;
 জলের জাল (ন. ৪।১২।২৬) ;
 জাতিজালপাশ (সো. ত. ৩।৯০।১৩) ;
 জীবনের জাল (মা. ২।১৩৯।২) ;
 জ্যোৎস্নাজাল (হা. ৬।৯৩।২৭) ;
 ট্যাক্সের জাল (চা. ৪।৪৯।৪) ;

ঘনজাল (চিঠিপত্র ২।৩১।১২) ;
 হুর্দৈবজাল (চিঠিপত্র ৮।১৩৭।৪) ;
 হুর্ভাগ্যজাল (চা. ৪।৫১০।২) ;
 হুর্ভাবনার জাল (ব. ৮।৩১৪।২৬) ;
 দৃষ্টির জাল (ছ. ছ. ২।১।১০৭।১২) ;
 দৃষ্টিজাল (সৈ. ২২।৫২।১৩) ;
 দেখার জাল (শে. স. ১৮।৭৩।১৪) ;
 ধনের জাল (কা. ২৪।২৬।৫১) ;
 ধর্মমতের জাল (প. স. ২৬।৫৪৫।১১) ;
 ধূলিজাল (ক. কো. ২।৩৩।১৩) ;
 নদীজাল (ভা. ৪।৪৭৩।২২) ;
 নবপল্লবজাল (প্রা. ৫।৫১২।৩০) ;
 নাড়িব জাল (বা. ২৬।৩৯০।২২) ;
 নাড়িজাল (রা. ১০।৪৭৬।২২) ;
 নাড়ীর জাল (আ. ২৩।৮২।৪) ;
 নাড়ীজাল (আ. ৩৬।১৭।৩) ;
 নিমেষের জাল (প. ২০।৩১।১১) ;
 নিয়মের জাল (যো. ৯।২৮৩।৫) ;
 নিষম জাল (ছ. ২।১।৩৬৩।৭) ;
 নিষমস্বত্বের জাল (গো. ৬।৫৪৯।১৪) ;
 নিষমস্বত্বজাল (জ. ২৫।৯১২।৩) ;
 নীহারজাল (স. ১।৩২।১) ;
 নৃত্যজাল (বী. ১৯।৮৩।২৬) ;
 পত্রপুঞ্জজাল (মা. ২।২৬৪।৯) ;
 পল্লবজাল (ভ. অ-১।১৫৮।৪) ;
 পুঞ্জজাল (উ. ১০।৪২।৯) ;
 প্রতীকের জাল (বা. ২৬।৩৭৮।১৭) ;
 প্রবৃত্তিজাল (আ. ৯।৫১৮।৫) ;
 প্রভুজাল (কা. ২৪।২৯।১৬) ;
 প্রাদেশিকতার জাল (ম. ২৭।২৯২।১৯) ;
 প্রেমের জাল (স. অ-২।১৩৫।২৩) ;
 ক্যাশানজাল (জা. ১৯।৩০৮।২৩) ;
 বচনজাল (পা. ২২।২৬।১১) ;

বন্ধনজাল (প. ২।৫৫৮।৪) ;
 বস্তুজালজড়িত (প. স. ২৬।৪৭৫।৫) ;
 বস্তুচর্চার জাল (র. ১৫।৩৭৮।১১) ;
 বহুচিন্তাজাল (চা. ৪।৫১০।২১) ;
 বাণিজ্যের জাল (প্র. ৪।২৬৩।২) ;
 বাণিজ্যজাল (ভা. ৪।৪০৩।২৪) ;
 বাঁধনজাল (প্র. প্র. ১। সূচনা-১।৮) ;
 বার্ষিক্যের জাল (সৈ. ২২।২৬।১৭) ;
 বাষ্পজাল (স. ১।৩২।৪) ;
 বাহুজাল (ব. ১২।৬৬।১) ;
 বাহ্যিকতার জাল (প. স. ২৬।৫০০।৩০) ;
 বিচারজাল (চা. ৪।৪৯৮।১০) ;
 বিতর্কের জাল (বি. ২।৩২৬।১৭) ;
 বিদ্যার জাল (তি. ২৫।২৮৩।২২) ;
 বিনাশের জাল (প. ১৫।৩১৩।৪) ;
 বিপত্তিজাল (বা. ১০।২৫০।৫) ;
 বিশদের জাল (প. ২০।১৭৭।১১) ;
 বিপদজাল (কা. ৭।৯৩।৫) ;
 বিশ্বস্তির জাল (পু. ১৪।৯২।১৭) ;
 বেদনার জাল (চ. ৭।৪৫৭।৪) ;
 বৈষয়িকতার জাল (চা. ৪।৫৩৬।২৪) ;
 বোধের জাল (বা. ২৬।৪৫৫।১৫) ;
 ব্যর্থ চেষ্টার জাল (অ. ১১।৩৭৩।৫) ;
 ব্যাকরণস্বত্বের জাল (প. ১৮।৪৯৮।১৩-১৪) ;
 ভয়জাল (নৈ. ৮।৫০।১) ;
 ভাগ্যের জাল (যো. ৯।৩৩৮।২০) ;
 ভাগ্যজাল (গো. ৬।২৪১।৬) ;
 ভাবনার জাল (নৌ. ৫।২২৩।২২) ;
 ভাবুকতার জাল (প. স. ২৬।৪৭৪।১৮) ;
 ভারাবর্তনের জাল (বি. ২৫।৩৮৪।২৬) ;
 ভালোবাসার জাল (নৌ. ৫। সূচনা-১।১৯) ;
 ভিক্ষুকতার জাল (শিলা ৩৫।১।১৯) ;
 ভোগৈশ্বর্যজাল (আ. রা. বি. ২৭।১৩৫।১২) ;

- ভ্রমের জাল (গ. ১৭।১৬৯।২০) ;
 মঙ্গলজাল (ভা. ৪।৪২৭।২৫) ;
 মঙ্গলচেষ্টার জাল (রা. ১০।৪৬৫।২৪) ;
 মন্ত্রজাল (নৌ. ৫।১৮১।২৭) ;
 মবণেব জাল (প্র. প্র. ১।৬৯।২২) ;
 মরীচিকাজাল (সো. ত. ৩।৫৮।২২) ;
 মায়ার জাল (ঘ. ৮।২১৯।১০) ;
 মায়ানিদ্রাজাল (প. ১৫।২১৩।১৩) ;
 মায়ামন্ত্রজাল (ঘ. ৮।১৮৭।২৭) ;
 মিথ্যার জাল (মা. ৪।১৪২।৩) ;
 মিথ্যাজাল (শা. ১৬।৪৮৫।১৫) ;
 মিলনজাল (সা. ৮।৪২৭।৪) ;
 মুহূর্তজাল (প. ১৫।২২৩।১৮) ;
 মৃত্যুজাল (নৌ. ৫।৪০০।২০) ;
 মেঘের জাল (পূ. ১৪।৫৩।৫) ;
 মেঘজাল (শৈ. অ-১।৫০১।১৯) ;
 মোহজাল (চো. বা. ৩।৪৯০।৪) ;
 মোহ-অন্ধকারের জাল (শা. ১৬।৪৬১।২৩) ;
 মূজিয়মের জাল (রা. চি. ২০।৩০৫।১৬) ;
 মুক্তিজাল (গোর। ৬।২৯৮।১৪) ;
 যোগের জাল (প. ১৮।৪৬৭।৩০) ;
 রত্নভরণকিরণজাল (প্রা. ৫।৫৪৭।১৯) ;
 রশ্মিজাল (প্রা. ২২।১২২।২০) ;
 রহস্যজাল (মা. ২।১৭৪।১৫) ;
 রাগরাগিণীর জাল (ক. কো. ২।৫০।২২) ;
 রেখাবজাল (চি. ৪।১১৭।২১) ;
 রেণুজাল (ক. কো. ২।৫৬।১৩) ;
 রেশমের জাল (ক. কো. ২।৯৯।১০) ;
 লতাজাল (চি. ৩।১৭৯।৫) ;
 লুতাতন্তজাল (স্ব. ১১।৪৭৯।১০) ;
 লোভের জাল (প. ১৫।২০৬।৫) ;
 শতকর্মজাল (মা. ৪।১৫৫।৭) ;
 শব্দমরীচিকাজাল (চি. ৪।৭৬।১৩) ;
 শব্দার্থজাল (বা. ২৬।৪৫১।১৮) ;
 শরজাল (প্র. ৯।৫৬০।৪) ;
 শাখাজাল (চো. বা. ৩।৩৪০।১৭) ;
 শাসনের জাল (কা. ২৪।৩০৮।১৮) ;
 শাসনজাল (আ. ৩।৬১৭।১৯) ;
 শাস্তির জাল (চা. ১৩।৩১৫।২৬) ;
 শিকড়ের জাল (অ. অ-২।৫৪৯।১৫) ;
 শিকড়জাল (গ. ১৯।২২০।২৭) ;
 শিশিরবিন্দুজাল (চো. বা. ৩।২৯০।২১-২২) ;
 ষড়বস্ত্রজাল (বি. ১৭।৪১।২৪) ;
 সংকটজাল (নৌ. ৫।২৪৫।১৯) ;
 সংকোচের জাল (প্র. ১৫।৫৫২।৯) ;
 সংশয়জাল (গ. ২১।২৩১।২৪) ;
 সংসারের জাল (ছ. ২১।২৯৮।২০) ;
 সংস্কারের জাল (সা. প. ২।৩৫২।১২) ;
 সংস্কার ও লোকাচারের জাল
 (ম. ২৭।২৯০।৫-৬) ;
 সংস্কারজাল (শা. ১৩।৪৮০।১৩) ;
 সংস্কারজড়িমাজাল (কা. ২৪।৩৮১।২৭) ;
 সমস্তাজাল (নৌ. ৫।৪৪৪।২১) ;
 সমুদ্রের জাল (বা. ১।১৮৮।৫) ;
 সম্বন্ধজাল (চা. ৪।৫২৯।১৬) ;
 সামাজিকভাজাল (প. ১০।৫৭১।২১) ;
 স্মৃতিজাল (উ. ১০।৬৫।৩) ;
 স্মৃতিমিলনের জাল (বি. ৫।৪৪৭।১০) ;
 স্মৃতিহৃৎস্বের-জালে-বদ্ধ (পা. ২২।৪৭৭।৩) ;
 স্মৃতিস্বপ্নজাল (চো. বা. ৩।৪৭৭।২৬) ;
 স্মৃতিজাল (গী. ১১।১২৪।৪) ;
 স্মৃতিজালজড়িত (সা. ৮।৫০৬।১৩) ;
 স্মৃতির জাল (গী. ১১।২১।১২) ;
 স্মৃতিজাল (সা. প. ২।৩৩৭।২৮) ;
 স্মৃতিজনের জাল (নৈ. ৮।২৮।১৪) ;
 সেবাজাল (ছ. ১১।৪৪৫।৯) ;

স্নায়ুজাল (প. ২৬০১১২) ;

স্বপনের জাল (ক. কো. ২৮৭১৫) ;

স্বপ্নের জাল (ব. ৮১২৪৪১২৮) ;

স্বপ্নজাল (রা. রা. ১৩০৭১২৩) ;

স্বপ্নবোনাজাল (ষো. ৯২৩৭১৪) ;

স্বপ্নতার জাল (শে. ক. ১০৩৩৯২৪) ;

স্বার্থজাল (আ. ৩৫৬০১৯) ;

হাসির জাল (শা. ২৫৮৮২০) ;

হৃদিগ্রন্থিজাল (ব. অ-১৮১১১৩) ;

ডোব—

অধীনতাডোর (গো. ৬৪১৮১১৩) ;

আকর্ষণডোর (মা. ২১৬৭১৭) ; আসা-

যাওয়ার ডোর (ব. ১২৭৩১৯) ;

একের ডোর (ক. ৭১ ২০১১১১) ; কথাব

ডোর (উ. ১০১৫১১৬) ; কর্মডোর (প.

— ১৫১৬৭১২) ; কাব্যডোর (বী. ১৯৩২১৭) ;

কুটুম্বিতাডোর (ক. ৬৭১৮) ;

চিত্ররেখারডোর (শা. ২২১০৮১১২) ;

ছলনাডোর (গীতবিতান ৩৮৩৮১১৪) ;

জীবনডোর (মা. ২১২২৭১২৫) ;

তিথিডোর (গীতবিতান ২৩৭২১৪) ;

ছুঃখডোর (ন. ২২৭৯১৩) ;

হর্বালিনার ডোর (রা. ১০২৫২১৩) ;

নবমিলনডোর (গী. ১১১০৪ ২১) ;

নিকটের ডোব (বি. ১৭৪৪১১০) ;

নিষেধের ডোর (চৈ. ৫৩২১৭) ;

পরিচয়ডোর (বী. ১৯৮৮১২০) ;

পুচ্ছডোর (উ. ১০৭৭৭) ;

পুষ্পডোর (চিঠিপত্র ৪১২৪১১৪) ;

পুষ্পসৌরভডোর (হা. ৬৮৭১১৭) ;

প্রেমেরডোর (ক. ৬৩৩১০) ;

বন্ধনডোর (ভ. অ-১১৬১১৫) ;

বন্ধুত্বের ডোর (পু. ১৪১৩১১৭) ;

বরণডোর (শ্রী. ২৫১১৯৪১৩) ;

বস্তুবোধন ডোব (সে. ২২৩৪১১৬) ;

বোধনডোর (আ. ২৩৭৯১৪) ;

বাহুর ডোব (ক. কো. ২৮৮১২১) ;

বাহুডোব (ক. কো. ২৮৮১২) ;

বিধিবিধান-বোধনডোর (গী. ১১১১১১৫) ;

বিবহ ডোর (শা. ২২১০৯১১৬) ;

বৃত্তডোর (গু. ১৭১২০১১২) ;

বেদনডোব (গীতবিতান ১৯০১১৫) ;

মঙ্গলডোব (ক. ৭১৬৮১৩) ;

মবণের ডোর (শ্রী. ২৫১১৯৫১৪) ;

মরণডোর (প্র. ১৬৯১২০) ;

মায়ার ডোর (প্র. ৪১২৮৮১২৪) ;

মায়াদোর (মা. ২১১৫৭১৩) ;

মোহডোর (কা. ৫৭৮১২২) ;

বৃহস্পতিডোর (কা. ৫১১৫৫১১০) ;

রাজকর্মডোর (চৈ. ৫৭০১৪) ;

রূপেরই ডোর (শা. ২২১৯৯১২০) ;

লঙ্কাডোর (গী. ১১১২২১১৩) ;

লৌহডোর (উ. ১০৪৭১১৪) ;

লৌহশৃঙ্খলেব ডোর (ছ. গা. ১১১৪০১৫) ;

শাস্ত্রডোর (মা. ৪১১৪৪১৪) ;

সংশয়ের ডোর (বী. ১৯১২৬১৯) ;

সখ্যের ডোর (ক. অ-১১০১১৬) ;

সখ্যডোর (প্রা. ২২১১৫১১৫) ;

সত্যডোর (গীতবিতান ৩৮১৬১১) ;

স্নেহডোর (কা. ৫১০০১১) ;

স্বপনডোর (ম. ১৫১২৭১৬) ;

নিগড়—

দাসত্বনিগড় (ভা. ৪৩৭৬১৮) ;

নিয়মনিগড় (মা. ২১১৪৩১১) ;

পরিধি—

আনন্দপরিধি (মা. ৮।৩৯৫।২৮) ;

দেহপরিধি (মা. ১৯।৩২৮।১০) ;

বিশ্বপরিধি (প্রা. ৫।৫১৪।১৬)

পরিবেষ্টন—

শোকের পরিবেষ্টন (নৌ. ৫।৩০৪।১৩)

পাশ—

অঙ্গীকারপাশ (ম. অ-২।১৬৭।২৬) ;

অধীনতাপাশ (আ. ৩।৫২৯।২৬) ;

অমঙ্গলপাশ (রা-রা-১।৩৩৫।১৫) ;

অলকপাশ (কা. ৫।৮৫।২০) ;

অলতাপাশ (মা. ২।২২৮।২২) ;

আকর্ষণপাশ (গ্র. ৮।৫১৯।১২) ;

আত্মীয়তাপাশ (গ্র. ১৭।৪৭৪।২৮) ;

আলিঙ্গনপাশ (রা-রা. ১।৩০১।২৫) ;

ইজিতপাশ (সা. ৮।৩৪৫।৮) ;

ঋণপাশ (স. ১।২২।১১) ;

কর্ডব্যপাশ (চি. ২।৫১০।৮) ,

কর্মের নানা পাশ (ভা. ৪।৩৯৯।৫) ;

কর্মপাশ (ভা. ৪।৪৬৩।২৫) ,

কুণ্ঠমপাশ (মা. খে. ১।২৫৩।৮) ;

চিরদিবসের পাশ (চি. ৩।১৮৬।১৫) ;

জীবনপাশ (গ. ১৮।২৬৯।২৪) ;

জ্যোৎস্নাপাশ (ছা. ৬।৮৭।১৭) ;

দাসত্বপাশ (সা. প. ২।৩৪৮।২৫) ;

দৈত্বপাশ (ন. ২৪।১৯।৫) .

নিয়মের পাশ (মা. ২।২৬৭।১৬)

নিয়মপাশবদ্ধ (প. ২।৫৯১।১৩) ;

পরশিক্ষাপাশ (স. ১২ ৪৯৬।৫) ;

পরিণয়পাশ (প. ২।৬৩৯।৬) ;

পরিহাসপাশ (গ. ১৯।২৭৩।৭) ;

পুচ্ছপাশ (চো. বা. ৩।৪৬৬।১৫) ;

প্রলোভনপাশ (ধ. ১।৩৩৮।১২৭-২৮) ;

প্রেমপাশ (মা. খে. ১।২২৯।৪) ;

ফুলের পাশ (মা. খে. ১।২৩৬।২২) ;

বন্ধনের পাশ (রা. রা.-১।৩০৮।৩০) ;

বন্ধনপাশ (ক. কো. ২।১২১।১৩) ;

বল্গাপাশ (ম. ১৫।৪২।৪) ;

বেদনাপাশ (প. ৪।৫৪৬।৪৫) ;

ব্যগ্রতাপাশ (চি. ৪।২৮।২৫) ;

ভুক্তপাশবদ্ধ (প্রা. ৫।৫১৩।২০) ;

মতপাশ (সা. ৮।৪৭৭।২৫) ;

মাতৃবন্ধপাশ (সো. ত. ৩।১৪৩।১) ;

মাতৃস্নেহপাশ (কা. ৫।১৬।১৫) ;

মায়াপাশ (মা. খে. ১।২৩১।৮) ;

মিলনপাশ (বা-রা. ১।৩০৭।২৭) ;

মৃত্যুপাশ (ত্র অ.-৪।১৮৭।৪৭) ;

মোহপাশ (ত. ২।১১৫৪।২৪) ;

রঙ্গপাশ (সো. ত. ৩।২৪।১৮) ;

লতাপাশ (প. ২।৫৫৮।৫) ;

লৌহপাশ (মা. ৪।১৬৫।১৭) ;

শাসনপাশ (রা. রা. ১।৩৩২।১০) ;

শৃঙ্খলপাশ (ম ১৫।৭৯।৩১) ;

সংসারপাশ (বুদ্ধদেব ৩২।১৬) ;

স্নেহপাশ (রা. বা. ১।৩৩৮।২২) ;

স্বপ্নমন্ত্রপাশ (প. ১৫।৩০।১২১) ;

স্বপনপাশ (মা. খে. ১।২৪৪।৮) ;

স্বার্থপাশ (উ. ত্র. অ-২।২০৬।৭) ;

ফাঁদ—

ইন্ড্রিয়ের ফাঁদ (গ্র. ২০।৪৩৫।১৪) ;

উচ্চারণের ফাঁদ (গ্র. ১১।৫০৭।৯) ;

কর্মের ফাঁদ (বি. ৫।৪৭৬ ৫) ;

প্রলোভনের ফাঁদ (প্র. ১।২৬।১৯) ;

প্রেমের কঁাদ (মা. খে. ১১২৮।১৪) ;
 বাসনার কঁাদ (ক. কো. ২।১০৬ পৃ.) ;
 বিষের কঁাদ (শে. ক. ১০ ৩১৮।২২) ;
 ভাবনার কঁাদ (গী. ১১।২১৭।৪) ;
 মরণের কঁাদ (চি. ১৬।২৭৮।৪) ;
 মাহুষের কঁাদ (কা. ৫।৮৪।২০) ;
 মায়ার কঁাদ (গীতবিতান ২।৪০৮।৭) ,
 মায়াকঁাদ (প্র. প্র. ১।১৬৪।২২) ;
 সর্বনাশের কঁাদ (গীতবিতান ১।২৬৭।১৪) ;
 স্বার্থের কঁাদ (গ. ১৯।২৮৪।১৫) ;

কাঁস—

অন্ধতার কাঁস (পা. ২২ ৪৬।১৪) ;
 ঋণের কাঁস (কা. ২৪।৪২৮।২১) ,
 দেনার কাঁস (ষো. ৯।১৮৮।১৪) ;
 বিরোধের কাঁস (ভা. ৪।৬৮।১২৬)
 বিলাসের কাঁস (স. ১২।২১৭ পৃ.) ;
 শুভ্রত্বের কাঁস (গো. ৬।৫৪৮।১৬) ;

বন্ধ—

অবসাদবন্ধভাঙা (ম. ১৫ ৭৮।১৫) ;
 আবেষবন্ধ (শে. ক. ১০।৩৩৭।২৫) ;
 ইন্দ্রিয়বন্ধ (সো. ত. ৩।৬৫।২৬) ;
 ঐক্যবন্ধ (প. ১৫।১৭০।১৪) ;
 কর্মবন্ধ (নৈ. ৮ ৩৪।২০) ;
 চেতনাবেদনাবন্ধ (সো. ত. ৩।৬৫।১১) ;
 ছন্দের বন্ধ (বি. ১৭।২৮।৯) ;
 জটিলজটীর বন্ধ (পূ. ১৪।২২।১৪) ;
 জড়তার বন্ধ (গীতবিতান ১।২৬৩।১৩) ;
 জীবনবন্ধ (বি. ২।৩০৫।৪) ;
 দাক্ষিণ্যেব বন্ধ (প. ১৫।১৮০।২৩) ;
 দাসত্ববন্ধ (শিক্ষা ৩৫২।৭) ;
 হুঃখবন্ধ (ন. পূ. ১৮।১৮৪।১১) ;

হুঃখপন্যেব বন্ধ (প. ১৫।১৯৮।১৬-১৪) ;
 নিয়মবন্ধহারা (বী. ১৯।৮৪ ১২) ;
 বাণীর সম্মোহবন্ধ (ন. ২৪।৬২।২৪) ;
 বাণীব বন্ধ (ম. ১৫।৩২।৯) ;
 বাসনাবন্ধ (ভা. ৪।৪৬৬ ২৭) ;
 বাহুবন্ধ (চি. ৩ ১৮৩।১৮) ;
 বৃত্তবন্ধহারা (পূ. ১৪।২০।৮) ;
 বেণীবন্ধ (ব. ১৫।১২৫।২০) ;
 ব্রতবন্ধ (গীতবিতান ৩।৬২৬।২) ;
 মাতৃবন্ধপাশ (সো. ত. ৩।১৪৩।১) ;
 মায়াব বন্ধ (মা. ৪।১৭৫।৬) ;
 মিলনবিরহবন্ধ (প্র. ২৩।১০।১৭) ;
 মুকুলের বন্ধ (ম. ১৫।১৩।৪) ;
 মোহবন্ধ (চি. ৫।৩১।১১)
 শাখাবন্ধ (কা. ৫।৭৩।২৫) ;
 শৃঙ্খলবন্ধ (পূ. ১৪।৮০।১৫) ;
 সংসারবন্ধ (নৈ. ৮।১৯।১৩) ;
 সময়ের বন্ধ ছাড়া (প্র. ২৩।৮৭।৬) ;
 সামীপ্যের বন্ধ (শে. ১৮।১২১।৩০) ;
 সৃষ্টিবন্ধ (শি. ১৩।৬৬।৬) ;
 স্নেহবন্ধ (কা. ৫।১১৮ ৮) ;

বন্ধন—

অঙ্গবন্ধন (বি. ২৭।৩২২.২৭) ;
 অজ্ঞাতির বন্ধন (ম. ১৫ ২৫।২১) ;
 অজ্ঞানের বন্ধন (বি. ২৭।৩৯০।২৭) ;
 অদৃষ্টের বন্ধন (মা. ২।১৯৭ ১৫) ;
 অধীনতার বন্ধন (রা. ১০।৪৮২।৩০) ;
 অধীনতাবন্ধন (ভা. ৪।৪১৮।১৭) ;
 অহুবাগবন্ধন (চা. ৪।৫১৮।১২) ;
 অহুশোচনার বন্ধন (ছিন্নপত্র ২৭৩।১৭-১৮) ;
 অবজ্ঞার বন্ধন (কা. ২৪.৪৬০.৯) ;
 অবস্থাবন্ধন (সা. ৮।৪৪৫।২৩) ;

- অবিশ্বাসের বন্ধন (পা. ২২।৪৪৪।৩০) ;
 অভ্যাসের বন্ধন (নৌ. ৫।২৪৫।৭) ;
 অভ্যাসবন্ধন (আ. ৯।৫১৭।২০) ;
 অর্থের বন্ধন (কা. ৫।৯৬।৬) ;
 অর্থবন্ধন (লো. ৬।৬০৮।২০) ;
 অলকবন্ধন (গীতবিতান ২।২৮৪।৬) ;
 অহংকারই বন্ধন (শে. ১৮।৩৭।২১) ;
 আচারের বন্ধন (গো. ৬।৫৩২.৬) ;
 আজন্মের বন্ধন (বি. ২।৩৩০।২২) ;
 আজন্মমিলনবন্ধন (প. ২।৬০৬।৫) ;
 আত্মীয়বন্ধন (ন. ২৪।১২.৬) ;
 আত্মীয়তার বন্ধন (জা. ১৯।৩২০ ২০) ;
 আত্মীয়তাবন্ধন (প. ২।৫৫৪।১৭-১৮) ;
 আত্মীয়স্বজনের বন্ধন (গো. গ. ৩।২৪৬।২১) ;
 আদবকায়দার বন্ধন (জা. ১৯।৩০২।৩-৪) ;
 আদর্শবন্ধন (স. প. ২৩।৫২৩।২০) ;
 আনন্দবন্ধন (গীতবিতান ১।১৫৮।২২) ;
 আবরণবন্ধন (চি. ২৫।১৩৮।৪) ;
 আলো-আঁধারের বন্ধন (বী. ১৯।৫২।২২) ;
 আশৈশবের বন্ধন (গো. ৬।৪৭৬।১২-১৩) ;
 আসক্তিবন্ধন (গো. ৬।২৫৫।৮) ;
 ইচ্ছার বন্ধন (খা. ১৯।৪২৮।২১) ;
 ইচ্ছা-অনিচ্ছার বন্ধন (নৌ. ৫।২৭৫.২) ,
 ইয়্যাকিবন্ধন (গ. ২.১।১৯৯।৮) ;
 ইষ্টকবন্ধন (চো. বা. ৩।৩৩৭।২০) ;
 উদ্দেশ্যবন্ধন (প. ২।৬০৪।৩) ;
 ঋণের বন্ধন (ঘো. ৯।৩৪৩।২৩) ;
 ঐক্যের বন্ধন (প্র. ২।৭৪৫।২৫) ;
 ঐক্যবন্ধন (আ. ৩।৫১৭।৯) ;
 কঙ্কণবন্ধন (ব. ১৫।১২৮।১৬) ;
 কর্তব্যবন্ধন (লো. ৬।৬৪৮।৮) ;
 কর্মের বন্ধন (ধ. ১৩।৪২৮।১৫) ;
 কর্মবন্ধন (প. ২।৫৬০।১৩) ;
 কলাবন্ধন (চা. ৪।৪৭৮।৬) ;
 কল্যাণবন্ধন (আ. ৩।৫২৫।২২) ;
 কল্যাণকর্মবন্ধন (কা. ২৪।২৭৫।২০) ;
 কাছেব বন্ধন (শে. ১৮।২৯।২৪) ;
 কারাগারের বন্ধন (প. ২০।১৭৭।১৩) ;
 কালের বন্ধন (মা. ২।২৫৮।১৩) ;
 কুলবন্ধন (গ. ১৯।২৫০।৭) ;
 কুলকিনারার বন্ধন (প. স. ২৬।৪৮৪।১৭) ;
 কৃত্রিমতার বন্ধন (চা. ৪।৪৮০।৬) ;
 ষড়যন্ত্রের কৌতুক বন্ধন (গ. ২২।২২২।২৪) ;
 ক্ষুদ্রতার বন্ধন (রা. ১০।৪০২।১২) ;
 গর্ভবন্ধন (গ্র. ১৫।৫৩৪।১০) ;
 গানেরি বন্ধন (শে. ১৮।১৩ ১২১) ;
 গোত্রবন্ধন (স. ৯২।৪৪১।৭-৮) ;
 গৌরবের বন্ধন (ধ. ১৩।৩৯৭।২০) ;
 ঘরের বন্ধন (গ. ২২।৪১৯।১০) ;
 চেতনার বন্ধন (স. ১০।৫০৬।১৯) ;
 চন্দ্রে বন্ধন (প. ১৫।১৬৮।২২) ;
 চন্দ্রের বন্ধন (পু. ১৬ ভূমিকা।১৪) ;
 ছন্দবন্ধন (সা. ২৪।৭৮।১৯) ;
 ছলনার বন্ধন (গীতবিতান ৩.৬৮৪।২২) ;
 জড়ের বন্ধন (প. ২।৫৪৪ ৬) ,
 জড়ত্বের বন্ধন (প. স. ২৬।৪৬৮।১১) ;
 জড়প্রথার বন্ধন (ম. ২৭।৩১২।৮) ;
 জনবন্ধন (আ. ৯।৫০৬।১৯) ;
 জরার বন্ধন (অ. ১১।৩২৬।৮) ;
 জাতরক্ষার বন্ধন (জা. ১৯।৩০৭।৮) ;
 জাতীয় বন্ধন - (রা. ১০।৪০৮।৮) ;
 জীবনটা বন্ধন (শে. ক. ১০।৩৩০।৭) ;
 জীবনবন্ধন (ব্র. অ-১।৯৬।৮) ;
 জাতিবন্ধন (স. ১২ ৪৪১।৭-৮) ;
 ঝঞ্ঝার বন্ধন (ভা. দে. ২৩।১৭৩।১৫) ;
 তটবন্ধন (ভা. ৪।৪১৪।২৭) ;

- তথ্যবন্ধন (সা. প. ২৩।৩৯৪২) ;
 তরঙ্গবন্ধন (সো. ত. ৩।৫৫।২৫) ;
 দাম্পত্যবন্ধন (সো. ৬।৬৪৩।১৯) ;
 দায়িত্বের বন্ধন (যা. ১৯।৫২৬।১৮) ;
 দায়িত্ববন্ধন (প. ১৮।৫৩০।৬) ,
 দাগবন্ধন (প. ১৮।৪৭২।২৯) ;
 দুঃখের বন্ধন (আ. ৩।৫৯৮।২৯) ;
 দুঃখবন্ধন (গ. ১৯ ২৪৪।১১) ;
 দৃষ্টির বন্ধন (শা. ২২।১০৬।২৪) ;
 দেশকালের বন্ধন (স. অ-২।৯৮।২১) ;
 দেশগত বন্ধন (যা. ১৯। ৪২৯।১৮) ;
 দেহবন্ধন (বী. ১৯।৪৭।৮) ;
 ধর্মের বন্ধন (প্রা. ৫।৫০৪।২৭) ;
 ধর্মবন্ধন (গ. ২১।১৯৫।৮) ;
 ধূলিবন্ধন (লি. ২৬।৯৪।১) ;
 নাগপাশবন্ধন (প. ২।৬২০।৮) ;
 না-চেনার বন্ধন (শে. ক. ১০।৩০৫।১৯) ;
 নাচের বন্ধন (ছ. ২১।৪২৩।১৩) ;
 নিখিল-বন্ধন (সো. ত. ৩।৯৯।৫) ;
 নিত্যপ্রেমের বন্ধন (আ. ২৭।১৯৫।৯) ;
 নিয়মের বন্ধন (শা. ১৩।৪৭৮।১৯)
 নিয়মবন্ধন (সা. প. ২৩।৪৮৫।১৯) ;
 নীতি-বন্ধন (কা. ২৪।২৪৬।২২) ;
 নৈপুণ্যের বন্ধন (শে. ১৮।৪০।২২) ;
 নৈরাশ্র-দৈত্যের বন্ধন (চা. ৪।৫০৯।১৪) ;
 পংক্তিবন্ধন (ছ. ২১।৩৬৬।২৪) ;
 পঞ্চভূতবন্ধনকর (মু. ১৪।১২২।১১) ;
 পরদাসত্বের বন্ধন (ম. ২৭।২৯৮।৯) ;
 পরমবন্ধন (সো. ত. ৩।৭৬।১) ;
 পরাধীনতার বন্ধন (কা. ২৪।৪৬০।৫) ;
 পরাধীনতাই বন্ধন (জা. ১৯।৩১০।৮) ;
 পরানবন্ধন (চৈ. ৫।৩০।১৪) ;
 পরিচয়বন্ধন (সো. ৬।৬৫২।১৪) ;
 পরিবারবন্ধন (ভা. ৪।৪০৬।২৩) ;
 পাষণ্ডবন্ধন (সা. ৮।৪৪৪।১) ;
 প্রণয়ের বন্ধন (প্র. ২৩।১৩।২) ;
 প্রণয়বন্ধন (শা. ১৩।৪৭০।৩) ;
 প্রভ্যুহের বন্ধন (ম. ১৫।৯২।৪) ;
 প্রথার বন্ধন (প. ১৮।৫৩০।২৮) ;
 প্রবন্ধবন্ধন (প. ২।৫৮৮।২৭) ;
 প্রবৃত্তির বন্ধন (বী. ২৪।১৭০।২) ;
 প্রাণের বন্ধন (চা. ৪।৫০৩।২১) ;
 প্রাণবন্ধন (সা. ৮।৪।২১।৮) ;
 প্রিয়বন্ধন (স. ১২ ৪৮৫।৩) ;
 প্রীতিবন্ধন (সা. ৮.৫০১।৬) ;
 প্রেমের বন্ধন (মা. খে. ১২।৩০।১৩) ;
 প্রেমবন্ধন (মা. খে. ১২।৫৩।২৪) ;
 বজ্রবন্ধন (চা. ১৩।৩০।১৬) ;
 বধবন্ধন (প্র. ৪.৭৫৭.৪) ;
 বন্ধুতাবন্ধন (ক. ২৪।৪৩৬।৫) ;
 বন্ধুত্বের বন্ধন (গ. ১৫।৪২৭।৬) ;
 বল্লরীবন্ধন (চি. ২৫।১৫৫।৩) ;
 বস্তুর বন্ধন (পু. ১৪।৭৬।১) ;
 বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বন্ধন
 (সা. প. ২৩।৫২৬।১০) :
 বাইরের বন্ধন (পা. ২২।৪৪৪।৩০) ;
 বাণীর বন্ধন (শা. ২২।১০৫।১২) ;
 বাস্তবের বন্ধন (সা. প. ২৩।৪৫৭।১১) ;
 বাহুর বন্ধন (মা. ২।১৬৪।৫) ;
 বাহুবন্ধন (নৌ. ৫।১৭৮।২১) ;
 বাহুল্যের বন্ধন (আ. ক্র. বি. ২৭।৩১৮।২৫) ;
 বিধিবন্ধন (জা. ১৯।৩০।১২৭) ;
 বিশ্বাসের বন্ধন (বি. ২।৩০৯।২৪) ;
 বিশ্বাসবন্ধন (ভা. ৪।৪১৮।১) ;
 বৃত্তবন্ধন (ব্র. অ. ২।১৮৯।১০) ;
 বেণীবন্ধন (বি. ৫।৪৮৮।২৭) ;

- বেদনাবন্ধন (শ্রী. ২৫।২০৩।২৪) ;
 ব্যগ্রতার বন্ধন (যো. ৯।২২২।৩০) ;
 ব্যবস্থার বন্ধন (বি. ৫।৪৪৬।১৪) ;
 ব্যবস্থাবন্ধন (স. ১০।৫০৮।৩০) ;
 ভক্তিবন্ধন (শে. ক. ১০।২৭৭।২৫) ;
 ভক্তিব্রহ্মের বন্ধন (চি. ২।৫।১০।১৭-১৮) ;
 ভয়ের বন্ধন (বা. ১৯।৩৮২।২২) ;
 ভ্রাতৃত্ববন্ধন (বি. ২।৩৬০।২৪) ;
 ভালোবাসার বন্ধন (নৌ. ৫।২৯৪।১৬) ;
 ভাষারই বন্ধন (বা. ২৬।৩২৭।১৯) ;
 ভেদবোধবন্ধন (প্র. ২।৩৩।১১) ;
 ভোজনপংক্তির বন্ধন (সা. প. ২৩।৪৮৩।২২-২৩) ;
 মঙ্গলবন্ধন (ধ. ১৩।৩৬৭।২৪) ;
 মমতাবন্ধন (প. ১০।৫৪৩।২৭) ;
 মরণবন্ধন (ক. কো. ২।১০৬।২) ;
 মর্তের বন্ধন (শে. ২৬।৩৯।৯) ;
 মর্মের বন্ধন (গীতবিতান ২।২৮৩।৭) ;
 মলয়ানিলের বন্ধন (হা. ৬।৬।৮৭।১৮) ;
 মহাদেশীয় বন্ধন (প্র. ২২।৫১৫।২২) ;
 মাতৃব্রহ্মের বন্ধন (গো. ৬।৫৩৭।১) ;
 মায়াবন্ধন (গ. ১৭।১২৩।৭) ;
 মাল্যবন্ধন (ছ. ২১।৪১৫।১৬) ;
 মিছেব বন্ধন (সো. ত. ৩।১২৮।৮) ;
 মিথ্যার বন্ধন (সো. ত. ৩।৬৩।১০) ;
 মিলনের বন্ধন (প. স. ২৬।৪৭৬।৭) ;
 মুক্তিবন্ধন (বি. ১৭।৪৪।১১) ;
 মুক্তিকাবন্ধন (সো. ত. ৩।১৪০।৩) ;
 মৃত্যুবন্ধন (শা. ১৬।৬৪৫।১৩) ;
 মোহের বন্ধন (প্র. ১।১৯২।২০) ;
 মোহবন্ধন (প. ১০।৫৭৫।১০) ;
 যোগের বন্ধন (সা. ৩।৫৫৯।৯) ;
 যোগবন্ধন (প. ১৮।৪২৫।১৯) ;
 রক্তমাংসের বন্ধন (যো. ৯।৩৮৮।২৭) ;
 রাষ্ট্রবন্ধন (কা. ২৪।৪৩৫।২৩) ;
 রিপূর বন্ধন (ভা. ৪।৪২৩।৬) ;
 রীতির বন্ধন (প. ২০।৪৪।২৫) ;
 রেখাব বন্ধন (ব. ১২।১৩।১০) ;
 রেজবন্ধন (সে. ২৬।১৯৭।১) ;
 লোকাচাংকের বন্ধন (চা. ৪।৪৯৩।২৮) ;
 লোভমোহের বন্ধন (বা. ১৯।৪২৫।১৯) ;
 শস্যার বন্ধনমোহ (পু. ১৪।৮২।১৭) ;
 শাস্ত্রিবন্ধন (ভা. ৪।৪১০।১৬) ;
 শাপের বন্ধন (প্রা. ৫।৫৩৫।৩০) ;
 শিকার বন্ধন (গো. ৬।৪৭৭।৭) ;
 শিরার বন্ধন (ক. কো. ২।৭৮।২) ;
 শিষ্টাচারের বন্ধন (জা. ১৯।৩০২।৩) ;
 শৃংখলবন্ধন (প. ১৫।৩১১।১১) ;
 শ্রেণীবন্ধন (প. ১৮।৪৭২।২৫) ;
 শুভবন্ধন (গ. ২০।২৬০। ৩) ;
 সংকল্পের বন্ধন (চা. ১৩।২৭৯।২৭) ;
 সংঘবন্ধন (শিক্ষা ২৬২।৪) ;
 সংঘমের বন্ধন (গ. ২২।১০৮।১৮) ;
 সংস্কারবন্ধন (প. ১৮।৪৯৭।৩) ;
 সখ্যবন্ধন (নৌ. ৫।২৭৭।৩০) ;
 সঙ্গবন্ধন (বা. ১৯।৩৮৫।১২) ;
 সত্যের বন্ধন (চি. ৩।১৭৩।২৮) ;
 সত্যবন্ধন (গো. ৬।৪৬৭।৭) ;
 সন্দেহবন্ধন (পু. ১৪।৭৯।১৩) ;
 সন্ধিবন্ধন (ভা. ৪।৩৯০।২) ;
 সমাজবন্ধন (লো. ৬।৬৪৩।২০) ;
 সম্বন্ধের বন্ধন (মা. ১২।১৭৯।২৩) ;
 সম্বন্ধবন্ধন (ভা. ৪।৩৮২।১১) ;
 সাম্রাজ্যবন্ধন (সা. প. ২৩।৪৭৪।১৬) ;
 জুথের বন্ধন (গ. ১৯।২২৫।১৯) ;
 জুথবন্ধন (মা. ২।২৪০।৭) ;

অশ্বের বন্ধন (শ্রী. ২৫।১৯২।১৪) ;
 অস্তির বন্ধন (পু. ১৪।২৩।১৮) ;
 অস্ত্রবন্ধন (লো. ১৪।১৬০।১৯) ;
 অর্ষমার বন্ধন (হিম্মপত্র ১৯২।১৩) ;
 সেবার বন্ধন (তা. দে. ২৩।১৬৬।৫) ;
 সৌন্দর্যবন্ধন (লো. ৬৬৪৬।১৬) ;
 সৌহার্দ্যবন্ধন (গ. ২০।২৫২।৬) ;
 স্থূলবন্ধন (প. ১৮।৪৬৮।২) ;
 স্নেহমমতার বন্ধন (রা. ২।৪০৬।১৪) ;
 স্নেহসম্পর্কের বন্ধন (গ. ১৯।২৪৪।১৪) ;
 স্মৃতিবন্ধন (প্র. ১২।৫৯৪।১০) ;
 স্বপ্নের বন্ধন (প্রা. ২২।৮।১৫) ;
 স্বর্গের বন্ধন (লি. ২৬।১৭৬।২১) ;
 স্বার্থের বন্ধন (আ. ৩৫।১৭।২১) ;
 স্বার্থবন্ধন (ত্র. অ-২।২০৭।১) ;
 স্বার্থপরতার বন্ধন (প. ১৭।২৫৩।২১) ;
 হীনতার বন্ধন (প. ১৯।২৭২।২৩) ;
 হৃদয়ের বন্ধন (মা. ২।২৬২।১১) ;
 হৃদয়বন্ধন (কা. ৫।১১১।২৮)

বাঁধ—

লাজবাঁধ (গীতবিতান ৩৭৬২।১৬)

বাঁধন—

অবলাদের বাঁধন (ন. ২২।৮৪।২) ;
 কুঁড়িবাঁধন (গীতবিতান ২।৫৯০।১২) ;
 গর্ভবাঁধন (প. ১৩৬।১২৪) ;
 গ্রন্থির বাঁধন (ব. ১৫।১১১।২) ;
 চলার বাঁধন (শে. ক. ১০।২৮৭।১০) ;
 চুরির বাঁধনভোর (আ. ২৩।৭৯।৪) ;
 চোখের জলের বাঁধন (ব. হা. ১।৪০৫।৭) ;
 জলের বাঁধন (প্র. ১।৮৬।১২) ;
 তপের বাঁধন (গীতবিতান ২।৪৯৮।১৯) ;

ধর্মকর্মের বাঁধন (তি. ২৫।২৩২।২৯-৩০) ;
 নিয়মেব বাঁধন (বা. ১৯।৩৮৮।২১) ;
 প্রেমের বাঁধন (ছ. ২১।৪০৮।২৬) ;
 ফুলের বাঁধন (প্র. ২৩।৫২।২৪) ;
 বাহুর বাঁধন (প্র. ১।৬৭।২) ;
 ভালোবাসার বাঁধনমূল (প. ২০।৫১।১৪) ;
 মাম্বাব বাঁধন (চ. ২৫।১৮।১৩) ;
 মৃত্যুবাঁধন (বা. ১৯।৪২৯।১২) ;
 যুক্তিবাঁধনহেঁড়া (বা. ২৬।৪০৫।১০) ;
 লতিকাবাঁধন (ছ. গা. ১।১০৯।২৬) ;
 লতার বাঁধন (চ. ২৫।১৬১।৪) ;
 লাজের বাঁধন (রা. ১০।২২৯।২৪) ;
 সাজের বাঁধন (রা. ১০।২২৯।২৪) ;
 অস্তির বাঁধন (চি. ৪।৪৮৬।২৯) ;
 স্বাভাৱ্যের বাঁধন (বা. ২৪।৩৩৯।১৬) ;

বেড়া—

আঙ্গীয়ের বেড়া (বি. অ-১।৩৫৪ পৃ.) ;
 আলোর বেড়া (শে. ১৮।৪১।২২) ;
 নিয়মেব বেড়া (পা. ২২।৪৫১।১৬) ;
 ভাষাব বেড়া (সা. স্ব. ২৭।২৫২।২৩) ;
 স্বাভাৱ্যের বেড়া (মা. ধ. ২০।৪২৩।৪) ;

বেড়াজাল—

খ্যাতির বেড়াজাল (অবতরণিকা ১৫/১৭) ;
 ঘরের বেড়াজাল (প্র. ২৪।৪৮৫।৪) ;
 ছুঃখের বেড়াজাল (রো. ২৫।২৯।১৩) ;
 পরীক্ষার বেড়াজাল (প্র. ১৮।৫৮৯।২৭) ;
 সর্বনাশের বেড়াজাল (চি. ২৫।১৩১।১৭) ;

বেটন—

ঐক্যবেটন (বা. ২৬।৩৮৯।২৩) ;
 চিরাজ্যাসের বেটন (সা.প. ২৩।৫২৪।২৯-৩০) ;

নিয়মসংঘের বেটন (প্রা. ৫।৫।৬।৩) ;

বনবেটন (মা. ১২।৪৯।১২) ;

সমাজবেটন (প্রা. ৫।৫।২।২৪-২৫) ;

রজ্জু—

দাসত্বরজ্জু (চি. ২।৫৩৪।২৩) ;

শিকল—

দাসত্বের শিকল (স. ১।৪৩।১৮) ;

শিকলি—

মায়ার শিকলি (মা. ৪।১৪৬।১২) ;

শৃঙ্খল—

অন্ধরেব শৃঙ্খল (বি. ৫।৪৩৯।৪) ;

অধীনতাশৃঙ্খল (ক. অ—১।৪০।৩০) ;

অর্থের শৃঙ্খলপাশ (জ. ২৫।৯।১১) ;

কর্মের শৃঙ্খল (ভা. ৪।৪৬৪।৮) ;

কর্মশৃঙ্খল (ভা. ৪।৪৬৩।২৫) ;

কলঙ্কশৃঙ্খল (ক. অ—১।৪১।১২) ;

জ্ঞানশৃঙ্খল (আ. অ—২।৬।৭) ;

তন্ত্রার শৃঙ্খল (প. ১৫।৩০।১২০) ;

প্রেমের শৃঙ্খল (রা. রা. ১।৩০০।৫) ;

ফুলের শৃঙ্খল (ক. কো. ২।৯৯।১৯) ;

সমাজশৃঙ্খল (যু. প. ১।৫৫৩।১০-১১) ;

সম্মানশৃঙ্খল (প. ১৫।২১২।১) ;

স্বত্বশৃঙ্খল (প. ২৫।২১৮।১৪) ;

পুত্র—

অধিকারের পুত্র (ধ. ১।৩৩৭।২২) ;

অধ্যয়নপুত্র (গ. ২২।১৮০।৪) ;

অভিজ্ঞতাপুত্র (সা. ৮।৪৬৯।১৪) ;

অভ্যাসপুত্র (আ. অ—২।১২।৭) ;

আকর্ষণপুত্র (স. অ—২।১০৮।১৭) ;

আত্মীয়তার পুত্র (শা. ১৫।৪৮৮।১৫) ;

আনন্দপুত্র (ছিন্নপত্র ২৮৩।২১) ;

আনন্দ-উৎসবের পুত্র (আ. ৩।৫৩৩।২৭) ;

আমোদ-আহ্লাদের পুত্র (নৌ. ৫।২৬৮।৩) ;

আশ্রয়পুত্র (নৌ. ৫।৩৫৭।১৪) ;

ইন্দ্রিয়পুত্র (স. ১২।২৪৪।১০) ;

উপমাপুত্র (চৈ. ৫।৩৬।১২) ;

উপযোগিতাপুত্র (স. ১২।৪৪৭।১৫) ;

এক-চেতনাপুত্র (বি. ২৭।৩৪৫।১৪) ;

ঐক্যপুত্র (আ. ৩।৫২৫।২৩) ;

কর্মের পুত্র (প. ১০।৬৩২।২৩) ;

কল্পনার পুত্র (প্র. ২৩।৮০।১৫) ;

কল্পনাপুত্র (প. ২।৫৭৩।৬) ;

কার্যকারণের পুত্র (শা. ১৫।৪৮৮।১৪) ;

কাহিনীর পুত্র (ন. ২৪।১৬।৬) ;

গল্পের পুত্র (গ. ২২।২২৫।১৭) ;

গানের পুত্র (বা. প্র. ১।সুচনা।১) ;

গৌরববোধের পুত্র (সা. প. ২৩।৪৭২।২৪) ;

ঘটনার পুত্র (বা. ১০।৪১২।১২) ;

ঘটনাপুত্র (প্রা. ৫।৫১১।২২) ;

ঘনিষ্ঠপুত্র (লো. ৬।৬৪১।১৬) ;

চলার পুত্র (শে. ক. ১০।২৮৭।১১) ;

চিন্তার পুত্র (ছ. ১১।৪৪০।৩০) ;

চিন্তাপুত্র (প. ২।৬৩৮।১৬) ;

চিহ্নের পুত্র (সা. ২৪।২২৭।৬) ;

চেতনাব পুত্র (প্র. ১।সুচনা ২।৯) ;

ছন্দপুত্র (রা. ২৫।২৯।১২) ;

জিজ্ঞাসাপুত্র (প্র. ৮।৫৩৮।৮) ;

জীবনের পুত্র (শে. ১৮।৯৬।২৩) ;

জীবনপুত্র (চৈ. ৫।২৩।১০) ;

জ্যোতিঃপুত্র (বি. ৫।৪৪৪।১১) ;

তর্কপুত্র (গ. ২১।২৫৬।১) ;

দৈতপুত্র (প. ১৮।৪৪৬।১১) ;

ধীশূত্র (ধ. ১৩।৩৫৮।২৭) ;
 ন-পার্সেণ্টের শূত্র (ঘো. ৯।১৮৮।১৪) ;
 নাট্যশূত্র (বা. প্র. ১।শূচনা।২) ;
 নিয়মশূত্র (গো. ৬।৫৪৯।১৪) ;
 নিরবচ্ছিন্নতাপূত্র (স. ১৮।৩৩৭।২০) ;
 পরিচেষেব শূত্র (তি. ২৫।২৪৫।২০) ;
 পরিধিশূত্র (প. ১৮।৪৪০।২৮-২৯) ;
 পালনশূত্র (ধ. ১৩।৪১২।১৪) ;
 পুণ্যশূত্র (প. ১৫।২০০।২৮) ;
 প্রভেদশূত্র (শ. ১২।৫৪৬।২৪) ;
 প্রয়োজনশূত্র (সা. ১৯।২৯৯।১১) ;
 প্রলোভনশূত্র (গ্র. ১২।৬১৪।১৭) ;
 প্রাপশূত্র (ম. ১৫।৮৯।৫) ;
 প্রীতিশূত্র (মা. ৮।৪৬৯।১৪) ;
 প্রেমের শূত্র (আ. অ-২।২৭।১১) ;
 বন্ধুত্বশূত্র (গো. ৬।১২৯।২৬) ;
 বর্ণাশ্রমশূত্র (প. ২৬।৫৫৫।২৪) ;
 বিধানশূত্র (ক. ৭।৮৫।১৮) ;
 বিদ্যুতিশূত্র (স. ১৮।৩৩৭।১১) ;
 বিরহের শূত্র (ম. ১৫।৯৭।১৮) ;
 বিশ্বস্তশূত্র (ব্য. ৭।৩৫৫।৩০) ;
 বৈচিত্র্যের শূত্র (শা. ১৬।৪৬৫।৭) ;
 ব্যবস্থার শূত্র (প. ২৬।৫৪৪।২) ;
 ব্যবসাব শূত্র (চ. ৮।২৩৫।৪) ;
 ভাগ্যশূত্র (শ. ১২।৩৭২।৩০) ;
 ভাবশূত্র (শি. ১২।৩১০।৬) ;
 ভালোবাসার শূত্র (বাঁ. ২৪।১৯৬।১৪) ;

ভাষার শূত্র (বা. ২৬।৩৬৯।১৪) ,
 মঙ্গলশূত্র (ধ. ১৩।৩৬৭।২) ;
 মহত্ত্বশূত্র (স. ১২।৪৯৪।১) ;
 মৃত্যুর শূত্র (শা. ১৬।৪৫৫।১৫-১৬) ;
 যোগের শূত্র (শা. ১৫।৪৮৮।১৩) ;
 রক্তশূত্র (গ. ২১।১৯৫।২৮) ;
 রক্ষণশূত্র (ধ. ১৩।৪১২।১৪) ;
 রহস্তশূত্র (জ. ২৫।৭৩২।৬) ;
 শিল্পশূত্র (সা. ২৪।১৩৪।৩) ;
 সংকল্পের শূত্র (সো. ত. ত।শূচনা ২।২০) ;
 সংখ্যাশূত্র (শা. ১৩।৫৩।২) ;
 সঙ্গশূত্র (প. ১৫।২৫৪।১৮) ;
 সত্যের শূত্র (শা. ১৩।৪৯০।১১) ;
 সত্যশূত্র (আ. ২৭।২৪২।২৯) ;
 সম্মতিশূত্র (বা. ২৬।৩৯০।২৩) ;
 সম্ভাষ্যশূত্র (প. ২৬।৫৩৭।১৯) ;
 সময়শূত্র (ন. ২৪।৪১।১৮) ;
 সম্পর্কশূত্র (সা. ৮।৪৭৪।২০) ;
 সম্বন্ধশূত্র (প্র. ১।শূচনা ২।২-১০) ;
 সহস্রবর্ণের শূত্র (গো. ৬।২৪৬।২২) ;
 সেবাপূত্র (আ. ৩।৫৭৬।৫) ;
 সৌন্দর্য্যশূত্র (লো. ৬।৬৪৫।৭) ;
 সৌভাগ্যশূত্র (কা. ৫।১০৫।৯) ;
 স্নেহশূত্র (নো. ৫।২৬৮।৩) ;
 স্বাধীনতাপূত্র (রা. ১০।৪৩০।১০) ;
 হিতাহুষ্ঠানশূত্র (প. ১০।৫৮১।১৬)

কবি কায় কোবাদ

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

১

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে যে-সকল অপ্রধান কবি বাংলা কাব্যসংসারে আপন সাধনার অর্ঘ্য উপস্থিত করেছিলেন, কায় কোবাদ তাঁদের অন্ততম। ঢাকা জেলায় তাঁর জন্ম (১৮৫৮ খৃঃ), ও মৃত্যু (১৯৫২ খৃঃ)। তাঁর পূর্ণ নাম, মোহাম্মদ কাজেম আল্ কোরেশী। কায় কোবাদ নামেই তিনি পরিচিত।

কায় কোবাদেব কাব্যসাধনা ছেষটি বৎসর প্রসারিত। বঙ্গসাহিত্যে কবিরূপে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের পূর্বেই তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়, তাঁর শেষ কাব্যগ্রন্থ রবীন্দ্রনাথের ‘বীথিকা’র সমসাময়িক। গীতিকাব্য, মহাকাব্য ও কাহিনীকাব্য তিন-ক্ষেত্রেই কায় কোবাদ লেখনী চালনা করেছেন। এই দীর্ঘ সময়ে বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রে বারবার পালা-বদল হয়েছে। কিন্তু কায় কোবাদ তাঁর উনিশ-শতকী কাব্যভাবনায় অবিচলিত থেকেছেন।

কায় কোবাদের কাব্যগ্রন্থের তালিকা এখানে উদ্ধৃত হল :

- ১। বিরহবিলাপ (১৮৭০) গীতিকাব্য
- ২। কুসুমকানন (১৮৭৩) ”
- ৩। অশ্রুমালা (১৮৯৪) ”
- ৪। মহাশ্মশান কাব্য (১৯০৪) মহাকাব্য
- ৫। শিবমন্দির-বা জীবন্ত সমাধি কাব্য (১৯১৭) কাহিনীকাব্য
- ৬। অমিয়ধারা (১৯২৩) গীতিকাব্য
- ৭। শশ্মানভঙ্গ্য (১৯১৪) কাহিনীকাব্য
- ৮। মহরম-শরিফ বা আত্মবিসর্জন কাব্য (১৯৩৩) কাহিনীকাব্য

এছাড়া কবির নিম্নলিখিত কাব্যগ্রন্থনিচয় অমুদ্রিত রয়েছে*—

- (ক) প্রেমের ফুল (৪৮টি গীতিকবিতা)
- (খ) প্রেমের নারী ও নীহারবালা (কাহিনীকাব্য ৪ খণ্ডে সম্পূর্ণ)
- (গ) জোবেদা মহল কাব্য (কাহিনীকাব্য ৪ খণ্ডে সম্পূর্ণ)

* কবির সকল গ্রন্থের প্রকাশিকা তাহের উম্মিলা খাতুন, পূর্বপাড়া কবিকুটির, আগলা পোঃ আঃ, ঢাকা, প্রদত্ত তালিকা।

(ঘ) মন্ডাকিনীধারা (গীতিকাব্য)

(ঙ) অহুতপ্ত মুসলমান বা হজরত এমায় হোসেন হত্যার প্রতিশোধ কাব্য
(কাহিনীকাব্য)

(চ) প্রেমপারিজাত কাব্য (গীতিকাব্য)

(ছ) পুষ্প ও পরাগ (গীতিকাব্য)

(জ) উপদেশ-রত্নাবলী

(ঝ) সঙ্গীতকুসুমাজলি

‘মহাশ্মশান’ কাব্যের তৃতীয় সংস্করণ (১৯৩২) এবং ‘অশ্রুমালা’ কাব্যের চতুর্থ সংস্করণ (১৯২৭) হয়েছিল। কাব্য দুটির জনপ্রিয়তা এ থেকে উপলব্ধি করা যায়। ‘অশ্রুমালা’ কবির শ্রেষ্ঠ গীতিকাব্য, ‘মহাশ্মশান’ শ্রেষ্ঠ ও একমাত্র মহাকাব্য এবং ‘মহরম শবিক বা ‘আল্মবিসর্জন কাব্য’ শ্রেষ্ঠ কাহিনীকাব্য। এই তিনটিব আলোচনায় কবির কাব্যসাধনার স্বরূপ বোঝা যাবে।

২

কাব্যসম্পর্কে কায় কোবাদের ধারণা কাব্যপাঠেই জানা যায়। সৌভাগ্যের বিষয় “কাব্য—কবি ও সমালোচক” নামে এক প্রবন্ধে এ বিষয়ে তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। ১৯০২ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ‘বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মিলনী’র কলিকাতা অধিবেশনে কায় কোবাদ সভাপতির আসন গ্রহণ করে যে ভাষণ দিয়েছিলেন, তাতেও তাঁর অস্বল্প অভিমত প্রকাশিত হয়েছিল।

কায় কোবাদের কাব্যপাঠের পূর্বে তাঁর কাব্য-অভিমত বিচার করা বাক। “কাব্য—কবি ও সমালোচক” নানাদিক থেকে কৌতুহলজনক। ঈশ্বর গুপ্ত, মধুসূদন থেকে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র পর্যন্ত বাংলা কাব্য ও উপন্যাস সম্পর্কে এখানে কবি নিজস্ব অভিমত অকুণ্ঠভাবে ব্যক্ত করেছেন। এই প্রবন্ধটি বর্তমান শতকের তৃতীয় দশকে রচিত। এই প্রবন্ধের কয়েকটি মন্তব্য এখানে উদ্ধার করি। এ থেকে কবি-মানসকে বোঝা সহজ হবে :

“কতকগুলি মধুর ও কোমল শব্দ যোজনা করিয়া ও বিবিধ ছন্দে গ্রথিত করিয়া একটি শ্লোক দাঁড় করাইলে—কি অক্ষর গণনা কবিতা চরণ মিলাইয়া দিলে—কি নৃত্যপাগলছন্দে উহাকে নাচাইয়া তুলিলে কবিতা হয় না।

কবির কাব্য ধর্মগ্রন্থ নহে—বসন্তক বাক্যই কাব্য, কিন্তু সকলে তাহা বুঝে না। কবিতা বুদ্ধিবাব ও লিখিবাব হৃদয় স্বতন্ত্র, যে হৃদয়ে নাকি কবিতা বুদ্ধিবাব ও লিখিবাব শক্তি আছে, সেই হৃদয়েই কবিতা বুদ্ধিতে ও লিখিতে পারে—অতের পক্ষে দ্বরাশ।

কবিত্ব যে কেবল ছন্দোময় ললিত পদাবলীতেই নিবদ্ধ তাহা নহে ; কবিত্ব গন্ত পণ্ড উভয়েই থাকিতে পারে ; কবিত্ব কি নাচনী ছন্দে ?—কবিত্ব ভাবে। ভাবই কবিত্বের

প্রাণ, তাই গত পত্ত উভয়ই কবিতা ; চন্দ্রশেখরের ‘উদ্ভাস্ত প্রেম’ই তাহাব জাজল্যমান প্রমাণ। কবিতার পরীক্ষাশূল অন্তরে,—কর্ণে নহে। আজকাল শব্দসম্পদে অনেকেই কবি—ভাবে নহে।

কবি হওয়ার ক্ষমতা মানবের আয়ত্ত নহে, উহা জগদীশ্বর দত্ত।”

কবিতার চরিত্র সম্পর্কে কবির এই ধারণা। এ থেকে কবি-মানসিকতা ধরা পড়ে।

আধুনিক কবিতা-লেখকদের উপর কবি কায় কোবাদ বড়ই চটা। এ বিষয়ে তাঁর মত তিনি অকুণ্ঠ ভাষায় ব্যক্ত করেছেন : “আজকাল গৃহে গৃহে কবি ; বালক মহলেও কবিতা লিখার ছড়াছড়ি। সকলেই অভিধান খুঁজিয়া মোটা মোটা শব্দ বাছিয়া লইয়া নিজের ইচ্ছামত নৃত্যপাগল ও নৃত্যদোহল ছন্দে গ্রথিত করিয়া নূতন একটা করিতে চাহেন।...তাহারা ব্যাকরণ মানেন না—হ্রস্ব মানেন না—যতি মানেন না ; তাহারা কেবল নৃত্যপাগল ছন্দ লইয়াই পাগল। ভাবকে দুর্ভেদ্য দুর্গের ভিতর আবদ্ধ রাখিয়া কবিতাটিকে খুব জটিল করিতে পারিলেই তাহারা মনে করেন কবিতা লিখা সার্থক হইল।...প্রাঞ্জলতা ও মধুরতা যে কবিতাব একটি প্রসাদ গুণ, তাহা তাহারা আদৌ মনে করেন না।...এইসব হৈয়ালি-লেখক কবিতা লিখেন শুধু নামের জন্ত।”

কবি-সমালোচক কায় কোবাদের মতে কবিতার আধুনিক বৈশিষ্ট্যগুলি সর্বথা বর্জনীয়। তিনি ষাঁদের কবিতা প্রশংসায়োগ্য মনে করেন, তাঁদের কথা প্রবন্ধে বলেছেন। তালিকাটি লক্ষণীয় : জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, আলাওল, দৌলত কাজীব কাব্যসাধনার প্রশংসা কবি করেছেন। ভারতচন্দ্র রায়কে তিনি অঙ্গীলতা-দোষে অভিযুক্ত করেছেন। আধুনিক যুগের যে-সব কবি তাঁর হাতে পাশ-মার্কী পেয়েছেন, তাঁরা হলেন,—রত্নলাল, গোবিন্দচন্দ্র রায়, শিবনাথ শাস্ত্রী, বিশ্বেশ্বর চক্রবর্তী, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, জীবেন্দ্রকুমার দত্ত, রজনীকান্ত সেন, দীনেশচরণ বসু, হরিশচন্দ্র নিয়োগী, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, রাজকৃষ্ণ রায়, গোবিন্দচন্দ্র দাস, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, মানকুমারী বসু, কামিনী রায়। নবীনচন্দ্র দাস, ও দেবেন্দ্রনাথ সেনের কবিতা তাঁর কাছে মামুলি ধরনের বলে মনে হয়েছে। অক্ষয়কুমার বড়াল, স্বর্ণকুমারী দেবী, যোগীন্দ্রনাথ বসু, নবীনচন্দ্র সেন ও হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা তাঁর কাছে ভাল বলে মনে হয়েছে।

বিহারীলাল ও রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক গীতিকাব্যের ধারা কায় কোবাদ ঠিকমত উপলব্ধি করতে পারেন নি। তাঁর কবিতা পড়লেই তা বোঝা যায়। প্রবন্ধেও সে-ব্যর্থতার পবিচয় রয়েছে। বিহারীলাল চক্রবর্তী সম্পর্কে তিনি যে অভি-সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করেছেন, তা উদ্ধারযোগ্য : “রবীন্দ্র-গুরু বিহারীলালের লেখাও খুব মিষ্টি, তিনি কয়েকখানা কাব্যই লিখিয়াছেন, তন্মধ্যে দুই একখানা খুবই উৎকৃষ্ট।” মধুসূদন দত্ত ও নবীনচন্দ্র সেনের কাব্যে তিনি প্রচুর ত্রুটি আবিষ্কার কবেছেন। রবীন্দ্রনাথের কাব্য-উপভাস সম্পর্কে কায়কো বাদের ধারণা ; কীতুহলোদীপক : “বর্তমান যুগে রবীন্দ্রনাথ

খুবই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। যে ‘গীতাঞ্জলি’ লিখিয়া তিনি নোবেল প্রাইজ লাভ করিয়াছেন, তাহাতে তেমন কিছু আমি খুঁজিয়া পাইলাম না। কিন্তু ইহার ইংরাজী অনুবাদখানি বাঙ্গালা ‘গীতাঞ্জলি’ হইতে অনেক শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে। তাহার জন্মই তিনি দেশ বিদেশে এত খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। ব্যাকবর্ণগত দোষ রবীন্দ্রনাথের মধ্যে কিছু কিছু আছে; শেগুলি কেহ দেখিয়াও দেখেন না। তাহার প্রথম কারণ, রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি অঙ্ক স্তাবক জুটিয়াছেন; তাঁহার মন্দকেও ভাল বলিয়া প্রশংসা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মধ্যে আছেন মাসিকপত্রের সম্পাদক কয়েকজন। দ্বিতীয় কারণ, আজকাল ব্যাকবর্ণের দিকে কেহই লক্ষ্য করেন না। এই রবীন্দ্র-পন্থীর দলই হৈয়ালিব সৃষ্টি করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ উপাধাস লিখিতে বাইয়া অঙ্গীলতার নম্র চিত্র আঁকিয়াছেন। তাঁহার ‘ঘরে বাইরে’ ও ‘নৌকাডুবি’ পাঠ করিলে সুধী পাঠকবর্গ আমার কথার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। এগুলি ইংবাজী-শিক্ষিত নব্য যুবকদের বড়ই মুখরোচক। কেন না ইহারই নাম মনস্তত্ত্ব। পরের জীকে লইয়া নিজের জীর মত ছয় মাস ঘরকন্না করিয়া প্রেম আদায় করিয়া লইতে পারিলে নব্য যুবকদের মধ্যে অনেকেই আপনাকে নৌভাগ্যশালী বলিয়া মনে কবেন। কিন্তু চরিত্রবান ও ইশ্লাম ধর্মভীরু পাঠকের কাছে এ কার্যগুলি হারাম ও অবৈধ। জানি না এক্ষেত্রে হিন্দু নৈয়ায়িক পণ্ডিতগণ কি ব্যবস্থা দেন।

রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি কবিতা মিষ্টি ও উচ্চভাবপূর্ণ। কিন্তু সবগুলিই যে ভাল একথা আমি স্বীকার করিতে পারি না। আমি মনে করি রবীন্দ্রনাথের অঙ্ক স্তাবক ব্যতীত কোন সুধী পাঠকই ইহা স্বীকার করিবেন না। তিনি মহাকাব্য একখানাও লিখেন নাই।”

এই সব উদ্ধৃতি স্বপ্রকাশ, ব্যাখ্যা বাহুল্যমাত্র। এই কথা বলা যায়, কবি কায় কোবাদ বিংশ শতকের মধ্যকাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন বটে, কিন্তু সাহিত্যভাবনা ও কবি-মানসিকতার বিচারে তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর মানুষ।

প্রবন্ধশেষে কায় কোবাদ উপযুক্ত সমালোচকের শোচনীয় অভাবে ক্ষোভ ও বেদনা প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে, “কাব্যের সমালোচনা করিতে হইলে—কাব্যের চরিত্র-গুলি বিশ্লেষণ করিয়া উহার দোষগুণ বুঝাইবার শক্তি ও কাব্যরসে অভিজ্ঞতা থাকা দরকার। কবিত্বহীন ব্যক্তি সহস্র বিভ্রান্ত প্রারম্ভী হইলেও কাব্যের গুণাগুণ বুঝিতে ও বুঝাইতে অক্ষম।...কাব্যরসে অভিজ্ঞতা না থাকিলেও আজকাল অনেকেই সমালোচক সাজিয়া কবিকে দু-চারি কথা শুনাইয়া দিয়া পাণ্ডিত্য ফলাইতে চাহেন।...কবিকে চিনিতে হইলে তাঁহার কাব্যের ভিতর দিয়াই চিনিতে হইবে। কবিকে চিনিতে না পারিলে তাঁহার কাব্যের সমালোচনা করিতে যাওয়াও বিড়ম্বনামাত্র। আমি দেখিতেছি ইহার কবিতার কিছুই বুঝেন না, তাঁহারাও মাসিকগুলির সমালোচনার

জন্মে যা ইচ্ছা তাই লিখিয়া সমালোচনার বহর ছুটাইয়া—নীতিশাস্ত্রের বোল আওড়াইয়া সমালোচকের উচ্চ আসনে উপবিষ্ট হইবার দাবী করিয়া থাকেন।”

‘অশ্রুমালা’ কাব্যভূক্ত ‘কবি ও সমালোচক’ কবিতায় কায় কোবাদ সমালোচককে তীব্র ব্যঙ্গ করেছেন,—

ক্রিটিকের ঐ তীক্ষ্ণ ছোঁয়ার
ডরিসূঁরা রে মনু পাগেলা ।
কল্পনার ঐ নীল সাগরে
ভাসিয়ে দে তোর ভাবের ভেলা ।
উর্মি দ’লে পালের ভরে
বা’ চ’লে তুই আপন মনে ।
কল্পনার ঐ স্থান সৈকতে
সাহিত্যের ঐ কুঞ্জবনে ।

৩

কায় কোবাদের মহাকাব্য-প্রীতি আন্তরিক। “কাব্য—কবি ও সমালোচক” গ্রন্থে তিনি লিখেছেন, “কাব্য বহু প্রকার :—কাব্য, ষণ্ডকাব্য বা গীতিকাব্য, চন্দ্রকাব্য ও মহাকাব্য; তন্মধ্যে মহাকাব্যই প্রধান। একই বিষয়ের শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ বীরপুরুষ ও রাজ রাজর্ষিদের উৎকৃষ্ট বর্ণনা সংবলিত নানা রস ও অলঙ্কারে বিভূষিত অষ্টাধিক লগ্ন সংযুক্ত কাব্যই—মহাকাব্য Epic Poem; উহা মাধুর্য্য-গাঁজীর্ঘ্য ও উৎকৃষ্ট বর্ণনায় সর্বশ্রেষ্ঠ। ভাবার অনন্ত জগতে ইহা ফুলফুল-সুশোভিত ও নিরঞ্জন কলতানে মুখরিত হিমাচলের জায় অচল ও অটল। যতদিন ভাষা থাকিবে, ততদিন উহা মানবহৃদয়ের নিভৃত উদ্ভানে স্বর্গের মন্ডাকিনী-ধাবা প্রবাহিত করিয়া লকলকে বিমুগ্ধ করিয়া রাখিবে।” রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা প্রসঙ্গে কবি লিখেছেন, “তিনি মহাকাব্য একখানাও লিখেন নাই।” বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে উর্পনীত হয়েও কায় কোবাদ বিশ্বাস করতেন মহাকাব্যের চর্চা করা উচিত এবং আধুনিক যুগে মহাকাব্য বে-মানান নয়। তাঁর একমাত্র মহাকাব্য “মহাশ্মশান কাব্য” ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। কাব্যটি জনপ্রিয় হয়েছিল, তাঁর প্রমাণ এর তৃতীয় সংস্করণ (১৯৩২)। প্রায় ন’ হাজার পৃষ্ঠায় কাব্যটি সম্পূর্ণ। ইতিহাস-বিখ্যাত পাণিণ্ডের তৃতীয় যুদ্ধ অবলম্বনে এই কাব্য রচিত। এই মহাযুদ্ধে সমস্ত দিন ধরে আহমদশাহ আবদালী ও মুসলমান বীরপুরুষদের গগনভেদী ‘দীন-দীন’ শব্দ এবং তিন লক্ষ মরাঠা-বীরের ‘হরু হরু মহাদেও’ ধ্বনি, সেই সঙ্গে লক্ষ লক্ষ অস্ত্রের বন্দুনি, কামানের গভীর ঘর্ষর রব ও বন্দুকের ক্রম ক্রম ধ্বনি গগনপর্বনকে মুখরিত করে তুলেছিল। সেই বীররসাত্মক ঘটনার বর্ণনায় এই কাব্য পরিপূর্ণ। এই রক্তক্ষরা

বর্ণভূমে মুসলিম গৌরবের চিত্র কবি অংকণ করেছেন এবং “বঙ্গভাষায় একরূপ বৃহদাকারের ও উৎকৃষ্ট মহাকাব্য আর দ্বিতীয় নাই” বলে দাবি করেছেন।

কায় কোবাদের প্রধান কাহিনীকাব্য ‘মহরম্ শরিফ বা আশ্রবিসর্জন কাব্য’ (১৯৩৩)। কাব্যটি তিন খণ্ডে বিভক্ত। “হজরত এমাম হাশান ও হজরত এমাম হোসেন ও তদীয় বংশধরগণের শাহাদাতনামা” অর্থাৎ কারবালার হৃদয়বিদারক শোকাবহ ঘটনা অবলম্বনে এই কাব্য রচিত। কারবালার শোকাবহ ঘটনা অবলম্বনে উর্দু ভাষায় ‘আনাসেরাস শাহাদাতায়েন’, বাংলা ভাষায় ‘জঙ্গনামা’, ‘শহিদে কারবালার’ ‘মোক্তাল হোসেন’ প্রভৃতি পুঁথি বা প্রাচীন চণ্ডে রচিত গ্রন্থ পাওয়া যায়। মীর মোশাররফ হোসেনের ‘বিষাদসিন্ধু’, মহাম্মদ হামিদ আলীর ‘কাসেম-বধ’, ফজলুর রহিম চৌধুরীর ‘মহবম চিত্র’ প্রভৃতি গ্রন্থে কবি কায় কোবাদ বহু ক্রটি লক্ষ্য কবেছেন। সেই সব ক্রটি ও ধর্মবিচ্যুতিব প্রতিবাদে তিনি ‘মহরম্ শরিফ বা আশ্রবিসর্জন কাব্য’ রচনা করেন। মোজাম্মেল হক, কাজী নজরুল ইসলামের কবিতায় কারবালার ঘটনার ভুল ব্যাখ্যা দেখে কবি ব্যথিত হয়েছেন এবং দাবি করেছেন, “আমি কাব্য লিখিতে যাইয়া সম্পূর্ণরূপেই ইতিহাসের অমূল্যবণ করিয়াছি।” (ভূমিকা, পৃ ১৬)। বঙ্গাব্দ ১৩৩৯ সনে লিখিত ভূমিকায় কায় কোবাদ আরো লিখেছেন, “মাইকেল ও হেম-নবীনের সময় যে ধরণের লেখা প্রচলিত ছিল, সে ধরণের লেখা এখন নেই। যুগপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে লেখারও পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। ঐ প্রাচীন কবিদের সঙ্গে সঙ্গে কবিতার যুগও এখন চলিয়া গিয়াছে। এখন হৈয়ালির যুগ, অনেকেই এখন সেই হৈয়ালির মোহে পড়িয়াছেন। আজকাল পাঠকদেরও ক্রটি বিস্মৃত হইয়াছে, তাঁহারাও এই সব অর্থহান হৈয়ালিগুলিই ভালবাসিয়া থাকেন। এই হৈয়ালির স্মৃতিকর্তা ববীন্দ্রনাথ। সারা বঙ্গ জুড়িয়াই ইঁহার শিষ্য, এই রবীন্দ্রপন্থীর দলই এখন বাংলা ভাষার উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়াছেন। কাজেই স্বভাবকবির কবিতার এখন আদর নেই। আসল ছাড়িয়া এখন নকল লইয়াই টানাটানি। এই সব লেখক পাঠক ও সমালোচকের দলও একই দরের, তাঁহাদের মাপকাঠির ওজনে যিনি জীবনে একখানা মহাকাব্য লিখেন নাই, সারাজীবন ভরিয়াই যিনি খণ্ডকাব্য ও গীতিকাব্য (lyric poem) লিখিয়াছেন, সেই খণ্ডকাব্য ও গীতিকাব্য প্রণেতাই তাঁহাদের মতে কবিসম্রাট। ছায় রে, নাওয়ারিশ বঙ্গভাষা।” (ভূমিকা, ‘মহরম্ শরিফ’ কাব্য, ১৯৩৩)। এই আক্ষেপের মধ্যেই কায় কোবাদের কাব্যাদর্শ ও কাব্যব্যক্তব্য নিহিত। কায় কোবাদ মনে-প্রাণে গত শতকের রবীন্দ্রপূর্ব কাব্যলোকের অধিবাসী, তার স্পষ্ট পরিচয় এখানে পাই।

‘মহরম্-শরিফ বা আশ্রবিসর্জন কাব্য’ তিন খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে তেরোটি দ্বিতীয় খণ্ডে বারোটি, তৃতীয় খণ্ডে চারটি, মোট উনত্রিশ সর্গে কাহিনী প্রসারিত। দামেস্ক রাজপ্রাসাদে কাহিনীর সূচনা। কুফা নগরী, বসরা নগরী, মদিনা-মহুয়াবা, মোসল নগর ঘুরে শেষকালে ফেরাত নদীতীর ও কারবালার প্রান্তরে কাহিনীর সমাপ্তি। ৩৭০ পৃষ্ঠাব্যাপী এই কাহিনীতে মহরমের সত্য ঘটনাকে কাব্যরূপ দান করা হয়েছে।

এই কাব্য, কবিকে নিষ্ঠাবান ভক্ত মুসলমানরূপে পাঠকসমাজে পবিচিত্রিত কবেছে। কবির ভক্তি ও কাব্যচেতনাব রমণীয় পবিত্র সাধিত হয়েছে এই কাব্যে।

কবির বর্ণনাক্রমতাব পরিচায়ক একটি অংশ উদ্ধার করি। প্রথম খণ্ডের অন্তর্গত দশম সর্গের চিত্র, মদিনা-মহুয়ারা, হজরত এমাম হাসান ও হজরত এমাম হোসেনের গৃহ :

হাসানেব গৃহমাঝে পুণ্যের প্রতিমা
সরলা হাসানেবাহু পতি প্রতীক্ষায়
আছে বসে, প্রদীপের স্নিগ্ধ আভা পড়ে
শোভিছে মু'খানি তার ফুটন্ত কমল।
পরিধানে শুভবাস, কণ্ঠে পুষ্পমালা
অশেষ কল্পণাময়ী জননীকুপিণী,—
—স্বর্গ হতে অবতীর্ণা দেবীমূর্তি যেন।
হাসান প্রবেশি সেই গৃহ-অভ্যন্তরে
ধীরে ধীরে, নিকটস্থ একটি আসনে
বসিলা, হাসনেবাহু আনিলা তখনি
বেদানার সরবত করিয়া প্রস্তুত
অতি বস্ত্রে, পান করি মহান্না এমাম
লভিলা বিমল শাস্তি, জুড়াইল তার
ক্লান্ত দেহ, বাহু তারে করিলা জিজ্ঞাসা
“এত রাত্রি কেন আজি হইল তোমার ?
কত দুর্ভাবনা মোর হয়েছে হৃদয়ে
এতক্ষণ, বসে বসে কত যে ভেবেছি
এতটুকু শাস্তি আমি পারি নি লভিতে।
চারিদিকে শত্রু তব, কে কবে তোমায়ে
করি হত্যা গুপ্ত ভাবে, দিবে নিভাইয়া
মদিনার শেষ আশা, সেই সন্নে হায়
ইল্লাম জগৎ ডুবে যাইবে আধারে।

আর একটি বর্ণনা (প্রথম খণ্ড, ত্রয়োদশ সর্গ থেকে, দৃশ্যস্থল-পূর্ববৎ) :

রজনী দিয়ামা ; শুদ্ধ প্রকৃতি-সুন্দরী,
নাহি জাগে জীবজন্তু ; জন-কোলাহল
নাহি, এবে, মৃতপ্রায় নাগরিকগণ।

আঁধারে নিমগ্ন ধরা, মদিনা নগরী
 স্পন্দহীন, নাহি কোথা শব্দ একটুকু,
 না নড়ে গাছের পাতা, না বহে পবন ।

মদিনার রাজপথে কে অই রমণী
 চলিয়াছে দ্রুত বেগে আবরিয়া দেহ
 কৃষ্ণ বাসে, মাঝে মাঝে পত্রের পতনে
 ভীত চমকিত ছদি, এদিকে ওদিকে
 নিরখিয়া, স্তম্ভপূর্ণে যাইছে আবার ।
 কিছুদূর অগ্রসরি, প্রহরীয়ে দেখি
 খজুর বৃক্ষের কুঞ্জে লুকাইল যেয়ে
 ক্ষিপ্ত বেগে, ধীরে ধীরে প্রহরী তখন
 চলি গেল অল্প দিকে আপনার কাজে ;
 চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তখন
 অতি স্তম্ভপূর্ণে—ধীরে সশঙ্কিত হৃদে
 বাহিরিয়া সে নির্জন খজুর বৃক্ষের
 কুঞ্জ হতে, সে রমণী চলিল আবার
 নিজ কার্যে দ্রুত বেগে ; কিছুক্ষণ পবে
 আসিল সে হোসেনের বাড়ীর সম্মুখে ।

ঘটনার স্বচ্ছল বর্ণনা ও উপযুক্ত পরিবেশ রচনায় কবি কায় কোবাদের স্বভাব-নৈপুণ্য ছিল, একথা স্বীকার্য। কারবালার রক্তাক্ত মল্ল-প্রান্তরে নিহুব হত্যা কাণ্ডের বর্ণনায় কবি অসুক্ষ্ম ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন।

৪

কায় কোবাদ তাঁর জন্মের অধেকটা দান করেছিলেন মহাকাব্য-কাহিনীকাব্য রচনায়; বাকি অধেকটা তিনি গীতিকবিতার সাধনায় নিযুক্ত করেছিলেন। এবং এই শেষোক্ত ক্ষেত্রেই তাঁর সাফল্য তর্কাতীত। পূর্বদ্রুত উদ্ভৃতিতে কবি একটি তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য কবেছিলেন : “স্বভাবকবির কবিতার এখন আদর নেই। আসল ছাড়িয়া এখন নকল লইয়াই টানাটানি।” রবীন্দ্রনাথের সচেতন কাব্যপ্রসাধনের তিনি বিরোধী। ‘মানসী’ কাব্যের মহৎ শিক্ষাকে কায় কোবাদ গ্রহণ করেন নি। কবিতার ভাবচর্চনাই যথেষ্ট নয়, চাই প্রসাধন,—এই শিক্ষাকে তিনি অগ্রাহ্য করেছেন। “কাব্য—কবি ও সমালোচক” প্রবন্ধে তাঁর এই অভিমত লক্ষণীয় : “এক শ্রেণীর লেখক আছেন যাহারা শুধু

কোমল শ্রুতিমধুর শব্দগুলি বাছিয়া বাছিয়া একরূপ সুন্দরভাবে কবিতাতে গ্রথিত করিয়া থাকেন, বাহা আর্টের হিসাবে খুব সুন্দর ও উপাদেয় বলিয়াই বোধ হয়। কিন্তু প্রকৃত কবিতার হিসাবে উহার মূল্য কিছুই নহে। এইরূপ কবিতার লেখকই শব্দসম্পদের কবি। বিশেষ অমুখাবন করিয়া দেখিলে ইহা অবশ্যই উপলব্ধি হইবে যে সেই বাছা বাছা শব্দগুলি যেন কত সন্তুর্পণে—কত সাবধানতার সহিত গ্রথিত হইয়া এক একটি কবিতার সৃষ্টি হইয়াছে। প্রকৃত কবিভা এত সন্তুর্পণে এত সাবধানতার সহিত গ্রথিত হয় না। উহার গতি স্বাভাবিক (flow natural); স্বভাব-কবির হৃদয় হইতে উহা আপনা আপনিই বাহির হইয়া পড়ে। স্বভাব-কবির হৃদয় শুদ্ধি—কবিতা মুক্তা।.....

আধুনিক মাসিক পত্রিকার সম্পাদক ও সমালোচকগণ এই শ্রেণীর artificial কবিতারই পক্ষপাতী।...সেইসব দাম্ভিকহীন সম্পাদকগণ ভাল ভাল ও সুগভীর ভাবপূর্ণ প্রবন্ধের অভাবে এইরূপ রাবিশগুলি দিয়াই তাহাদের পত্রিকার কলেবর পূর্ণ করিয়া থাকেন। ‘বঙ্গদর্শন’, ‘বাস্কব’ ও ‘সাহিত্যে’র সময় এইরূপ রাবিশগুলি সেইসব পত্রিকায় স্থান পাইত না।...আমার এই কথাগুলি পাঠ কবিয়া হৈয়ালি-লেখক ও রবীন্দ্রনাথের অঙ্ক ভাবকের দল যে আমার উপরে বড়গুরু হইবেন ও অজস্র গালি বর্ষণ করিবেন, তাহা আমি বুঝি।” এই উদ্ভৃতি কবি কায় কোবাদের কাব্যভাবনাব প্রতিকলন।

এইবাব কায় কোবাদের সার্থক সাহিত্যকর্ম গীতিকবিতার পরিচয় গ্রহণ করা যেতে পাবে। কবির শ্রেষ্ঠ গীতিকাব্যগ্রন্থ ‘অশ্রুমালা’ (বঙ্গাব্দ ১৩০২, খ্রীষ্টাব্দ ১৮৯৪)। এই কাব্যটি জনপ্রিয় হয়েছিল, চতুর্থ সংস্করণ (বঙ্গাব্দ ১৩৩৪, খ্রীষ্টাব্দ ১৯২৭) তার পরিচায়ক। কাব্যগ্রন্থটি দুই ভাগে বিভক্ত : ‘বিবিধবিষয়ক কবিতা’ ও ‘প্রেমবিষয়ক কবিতা’। কবি নবীনচন্দ্র সেন, ‘বঙ্গবাসী’-সম্পাদক, ‘ঢাকা গেজেট’-সম্পাদক, ‘বাস্কব’-সহকারী সম্পাদক, নরেন্দ্রনাথ লাহা প্রমুখ সমালোচকদের প্রশংসাধন এই কাব্য কায় কোবাদের গীতিপ্রাণ কবিতাস্বত্বকে উদ্ঘাটিত করেছে।

স্বভাবতই ‘অশ্রুমালা’র প্রেমকবিতাগুলি পাঠকের মনোযোগ দাবি করে। ঊনবিংশ শতাব্দির শেষপাদে ইন্ডিয়াশ্রিত প্রেমকবিতাক্ষেত্রে বলদেব পালিত, গোপালকৃষ্ণ ঘোষ, স্বর্ণকুমারী দেবী, মোক্ষদামিনী মুখোপাধ্যায়, আনন্দচন্দ্র মিত্র, বরদাচরণ মিত্র, প্রিয়নাথ মিত্র, কুঞ্জলাল রায়, বিজেন্দ্রলাল রায়, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, হরিশচন্দ্র নিরোগী, গোবিন্দচন্দ্র দাস, দেবেন্দ্রনাথ সেনের সঙ্গে মূলী কায় কোবাদের নামও উল্লিখিত হওয়া উচিত।*

কায় কোবাদের প্রেমকবিতায় এমন একটি আন্তরিক আবেগ ও তীব্রতা আছে, যা

* বর্তমান লেখকের “ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকাব্য” গ্রন্থে এই প্রসঙ্গের বিস্তারিত আলোচনা আছে।

বিরলদর্শন। শব্দবাংকারে ও উপমানির্বাচনে তা রসসমৃদ্ধি লাভ করেছে। 'কে তুমি' কবিতায় এইসব গুণগুলি ধরা পড়ে :

কে তুমি ?— কে তুমি ?

ওগো প্রাণময়ি

কে তুমি রমণীমণি !

তুমি কি আমার হৃদি-পুষ্প হার

প্রেমেব অমিয় খনি

কে তুমি রমণীমণি ?

প্রণয়িনীকে নানা বিশেষণে ভূষিত করার মধ্যে কবি তাঁর অস্বীকৃত artificialityকে স্বীকার করে নিয়েছেন ; সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে যগুনচাতুর্য :

কে তুমি ?—

তুমি কি চম্পক-কলি

গোলাপ মতিয়া বেলী ?

তুমি কি মল্লিকা যুথী ফুল কুমুদিনী ?

সৌন্দর্যের অধাসিদ্ধ,

শরতের পূর্ণ ইন্দু

আঁধার জীঘন-মাঝে পূর্ণিমা রজনী ।

কে তুমি রমণীমণি ?—

কবি প্রেমকে অধিষ্ঠানভূমি থেকে তুলে অরামৃত্যুহীন অকলংক প্রণয়ের স্বপ্ন-জগতে উত্তীর্ণ করেছেন :

কে তুমি ? —

তুমি কি আমার সেই

হৃদয়মোহিনী ?

সেই যদি—কেন দূরে ? এস, সেই হৃদিপুরে

এস প্রিয়ে প্রাণময়ি

এস জুহাসিনি !

এস যাই সেই দেশে—ফুল ফুটে চাঁদ হাসে

দয়েলা কোয়েলা গায়

প্রাণের রাগিনী ।

জরা নাই—মৃত্যু নাই, প্রণয়ে কলঙ্ক নাই
 চল যাই সেই দেশে
 এস সোহাগিনি !
 কে তুমি রমনীমণি ?

ইন্দ্রিযাশ্রিত প্রেমের বিচিত্র ফুলের স্তবক রচনা করেছেন কায় কোবাদ। প্রেমসজ্জিত, প্রেমপ্রতিমা, বনফুল, ফুল ও কলি, বাসি ফুল, বেল ফুল, মানভঞ্জনের একটি চূষন, হৃদয়রাণী, কারে ভালবাসি, প্রণয়েব প্রথম চূষন, বিদায়ের শেষ চূষন, কেমনে ভুলিব, ভালবাসা, প্রিয়তমার প্রতি, প্রেমের স্বপ্ন, সোহাগিনী প্রিয়া—কবিতার এইসব নামেই বিষয়বস্তুর পরিচয় বর্তমান। যদৃচ্ছা-উদ্ভূত কয়েকটি স্তবকে তার পরিচয় পাই :

আ ছি ছি আ ছি ছি বেলি লাজ নাই তোর !
 কেন লো ঘোমটা খুলে, ভাগর নয়ন তুলে
 ভূলাস ভ্রমরে ছি ছি সে কি মনোচোর ?
 হেরিলে চামেলী তোরে, সরমে সে যাবে মবে,
 কি বলে বুঝাবি তারে সে বড় কঠোর !
 আ ছি ছি আ ছি ছি বেলি লাজ নাই তোর ! ['বেলফুল']

কেমনে ভুলিব আমি তারে ?
 তাব সে রূপের জ্যোতিঃ, হৃদয়ে পশিয়া গো,
 পাগল করিয়া দিল মোবে।
 না জানি কি ঘুম-ঘোরে, তারে দেখেছিহু গো,
 তাই তারে ভুলিতে না পারি !
 শয়নে স্বপনে ধ্যানে, তাবে মনে পড়ে গো,
 সে আমার—আমি যে তাহারি। ['মানস-প্রতিমা']

ভুলিলে কেমনে ?
 প্রাণের অধিক হায়, ভালবাসে যে তোমায় ?
 কও প্রিয়ে তুমি তারে ভুলিলে কেমনে ?
 সেই প্রীতি, সেই স্মৃতি, সেই স্নেহ স্মৃতি-স্মৃতি
 এখনো আমার হায় পড়ে সদা মনে।
 ভুলিলে কেমনে ? ['ভুলিলে কেমনে']

‘অশ্রুমালা’ কাব্যের অপরাধ, ‘বিবিধ বিষয়ক’ কবিতায় পূর্ণ। এই অংশে আত্মজিজ্ঞাসু দার্শনিক কবিমানসের সন্ধান পাই। আমি কে, ত্রিধারা (জন্ম, জীবন ও মৃত্যু), ভুল ভেঙ্গে দেও, ঐশচিন্তা, সংসার, মানবজন্ম, জীবনপ্রবাহ, নীরব রোদন, ভ্রান্তি—প্রভৃতি কবিতায় নামেই বিষয়-পরিচয় নিহিত। এক ভগন্তক নিষ্ঠাবান মুসলমানের পরিচয় এইসব কবিতায় পাই। দুয়েকটি উদাহরণেই তার পরিচয় পাওয়া যাবে :

আমি কে ?—আছে কি তবে অস্তিত্ব আমার ?

জীবন, আকৃতি, রব,

শৈত্য-ঔষ্য অহুতব

ঊধু কল্পনার খেলা ;—ছলনা আধার।

কে তুমি ? কে আমি বিভো ? দেও সত্যজ্ঞান।

আমি কি তোমারে ছাড়া ?

তুমি কি ব্রহ্মাণ্ড ভরা ?

কোথা তবে তুমি আমি ?—কত ব্যবধান ? [‘আমি কে’

এ জটিল জৈব-কাব্য বিচিত্র কেমন,

প্রতি অঙ্কে নবরস,

তাহে ভাগ্য পরবশ,

জন্ম-মৃত্যু কর্ম-ভোগ,—বিচ্ছেদ-মিলন ! [‘ত্রিধারা,

প্রভু, ভুল ভেঙ্গে দেও !

যে ভুলে তোমারে ভুলে, হীবা ফেলে কাঁচ ভুলে

ভিখারী সেজেছি আমি—

—আমার সে ভুল প্রভু,

তুমি ভেঙ্গে দেও ! [‘ভুল ভেঙ্গে দেও’

আজি,—পুণ্যপ্রেমের পুণ্যপরশে হাসিছে জগৎ অমিয়-হাসি।

আজি,—কুঞ্জকাননে, সৌরভ বিলায়ে ফুটেছে অমৃত কুসুমরাশি।

আজি—কাননে কাননে, গাইছে পাপিয়া গাইছে কোকিল মধুর স্বরে।

আজি,—আসিবে সে জন, এ সৌরজগৎ বাঁধা আছে যাব প্রেমের ডোরে।

[‘শব্দ-কদর’

ঈশ্বরচন্দ্র বিজ্ঞানাগরের মৃত্যুতে কায় কোবাদ লিখেছিলেন শোক কবিতা ‘ঈশ্বরচন্দ্র বিজ্ঞানাগর’ :

কোথা গেলে দীনবন্ধু এ জন্মেব মত
 ডুবাইয়া বঙ্গভূমি শোকেব সাগরে ।
 তোমাব বিচ্ছেদে চিন্ত বোর আকুলিত
 শোকের উচ্ছ্বাস আজি প্রতি ঘরে ঘরে ।

উনবিংশ শতকের কাব্য-ঐতিহ্যের নিষ্ঠাবান বাহক, বঙ্গভারতীর একনিষ্ঠ সেবক কবি কায় কোবাদের কাব্যসাধনার এই পরিচয় তাঁর কবিমানসের দৈবরত্নীক রূপটিকে স্পষ্ট করে তোলে। ‘অশ্রুমালা’র অন্তিম দুটি কবিতায় কবি দৈবর ও বঙ্গভাষার কাছে বিদায় প্রার্থনা করেছেন। যদি গভীর আন্তরিকতা উৎকৃষ্ট গীতিকবিতাব মানদণ্ড হয়, তবে একথা স্বীকার্য কবি কায় কোবাদ সার্থক গীতিকবি। দৈবর সমীপে কবির নিবেদন,—

নাথ, ভুলনা আমারে তুমি,
 অর্ধেব লালসা, প্রেমের শিপাসা,
 মিটল না প্রাণে নিতি নব আশা,
 কেবলি অভুপ্তি কেবলি ছরাশা

সকলি ত জান তুমি।

ভয়ে ভয়ে আজি তোমার ছয়াব,
 আসিয়াছি নাথ প্রাণ কাঁপে ভরে,
 আমি পাপী তাগী ক্ষমা কর মোরে
 হে প্রিয় প্রাণের স্বামী !

ভুল না আমারে তুমি।

[‘প্রার্থনা’]

আর, ‘বঙ্গভাষার প্রতি (বিদায়)’ কবিতায় কবি মাতৃরূপা বঙ্গভাষার কাছে বিদায় প্রার্থনা করে লিখেছেন :

দাও মা বিদায় মোরে এই ত আমার শেষ দেখা !

ভুবিয়া গিয়াছে ভাঙ্গ, ঐ দেখা যায় ক্ষীণ রেখা।

সাথী মোর ছিল বারা,

চলিয়া গিয়াছে তারা

আঁধার ঘনিয়ে এস, আমি যে রয়েছি পড়ে একা !

করেছি অনেক কষ্ট,

তাতেই মা আহি তুষ্ট

সুখ দুঃখ মিথ্যা কথা—সবি যে মা অদৃষ্টের লেখা।

সারাটি জীবন ভরে

সাজাইছ মা তোমারে,

তুলিয়া বিবিধ ফুল স্বর্গীয় সৌরভরাশি মাখা !

গোলাপ চামেলী বেলী, সব ত দিয়েছি তুলি,
 আর ত কিছুই নেই—লিলি যে বিলেতী ছাঁচে আঁকা।
 তোমার স্নেহের ধার, শোধিতে নারিহু আর
 জীবন যে যায় যায়, আর তাবে নাহি যায় রাখা-
 আমার পশ্চাতে এসে, দাঁড়াতে মা ভোর পাশে
 কেহ নাই—কেহ নাই, সব শূন্য সকলি মা ফাঁকা
 দাও মা বিদায় মোরে—এই ত আমার শেষ দেখা।

আশাকরি, ভাষালক্ষ্মী কবির প্রার্থনা অপূর্ণ রাবেন নি ॥

ব্রহ্মাণ্ডকল্পনা : ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ ও জৈন

নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

কসমোগ্রাফী বা বিশ্বগঠনতত্ত্ব সংক্রান্ত কোন বৈজ্ঞানিক গবেষণার স্রবোগ বা উপায় প্রাচীন যুগে একান্তই সীমাবদ্ধ ছিল। এই কারণে সেযুগের লেখকেরা তাঁদের রচনায় তাঁদের নিজস্ব কল্পনা অমুখ্যায়ী বিশ্বচরাচরের গঠন সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোকপাত করাব প্রয়াস পেতেন। কিন্তু তাঁদের জ্ঞানের পরিধি একান্তই সীমাবদ্ধ থাকার দরুন বেশীশ্রভাগ ক্ষেত্রেই তাঁরা কষ্টকল্পনার দ্বাৰা চালিত হতেন। একথা শুধু ভারতের ক্ষেত্রেই সত্য নয়, অপরাপর প্রাচীন দেশের ক্ষেত্রেও সত্য। হোমারের রচনাবলীতে এবং হেলিওডোর থিওগোনি গ্রন্থে কাল্পনিক বিশ্বদৃশ্যের প্রচুর পরিচর পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ ও জৈন ব্রহ্মাণ্ডকল্পনা অলীকত্ব ও অবাস্তবতাদোষে দুষ্ট হলেও শুধুমাত্র ধর্মীয় চরিত্রের জন্তই তা যেন একটি বিশ্বাসের সামগ্রী। পরবর্ত্তীকালের বিজ্ঞান-সম্মত তথ্যসমূহ এই চিরপ্রচলিত বিশ্বাসসমূহেব ভিত্তি টলিয়ে দিতে সামান্যই সমর্থ হয়েছে।

বেদিক ব্রহ্মাণ্ডকল্পনা

বিশ্বগঠনতত্ত্ব সম্পর্কিত কোন নির্দিষ্ট মতবাদ বৈদিক যুগে গড়ে ওঠেনি। ঋগ্বেদে ব্রহ্মাণ্ড বা বিশ্বচরাচর (ইউনিভার্স) নামক বিষয়টিকে বোঝানোর জন্য সচরাচর যে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে তা হচ্ছে জ্যোতিষ্মাণ্ডি, অর্থাৎ আকাশ ও পৃথিবী। ঋগ্বেদে এই জ্যোতিষ্মাণ্ডি ও ভূলোককে কল্পনা করা হয়েছে যেন দুটি চক্র, মধ্যবর্ত্তী একটি অক্ষের দুই প্রান্তে স্থাপিত।(১) পরবর্ত্তীকালে এই মধ্যবর্ত্তী স্থানটুকুকেও বিশ্বচরাচরের তৃতীয় অংশ বলে গণ্য করা হয়েছে। প্রতিটি অংশেরই তিনটি করে স্তর আছে এবং সেই হিসাবে প্রথমোক্ত ধারণা অমুখ্যায়ী বিশ্বচরাচর মোট ছয়টি স্তর (তিনটি পৃথিবী এবং তিনটি আকাশ) এবং শেষোক্ত ধারণা অমুখ্যায়ী নয়টি স্তর (তিনটি পৃথিবী, তিনটি আবহমণ্ডল এবং তিনটি আকাশ) নিয়ে গঠিত।(২) যজুর্বেদ(৩) ও অথর্ববেদে(৪) ব্রহ্মাণ্ডের একটি চতুর্থ অংশও কল্পিত হয়েছে, অর্ধগোলাকৃতি আকাশের ভিতরের দিকটি। পরিদৃশ্যমান মহাশূন্যের উপরে আকাশ অবস্থিত যা দেবতাদের বাসস্থান ও আলোকের উৎস।(৫) অর্ধগোলাকৃতি আকাশ ও পৃথিবী একসঙ্গে এইভাবে কল্পিত হয়েছে যেন দুটি পেয়ালাকে

১। ঋগ্বেদ, ১০।৮৯।৪।

২। ম্যাকডোনেল, বেদিক মাইথোলজি, পৃঃ ৯।

৩। রাজসেনেরী সংহিতা, ১৭।৬৭।

৪। অথর্ববেদ, ৪।১৪।৩।

৫। বেদিক মাইথোলজি, পৃঃ ১০।

পরম্পর মুখোমুখি করে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে।(৬) ঋগ্বেদে পৃথিবীকে মহী, পৃথিবী-পৃথ্বী, উর্ধ্বা, উত্তানা, অশারা ইত্যাদি নাম দেওয়া হয়েছে, প্রতিটি নামেরই কিছু না কিছু লক্ষণার্থ আছে।(৭) পৃথিবী থেকে আকাশের দূরত্ব, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ(৮) ও অথর্ববেদ(৯) অহুযায়ী একটি অশ্বের এক সহস্র দিবসের যাত্রাপথ। পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ গ্রন্থে বলা হয়েছে যে পৃথিবী থেকে স্বর্গের উচ্চতা হচ্ছে এক হাজার গাভীকে একটির উপর আর একটিকে দাঁড় করালে যতটা উচ্চতা পাওয়া যায় ততটা।(১০)

কিন্তু পবনস্বর্তীকালে উপরিউক্ত অংশগুলি, অর্থাৎ আকাশ, আবহমণ্ডল এবং পৃথিবী, একটি বৃহত্তর ও অধিকতর কাল্পনিক ব্রহ্মাণ্ড-পবিকল্পনার অঙ্গীভূত হয়েছে। ঋগ্বেদের পুরুষসূক্ত(১১) বা কিছুটা পবিবর্তিত আকারে অথর্ববেদ(১২) যজুর্বেদ(১৩) ও তৈত্তিরীয় আল্লগ্যকেও(১৪) বর্তমান, অহুযায়ী বিশ্বচরাচর যেন একটি নরদেহ বা পুরুষের অহরূপ। পুরুষসূক্তের এই পুরুষ যেন টিউটন উপকণ্ঠার ভূবাবদানব যিমের, যার মস্তকদেশ আকাশ, নাভিস্থল আবহমণ্ডল এবং পাদদেশ পৃথিবী।(১৫) ব্রাহ্মণ সমূহে বিশ্বচরাচরকে একটি বিশাল অণুস্বরূপ কল্পনা করা হয়েছে, ব্রহ্মাণ্ড কথাটির উদ্ভব সেখান থেকেই। শতপথ ব্রাহ্মণ গ্রন্থে(১৬) বলা হয়েছে যে প্রজাপতি ব্রহ্মা মহাজাগতিক অণুকে বিভক্ত করেছিলেন তিনভাগে বা ভূঃ, ভুবঃ এবং স্বঃ নামে পরিচিত এবং যথাক্রমে পৃথিবী, আবহমণ্ডল ও আকাশের পবিচায়ক।(১৭) ছান্দোগ্য উপনিষদে বিভক্ত অণুটির স্বর্ণময় অংশটিকে (অর্থাৎ ভিতরকার হবিদ্রাভ কুম্ম) আকাশ এবং রৌপ্যময় অংশটিকে (স্বেতবর্ণের পুরু আবরণটি) পৃথিবী বলা হয়েছে।(১৮)

বিশ্বচরাচরের কল্পনায় অণু কি ভাবে তাৎপর্যকর ভূমিকা গ্রহণ করেছে তা বুঝতে বিশেষ কোন অসুবিধা নেই। প্রাচীন মিশরীয়গণ বিশ্বাস করতেন যে দেবতারা

৬। ঋগ্বেদ, ৬।৫৫।২০।

৭। সরকার, কসমোগ্রাফি এণ্ড জিয়োগ্রাফি ইন আরলি ইণ্ডিয়ান লিটারেচার, পৃঃ ৯।

৮। ২।১৭।৮।

৯। ১০।৮।১৮।

১০। ১৬।৮।৬; ২১।১।৯।

১১। ১০।৯০।

১২। ১২।৬।

১৩। বাজমেনেরী, ৩১।

১৪। ৩।১২।

১৫। ম্যুর, ওরিজিনাল স্ট্যানস্ক্রিপ্ট টেক্সটস্ (৫ম), পৃঃ ৩৬৮।

১৬। ১১।১।৬।

১৭। ওরিজিনাল স্ট্যানস্ক্রিপ্ট টেক্সটস্ (৪র্থ), পৃঃ ২৫।

১৮। সেকরেড বুকস অফ দি ইস্ট, (১ম) পৃঃ ৫৪-৫৫।

প্রাক-ঐতিহাসিক মহাসমুদ্রে অগুরুপে ভাসমান ছিলেন; অমরুপ কাহিনী দেবতা (পু)টহ সম্পর্কেও প্রচলিত ছিল।(১৯) প্রাচীন গ্রীসের রূপসোত্তীর্ণ সৃষ্টিতত্ত্বে মহাজাগতিক অণুর কল্পনা বর্তমান এবং পণ্ডিতবব জেলারের মতে গ্রীকেরা এই ধারণা ফিনিসীয়দের নিকট থেকে গ্রহণ করেছিল।(২০) আসলে অণুগেব মধ্যেই জীবন স্তম্ভ থাকে, আদিম মানুষের এই জীবনদর্শন পৃথিবীর সর্বত্র একভাবে কাজ করেছে, ফলে জগতের সর্বত্র অমরুপ কাহিনী রচিত হওয়া সম্ভব হয়েছে। ঋগ্বেদে সর্বব্যাপী মহাসলিলের মধ্যে ভাসমান যে হিরণ্যগর্ভেব চিত্র আমরা পেয়েছি তা এই মহাজাগতিক অণুক কল্পনার প্রাক-পর্যায় ছাড়া আব কিছুই নয়।(২১) পরবর্তী সাহিত্যে, যেমন মহাভারতে,(২২) আমরা অগুরুপী বিশ্বচরাচরের পরিচয় পাই। মনুসংহিতায় বলা হয়েছে যে সৃষ্টিকর্তাব দেহনিঃসৃত বীজ থেকেই মহাজাগতিক অণুর সৃষ্টি হয়েছে।(২৩) অগুরুপী ব্রহ্মাণ্ডের কথা বিভিন্ন পুরাণেও বর্তমান।(২৪)

আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি যে ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ গ্রন্থগুলির যুগে বিশ্বচরাচরকে ত্রিধাবিভক্ত কল্পনা করা হয়েছে, আকাশ, অন্তরীক্ষ ও পৃথিবী, যা প্রজাপতি-ব্রহ্মার মুখোচ্চারিত তিনটি শব্দ ভূঃ ভুবঃ স্বঃ দ্বারা চিহ্নিত। কিন্তু একটি ভিন্নধর্মী পরিকল্পনা ঐত্তরেন্ন আরণ্যক(২৫) গ্রন্থে পাওয়া যায় যেখানে বিশ্বচরাচরকে চারটি অংশের কথা বলা হয়েছে—অন্তঃ, মরীচিঃ, মর এবং অপ। অন্ত হচ্ছে জলরাশি যা দ্ব্যলোক কর্তৃক ধৃত হয়ে আছে, মরীচি হচ্ছে আলোর জগত অর্থাৎ আকাশ, মর হচ্ছে এই পৃথিবী এবং অপ হচ্ছে পৃথিবীর নিম্নস্থ জলরাশি। কালক্রমে ত্রিধাবিভক্ত বিশ্বচরাচরের কল্পনার পরিবর্তে সাতটি অংশ নিয়ে গঠিত বিশ্বচরাচরের পরিকল্পনা গড়ে উঠেছিল। এই পরিবর্তনের ইঙ্গিত পাওয়া গেছে তৈত্তিরীয় আরণ্যক গ্রন্থে(২৬) যেখানে ব্রহ্মাণ্ডের সাতটি অংশের নিম্নলিখিত নামকরণ হয়েছে—ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ জনঃ, তপঃ ও সত্যম্। প্রথম তিনটির পরিচয় আমরা আগেই পেয়েছি, শেষের চারটি নবতর সংযোজন। বৃহাদারণ্যক উপনিষদে(২৭) বিশ্বচরাচরের গঠনকারী জগতসমূহের সংখ্যা আরও বর্ধিত হয়েছে—জল, বায়ু, গন্ধর্ব্ব, সুর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, দেবতাগণ, ইন্দ্র, প্রজাপতি, ব্রহ্ম প্রত্যেকেরই

১৯। আবমান, হাণ্ডবুক অফ ইজিপ্সিয়ান রিলিজিয়ন, পৃঃ ২৬ ইঃ।

২০। প্রি-সফ্রেটিক ফিলসফি, (১ম), পৃঃ ১০২ ইঃ।

২১। ১০।১২১।

২২। ১২।৩০৯। ইত্যাদি।

২৩। ১।৫-১৪।

২৪। যেমন বিষ্ণুপুরাণ, ১।২।৩৭।

২৫। ২।৪।১।

২৬। ১০।২৭-২৮।

২৭। ৩।৬।

এক একটি লোক বা জগত, এবং একটি তার পরবর্তী উচ্চতর জগত্বেব সঙ্গে ওতপ্রোত-ভাবে আবদ্ধ।

উত্তর-বৈদিক যুগের ব্রহ্মাণ্ডকল্পনা

ব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কিত পুরাতন ধাবণাসমূহের উপর মহাভারতে নতুন কিছু সংযোজিত হয়নি, পৃথিবীর বিশদ বর্ণনা এবং নরকসমূহ সম্পর্কে কিছু তথ্য ছাড়া। (২৮) মনুসংহিতায় ব্রাহ্মণ গ্রন্থসমূহ বর্ণিত মহাজাগতিক অণ্ডের পরিকল্পনাটিই বহাল রাখা হয়েছে (২৯) ভগবান ব্রহ্মা সেই অণ্ডে সংবৎসবকাল বাস করে নিজ ধ্যানবলে তা দুভাগে ভাগ করলেন। সেই (দুভাগে) বিভক্ত অণ্ডের উপরিখণ্ডে স্বর্গলোক এবং নিম্নস্থ খণ্ডে ভূলোক নির্মাণ করলেন, মধ্যভাগে আকাশ, অষ্টদিক এবং শাস্ত্র জলস্থান (সমুদ্রাদি) সৃজন করলেন। (৩০) ওই একই গ্রন্থে একুশটি নরকের নাম উল্লিখিত হয়েছে : তামিস্র, অন্ধতামিস্র, মহারৌরব, কালস্রজ, মহানরক, সঞ্জীবন, মহাবীচি, তপন, সশ্রুতাপন, সংঘাত, কাকোল, কুল্লল, পৃতিমুস্তিকা, লোহশঙ্খ, ঋজীষ, শাল্মলী, পছানো, বৈতরণী, অসিপত্রবন ও লৌহদারক। (৩১)

পুরাণকারগণ ব্রহ্মাণ্ডের একটি কাল্পনিক নক্সা অংকন করেছিলেন এবং সকল পুরাণের বর্ণনাই বহুলাংশে একপ্রকার। (৩২) বিষ্ণুপুরাণে বলা হয়েছে কিভাবে একটি কল্পের প্রারম্ভে নারায়ণ ববাহরূপে জলরাশি থেকে পৃথিবীকে উপরে উত্তোলিত করেছিলেন এবং কিভাবে পৃথিবী, আকাশ, স্বর্গ ও মহর্লোকের সৃষ্টি কবেছিলেন। (৩৩) সূর্য ও চন্দ্রের কিরণে যতদূর আলোকিত হয়, সমুদ্র, নদী ও পর্বতসময়ে ততদূর স্থান পৃথিবী বলে কথিত। পৃথিবীর বিস্তার ও পরিমণ্ডল যে পরিমাণ, ভুবর্লোকের বিস্তার ও পরিমণ্ডলও সেই পরিমাণ। পৃথিবীর লক্ষ যোজন উর্ধ্বে সূর্যমণ্ডল, তার লক্ষ যোজন উর্ধ্বে চন্দ্রমণ্ডল, তার লক্ষ যোজন উপরে নক্ষত্রমণ্ডল। নক্ষত্রমণ্ডলের দুই লক্ষ যোজন উপরে বুধ, বুধের দুই লক্ষ যোজন উপরে শুক্র, শুক্রের দুই লক্ষ যোজন উপরে মঙ্গল, মঙ্গলের দুই লক্ষ যোজন উপরে বৃহস্পতি, বৃহস্পতির দুই লক্ষ যোজন উপরে শনি, শনির এক লক্ষ যোজন উপরে সপ্তর্ষিমণ্ডল, সপ্তর্ষিমণ্ডলের এক লক্ষ যোজন উপরে সমগ্র জ্যোতিষ্চক্রের নাভিস্বরূপ ধ্রুব অবস্থিত। (৩৪) ধ্রুবলোক হতে দুই কোটি যোজন উর্ধ্বে জনলোক, জনলোক

২৮। ৬।৫-২ ; ১২।৩০৯ ইত্যাদি।

২৯। ১।১২-১৩।

৩০। দ্রঃ আর্যশাস্ত্র, ১ম সংখ্যা, পৃঃ ২।

৩১। মনু, ৪।৮৭-৯০।

৩২। বর্ণনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন পুরাণে যে সামান্য পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় তাব জন্ত

উইলসনকৃত বিষ্ণুপুরাণ, ২য় খণ্ড ২।৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

৩৩। ১।৪।

৩৪। ২।৭।৩-১০।

হতে আট কোটি যোজন উর্ধ্বে তপোলোক, বারো কোটি যোজন উর্ধ্বে সত্যলোক বা ব্রহ্মলোক বা বৈকুণ্ঠলোক অবস্থিত ।(৩৫) পৃথিবী ও অর্ধের মধ্যবর্তী সিদ্ধাদিগণ ও মুনিগণ সেবিত যে স্থান তা ভুবলোক বা দ্বিতীয় লোক । ঋব ও অর্ধের মধ্যবর্তী যে চতুর্দশ লক্ষ যোজন স্থান তা স্বলোক নামে পরিচিত । ভূঃ, ভুবঃ এবং স্বঃ এই তিনটি লোক 'কৃতকঃ' এবং জন, তপ ও সত্য এই তিনটি লোক 'অকৃতক' নামে অভিহিত । কৃতক ও অকৃতকের মধ্যে মহর্লোক যাকে 'কৃতাকৃতক'-ও বলা হয় ।(৩৬) সপ্তলোকের মত পাতাল ও সাতটি—অতল, বিতল, নিতল, পাতাল, গভস্তমঃ, মহাতল ও স্তম্ভল ।(৩৭) এই সাতটি পাতালই প্রত্যেকটি দশ সহস্র যোজন পবিত্রিত । এই সপ্ত পাতালেব শ্রেষ্ঠ প্রাসাদশোভিত ভূমিসকল যথাক্রমে গুহা, কুশা, অরুণা, পীতা, শর্করা, শৈলী ও কাঞ্চনী । এই সকল স্থানে দানব, দৈত্য, যক্ষ ও নাগজাতি বাস কবে ।(৩৮) সমগ্র বিশ্বচরাচর একটি অণুস্বরূপ বা যথাক্রমে জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ দ্বারা আবৃত ।(৩৯)

উপরি-উক্ত বিবরণ বর্ণনার কিছু কিছু পার্থক্যসহ প্রায় সকল পুরাণেই বর্তমান । এই প্রসঙ্গে একটি কথা স্মর্তব্য যে ব্রহ্মাণ্ডকল্পনায় গ্রহলোকসমূহের ধারণার পরিচয় পুরাণেই পাওয়া যায়, যা পূর্বযুগের বৈদিক ধারণায় সম্ভবতঃ অস্থগত । ঋগ্বেদের যুগের আর্যগণ গ্রহ চিন্তেন কিনা সে বিষয় কিছুটা সংশয় আছে যদিও 'সপ্ত আদিত্য' 'পঞ্চ অধ্বয়ুঃ' 'পঞ্চ উষ্ণাঃ' ইত্যাদিকে পণ্ডিতেরা গ্রহের নিরিখেই বিচার করার প্রয়াস পেয়েছেন ।(৪০) তৈত্তিরীয় সংহিতায়(৪১) বৃহস্পতিকে তিস্রাবিকারিক বলা হয়েছে এবং তৈত্তিরীয় আরণ্যকে(৪২) 'সপ্ত-সূর্য্যঃ' শব্দটি বিদ্যমান যার কোন গ্রহলৌকিক তাৎপর্য থাকলেও থাকতে পারে । অবশ্য নক্ষত্ররাজি তাঁদের নিকট স্থপবিচিত ছিল (৪৩) যদিও তাঁরা গ্রহ ও নক্ষত্রের পার্থক্য করতে পাবতেন কিনা এ বিষয়ে সন্দেহ আছে । এই কারণেই বোধ হয় বৈদিক ব্রহ্মাণ্ডকল্পনায় গ্রহলোকের স্থান নেই । পববর্তী রচনায় গ্রহলোকসমূহ ব্রহ্মাণ্ডকল্পনায় গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেছে । উদাহরণস্বরূপ বলা যায়

৩৫ । ২।৭।১২-১৫ ।

৩৬ । ২।৭।১৬-২০ ।

৩৭ । অতল, বিতল, পাতাল, নিতল, স্তম্ভল, মহাতল ও তলাতল এই সাতটি নাম উল্লিখিত হয়েছে ।

৩৮ । ২।৫।২-৪ ।

৩৯ । ২।৭।২২-২৪ ।

৪০ । বেদিক ইণ্ডেক্স, (১ম) পৃঃ ২৪৩ ।

৪১ । ৪।৪।১০।১ ।

৪২ । ১।৭ ।

৪৩ । ঋগ্বেদ, ৫।৫৯।১৩ ; ১০।৬৪।৮ ; ১০।৮৫ ; তৈত্তিরীয় সং, ২।৩।৫।১-৩ ; কাঠক সং, ১।১।৩ ; ইত্যাদি ।

সূর্য্যসিদ্ধান্তে(৪৪) স্পষ্টই ঘোষিত হয়েছে যে পৃথিবী, আকাশ ইত্যাদি নিয়ে গঠিত ব্রহ্মাণ্ড প্রথমে বায়ুমণ্ডল ও পরে নক্ষত্রমণ্ডল দ্বারা পরিবেষ্টিত, এবং তার নীচে একটি ব পর একটি করে আছে শনিলোক, বৃহস্পতিলোক, মঙ্গললোক, সূর্যলোক, শুক্রলোক, বুধলোক এবং চন্দ্রলোক। তার নীচে স্বাক্রমে সিদ্ধগণ ও বিদ্যাধরগণ সেবিত স্থান এবং তাবও নীচে মেঘমণ্ডল।(৪৫)

ব্যাসে নামে প্রচলিত যোগভাষ্য নামক সপ্তম শতকে রচিত একটি গ্রন্থে বর্ণিত ব্রহ্মাণ্ডকল্পনায় বলা হয়েছে সাতটি অঞ্চল বা ভূমি নিয়ে ব্রহ্মাণ্ড গঠিত। যেগুলির একটির উপর আর একটি অবস্থিত। সর্বনিম্ন ভূমির নাম ভূর্লোক যা সর্বনিম্ন নরক থেকে মেরু পর্বত পর্যন্ত বিস্তৃত। ভূর্লোকের সর্বনিম্নে সাতটি নরক আবিচী, ঘন, সলিল, অনল, অনিল, আকাশ ও তমঃপ্রতিষ্ঠ; এগুলির উপর সাতটি পাতাল-মহাতল, বসাতল, অতুল, স্তুতল, বিতল, তলাতল এবং পাতাল; এগুলির উপরে সপ্তদ্বীপা বস্তুমতী। তিনটি স্তরবিশিষ্ট এই ভূলোক অশ্বর গন্ধর্ব, কিন্নর, কিস্পুরুষ, বক্ষ, রাক্ষস, ভূত, প্রেত, অপস্মারক, অস্মরা, ব্রহ্মরাক্ষস, কুশ্মাণ্ড, বিনায়ক, দেব ও নরের বাসভূমি। দ্বিতীয় ভূমি বা জগত, পুরাণে থাকে, ভুবর্লোক বলা হয়েছে, অন্তরীক্ষলোক নামে খ্যাত এবং এখানে স্বর্গীয় জীবগণ বাস করে। তৃতীয় ভূমি যা পুরাণবর্ণিত স্বঃলোক এখানে মহেন্দ্রলোক নামে কথিত। চতুর্থ, মহঃ বা প্রাজাপত্যলোক কুমুদ, রিভু, প্রতর্দন, অঞ্জনাভ এবং প্রচিন্তাভ দেবগণের বাসস্থান। পঞ্চম, জনলোক ব্রহ্মপুত্রোহিত, ব্রহ্মকামিক, ব্রহ্ম মহাকামিক এবং অমরদের বাসস্থান। ষষ্ঠ, তপোলোক আভাস্বর, মহাভাস্বর এবং সত্যমহাভাস্বর দেবতাদের আবাসস্থান এবং সত্যলোক নামে কথিত সপ্তম জগতে বাস করেন অচ্যুত, শুদ্ধনিবাস। সত্যাত এবং সংজ্ঞাসংজ্ঞী উপাধিদ্বারা দেবগণ।(৪৬) উপরিউক্ত বর্ণনা থেকে মনে হয় যে আলোচ্য গ্রন্থের লেখক বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্যকল্পনার মিশ্রণ ঘটিয়েছেন। সাতটি লোক, বা অঞ্চল, বা ভূমির কল্পনা পুরাণাশ্রয়ী কিন্তু সেই সব স্থানে বসবাসকারী দেবতাদের নাম নিঃসন্দেহে বৌদ্ধগ্রন্থ থেকে গৃহীত হয়েছে, পরবর্তী অংশ পাঠ করলে স্পষ্টই বোঝা যাবে

বৌদ্ধ ব্রহ্মাণ্ডকল্পনা

বুদ্ধ নিজে ব্রহ্মাণ্ডকল্পনার ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহ দেখাননি, কেননা বিশ্বচরাচরের বহিঃসংক্রান্ত প্রশ্ন তাঁর কাছে নিবুদ্ভিতা ভিন্ন আর কিছুই নয়। মাহুয়ের অন্তর-

৪৪। ১২।২৯-৩৬।

৪৫। বার্জেসকৃত অম্বুদ, জার্নাল অফ দি আমেরিকান ওবিয়েন্টাল সোসাইটি (ষষ্ঠ) পৃঃ ২৪৫।

৪৬। ৩।২৬।

জীবনের সমস্তাই তাঁর কাছে ছিল প্রধান। (৪৭) কিন্তু মনে হয় যে এই বিষয়ের চলতি ব্রাহ্মণ্য মতবাদ সমূহ সম্পর্কে তিনি যথেষ্টই অবগত ছিলেন। একদা আনন্দ তাঁর নিকট ভূমিকম্পের কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেছিলেন, “এই পৃথিবী, হে আনন্দ, জলের উপর স্থাপিত, জল বায়ুর উপর স্থাপিত এবং বায়ু মহাশূন্যে বিবাজিত। এবং এই সময়ে, হে আনন্দ, যখন বায়ু প্রবলভাবে প্রবাহিত হতে থাকে, তখন জলরাশিতে যে চাঞ্চল্য জাগে তারই ফলে পৃথিবী কেনে ওঠে।” (৪৮) অন্ততঃ তিনি বলেছেন যে পৃথিবী জলের দ্বারা বেষ্টিত, জল বায়ুর দ্বারা বেষ্টিত, বায়ুর চতুর্দিকে ইথারজাতীর কোন আবরণ বিরাজমান, এবং সর্বশেষে মহাশূন্য বা আকাশ। (৪৯) অমূরূপ ধারণার পরিচয় বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে যেখানে বলা হয়েছে আকাশ বায়ুর উপর বিস্তৃমান, বায়ু পৃথিবীর উপর, পৃথিবী জলের উপর, জল সত্যের উপর, সত্য ব্রহ্মের উপর এবং ব্রহ্ম তপের উপর বিরাজিত। (৫০)

কিন্তু কালক্রমে বৌদ্ধরাও নিজস্ব বিশ্বতত্ত্ব গড়ে তোলেন। বৌদ্ধ বিশ্বতত্ত্বের উপর প্রামাণ্য আলোচনা আছে সর্বাঙ্গিবাদী সম্প্রদায়ের অভিধর্মের দ্বিতীয় গ্রন্থে যার নাম প্রান্তিপ্তিসান্নর একং যার প্রথমাংশটি লোকপ্রান্তিপ্তি নামে পরিচিত। (৫১) এই অংশটিকে ভিত্তি করে রচিত হয়েছে বজ্রবজ্রর অভিধর্মকোশ যেখানে আমরা ছটি লোক বা জগতের বর্ণনা পাই। প্রথমটি হচ্ছে স্তাজনলোক বা আধার-জগত (৫২) এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে সত্ত্বলোক বা জীবজগত। (৫৩) পঞ্চান্তরে পালি গ্রন্থসমূহে, ওই ছটি নামের পরিবর্তে, সংঘারলোক এবং ওকাশলোক (অবকাশলোক) এই দুটি নাম পাওয়া যায়। (৫৪) প্রথম নামটি বস্ত্রজগতের দ্ব্যর্থক, কিন্তু দ্বিতীয়টির তাৎপর্য সন্ধ্যাকভাবে অনুধাবন করা দুস্বাভাবিক।

বৌদ্ধ ধারণা অনুযায়ী সহস্র সহস্র ‘ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের’ অস্তিত্ব বিস্তৃমান, যেগুলিকে বলা হয় চক্রবাল বা লোকধাতু, (৫৫) কিন্তু আমাদের মনে হয়, আদিত্তে বৌদ্ধগণ একটিই

৪৭। দীঘ, ১২।১৫; রীজ ডেভিডস, ডায়ালগ্‌স্, (১ম) পৃ: ২৮০; তুল: মিলিন্ড (সেকরেড বুক্‌স্ অফ দি ইস্ট, ৩৬, পৃ: ১৫৩)।

৪৮। দীঘ, ২।১০৭; অজুত্তর, ৪।৩১২; দ্র: বীল, ক্যাটেনা অফ্ বুদ্ধিস্ট স্ক্রিপচার্‌স্, পৃ: ৪৭।

৪৯। সেকরেড বুক্‌স্ অফ দি ইস্ট (৩৫), পৃ: ১০৬।

৫০। ৩।৬; তুল: ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ১।১।৬।৪।

৫১। দ্র: জার্নাল্ অফ দি পালি টেক্সট্‌স্ সোসাইটি, ১৯০৪, পৃ: ৭৭, ১১৭, ১৪২।

৫২। ৩।১-৪৪।

৫৩। ৩।৪৫-১০২।

৫৪। চাইল্ডার্স, ডিক্‌সনারী অফ পালি ল্যাঙ্গুয়েজ, পৃ: ৪৫৩।

৫৫। অজুত্তর, ১।২২৭।

ছোট বিশ্বজগতের কল্পনা করেছিলেন, প্রাক-বৌদ্ধ ঐতিহ্য অনুসরণে। কালক্রমে বিশ্বজগতের সংখ্যাবৃদ্ধির দিকে প্রবণতা দেখা যায়। দীর্ঘ নিকায় গ্রন্থে আমরা দশটি ব্রহ্মাণ্ডের উল্লেখ পাই (দসাস্স লোকধাতু) (৫৬) ও একই গ্রন্থে এক হাজার ব্রহ্মাণ্ডেরও উল্লেখ আছে। (৫৭) মজ্জিম্নিকায় (৫৮) ও সংযুক্তনিকায় (৫৯) গ্রন্থদ্বয়ে দশ সহস্র বিশ্বজগতের উল্লেখ আছে (দসমহসসি লোকধাতু)। বিস্বদ্ধিমগ্গ নামক গ্রন্থে (৬০) আমরা বুদ্ধের তিনটি ক্ষেত্রের কথা জানতে পাবি—জ্ঞানক্ষেত্র যা দশ হাজার জগত নিয়ে গঠিত, আজ্ঞাক্ষেত্র যা দশ সহস্র কোটি জগত নিয়ে গঠিত এবং জ্ঞানক্ষেত্র যেখানকার জগতের সংখ্যা গণনার অতীত। (৬১) এই অসংখ্য জগত হাজার হাজার 'ক্ষুদ্র বিশ্বচরাচর' মध्ये শ্রেণীবদ্ধ হয়েছে এবং এইভাবে অসংখ্য 'বৃহৎ চক্রবালেব' সৃষ্টি হয়েছে। (৬২) তিনটি করে এই জাতীয় চক্রবাল একটি অপরটির সঙ্গে স্পর্শক-বৃত্তের মত লেগে আছে এবং এই ধরনের দুটি শ্রেণীর মধ্যে গভীর অন্ধকারের ব্যবধান বিরাজ করছে। (৬৩)।

এই জাতীয় অসংখ্য অগণ্য ক্ষুদ্র বিশ্বচরাচরের কল্পনা আসলে কষ্টকল্পনা যা যেন জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমরা পূর্বেই বলেছি যে আসলে আদিতে একটিমাত্রই বিশ্বচরাচর কল্পিত হয়েছিল যা অবশ্যই আমাদের এই জগতকে ঘিরে। বহুবন্ধু বিরচিত যে অস্তিধর্মকোশ গ্রন্থটির কথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি তা অনুযায়ী সর্বাগ্রে সৃষ্ট হয়েছিল ব্রহ্মার স্বর্গরাজ্য; তারপর যথাক্রমে পরানির্মিত বশবর্তী, নির্মাণরতি, ভূষিত ও যম দেবতাদের স্বর্গলোক; তারপর ১,৬০০,০০০ যোজন ঘন বায়ুমণ্ডল; তারপর ৮০০,০০০ যোজন ঘন জলের আবরণ (আপমণ্ডল); তারপর ৩২০,০০০ যোজনব্যাপী সুবর্ণময় পৃথিবী (কাঞ্চনময়ী ভূমি)। (৬৪) পৃথিবীর কেন্দ্রে মেরুপর্বত অবস্থিত, যাকে বেঁঠন করে আছে আটটি পর্বতশ্রেণী, একটি থেকে অপরটির মধ্যে মহাসমুদ্রের ব্যবধান, প্রত্যেকটি মহাসমুদ্রে কয়েকটি করে দ্বীপ। সপ্তম ও অষ্টম পর্বতশ্রেণীর মধ্যকাব সমুদ্রই

৫৬। ২।১৩৯।

৫৭। ২।২৬১।

৫৮। ৩।১০১।

৫৯। ১।১৪৬।

৬০। বিস্ব, ১৩।

৬১। হার্ডি, ম্যানুয়াল অফ বুদ্ধিজ্জ, পৃঃ ২।

৬২। চক্রবাল শব্দটির দ্বারা একটি বিশেষ ধরনের পর্বতশ্রেণীকেও বোঝায়।

৬৩। বীল, ক্যাটেনা, পৃঃ ৬৪; হার্ডি, লিজেণ্ড্‌স্ এণ্ড থিওবিজ্ অফ দি বুদ্ধিষ্টস্,

পৃঃ ১১০।

৬৪। ৩।১-১০২।

সর্ববৃহৎ এবং এখানে আছে চারটি দ্বীপমহাদেশ, যার একটি হচ্ছে জম্বুদ্বীপ যেখানে বুদ্ধের জন্মান ।(৬৫)

জম্বুদ্বীপের বিশ সহস্র ষোড়শ নিয়ে অরীচি নামক নরক, যার উপরে সাতটি ‘উত্তপ্ত নরক’ আছে—প্রতাপন, তাপন, মহারৌরব, রৌরব, সংবাত, কালশত্রু এবং সঞ্জীব । এইগুলি ত্রিকোণাকৃতি(৬৬) এবং প্রতিটির মধ্যেই আছে চারটি উৎসদ (উৎসদ)—(ক) কুকুল (অগ্নিকুণ্ড), (খ) কুণপ (পদ্মময় ক্ষেত্র), (গ) ঞ্জাম্বালী বন এবং (ঘ) নদী ।(৬৭) এ ছাড়া আরও আছে সাতটি শীতল ‘নরক’—অটট, হহব, হহব, উৎপল; পদ্ম, অবুর্দ, নিরবুর্দ এবং মহাপদ্ম । পূর্ব-উল্লিখিত তমিস্র-লোকে এগুলির স্থান ।(৬৮) অবশ্য এই সকল নরকের ধারণায় কিছুটা দ্ব্যর্থবোধও আছে । তা ছাড়া আরও কতকগুলি নরকের নাম বৌদ্ধগ্রন্থে পাওয়া যায় যা নামমাত্রই এবং কালক্রমে ষেগুলির সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটেছে ।

বৌদ্ধ ধারণা অনুযায়ী ছয়টি কামধাতু বা উচ্চত্তর জীবদেব আশ্রয়স্থল আছে । মেরু পর্বতের চতুর্থ স্তরে চাতুর্মহারাজকায়িকগণের বাসস্থান যাবা চতুর্দিকের রক্ষক, মেরুর শীর্ষে ত্রায়স্থিংশ দেবগণের আবাস, জম্বুদ্বীপের ১৬০,০০ ষোড়শ উপরে যমগণের নিবাসস্থল, এবং তারও উপরে যথাক্রমে তুম্বিভ, পরানিমিভ, বশবর্তী এবং নির্মাণয়ভি দেবগণের এলাকা ।(৬৯) বস্তুজগতের স্বর্গসমূহকে রূপধাতু আখ্যা দেওয়া হয়েছে । এইগুলির সংখ্যা সত্তেব বা চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত । প্রথম শ্রেণীতে আছে ব্রহ্মপার্বত্য, ব্রহ্মপুরোহিত এবং মহাব্রাহ্মানদের আবাসস্থল, দ্বিতীয় শ্রেণীতে পরীকৃত্ত, অপ্রমাণাত্ত এবং আভাশ্বয়, তৃতীয় শ্রেণীতে পরীকৃত্ত, অপ্রমাণাত্ত এবং শুভ-কুৎস ও চতুর্থ শ্রেণীতে অনভ্রক, পুণ্যপ্রসব, বৃহৎফল, অবুহ, অতপ, সুদূশ, সুদর্শন এবং অকনিষ্ঠদের বাসস্থান । এই হচ্ছে মোট সত্তেরটি বস্তুজগতের স্বর্গ ।(৭০) সর্বশেষে আমবা পাই অরূপধাতু বা বস্তুবর্জিত লোকসমূহ । এগুলি কোনো ‘স্থান’ বা ‘স্বর্গ’ নয়, এগুলিকে বলা হয়েছে ‘অবস্থা’ (আকার) । ‘প্রথমটি হচ্ছে আকাশানন্ত্যায়ত্তন (সীমাহীন শূন্যতার অবস্থা), দ্বিতীয়টি বিজ্ঞানান্ত্যায়ত্তন (অসীম জ্ঞানের অবস্থা), তৃতীয়টি অকিঞ্চনায়ত্তন (নাস্তিময় অবস্থা) এবং চতুর্থটি নৈব-

৬৫ । পরবর্তী একটি অঙ্কচ্ছেদে এইগুলির বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়েছে ।

৬৬ । বীল, ক্যাটেনা, পৃঃ ৫৭ ।

৬৭ । জার্ণাল অফ পালি টেক্সটস সোসাইটি, ১৮৮৭, পৃঃ ১৪৪ ।

৬৮ । বিভিন্ন পালি গ্রন্থে এই নামগুলির কিছু কিছু ভিন্ন পাঠ, পরিবর্তন এবং পরিবর্তন দৃষ্ট হয় । দ্রঃ সংস্কৃত, ১।১৫২ ; অজুওর, ৫।১৭২ ইত্যাদি ।

৬৯ । মজ্জিম, ২।১৯৪ ; ৩।১০০, দীঘ, ২।২৫৬ ।

৭০ । তুলঃ অভিধর্মকোশ, ৩।২ ।

সংস্কৃতীনাংজ্ঞানভন (না চৈতন্যময় না অচৈতন্যময় অবস্থা)। প্রথম তিনটিকে বলা হয় বিজ্ঞানস্থিতি, (৭১) এবং চতুর্থটি বিগত উপেক্ষায় অবস্থিত কেননা তা চৈতন্য-অচৈতন্য সর্বপ্রকার আসক্তিমুক্ত।

উপবিভুক্ত তথ্যাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে মনে হয় যে বৌদ্ধ বিশ্বতত্ত্ব আসলে কৃত্রিম কল্পনাবিলাস ছাড়া আর কিছুই নয়। যা নিশ্চিত বলে মনে হয় তা হচ্ছে এই যে আদিত্তে তিনটি মাত্র ধাতু কল্পিত হয়েছিল, লোক, রূপ এবং অরূপ। প্রথম দুটি পৃথিবী ও স্বর্গের সাধারণ ধারণা অল্পসারেই গড়ে উঠেছে। আকাশরূপী স্বর্গের বিকল্প হিসাবে পৃথিবীর নিম্নে অবস্থিত নরকের ধারণাও পাশাপাশি গড়ে ওঠে, এবং এই-গুলির সংখ্যাবৃদ্ধির প্রবণতা দেখা যাবার পর থেকেই স্বর্গ, পৃথিবী ও নরকের সংখ্যা এতই বৃদ্ধি পেতে আরম্ভ কবে যে কালক্রমে অগণ্য ‘ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড’ের কল্পনা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে, যেগুলির মধ্যে একটিতে আমাদের এই পৃথিবী অবস্থিত।

জৈন ব্রহ্মাণ্ডকল্পনা

জৈন ধারণা অম্বারী বিশ্বচরাচর মহাশূন্যে অবস্থিত যা দুভাবে বিভক্ত, লোকাকাশ ও অলোকাকাশ। শেষোক্ত বিষয়টি জৈনশাস্ত্রে যথাবোধ্য সংজ্ঞা সহকারে কথিত হয় নি, শুধু এইটুকু বলা হয়েছে যে তা এক আশ্চর্য্য শূন্যতা যা কোনো পার্থিব বা অপার্থিব বস্তুর দ্বারা অভেদ। পক্ষান্তরে লোকাকাশ দুটি সত্তায় বিভক্ত, ধর্ম ও অধর্ম, বা যথাক্রমে গতি ও স্থিতির পরিচায়ক। এই লোকাকাশেই বিশ্বচরাচর অবস্থিত। বিনয় বিজয় রচিত লোকাকাশেশ্বর (৭২) বর্ণনা অম্বারী বিশ্বচরাচর যেন একটি জীবন্ত মানুষ, যে দাঁড়িয়ে আছে পা দুটি ফাঁক করে এবং হুহাত কোমরে রেখে। (৭৩) এই বিশেষ আকারটি নানাভাবে কল্পনা করা হয়েছে, যেন একটি ঘুরন্ত বৃহদায়তন টাকুর অর্ধাংশের উপর আর একটি অশেষাকৃত ক্ষুদ্র ঘুরন্ত টাকু (৭৪), অথবা যেন তিনটি পেয়লা, একটি অপরটির উপর এমনভাবে রক্ষিত হয়েছে যে দেখে মনে হয় যেন কোন মানুষ কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। (৭৫) পক্ষান্তরে গুপ্তোত্তব যুগে রচিত একটি গ্রন্থের বর্ণনা অম্বারী কথিত আকারটির নিম্নাংশটি যেন একটি বেত্রাসন বা বেতের মোড়া, মধ্যাংশটি যেন একটি দণ্ডারমান মৃদঙ্গের অর্ধাংশ এবং সবচেয়ে উপরের অংশটি যেন একটি সম্পূর্ণ ক্ষুদ্রতর মৃদঙ্গ। (৭৬) অথবা নিম্ন অংশটি যেন একটি মস্তক কীর্ণিত চতুষ্কোণ পিরামিড

৭১। দীঘ, ২।৬৯; অঙ্গুত্তব, ৪।৪০।

৭২। ১২।৩-৪।

৭৩। তুলঃ ঋগ্বেদেব পুরুষসুক্ত।

৭৪। কিরফেল, কস্মোগ্রাফি ডেব ইণ্ডোর, পৃঃ ২১০।

৭৫। কোলক্রক, মিস্লেনিয়াস এসেস (২য়) পৃঃ ৯৯৮।

৭৬। তিলোয়পন্নতী, ১।১৩৭-৩৮।

যাব উপরে অহরূপ আর একটি পিরামিড উন্টো করে বসানো হয়েছে এবং তাব উপর বসানো হয়েছে আরও একটি মস্তক কর্তিত পিরামিড, অর্থাৎ নিম্নটির ও মধ্যটির ক্ষুদ্রতর ভূমি দুটি একে অত্বেব উপর সংস্থাপিত হচ্ছে, এবং মধ্যেরটির ও উপরেরটির বৃহত্তর ভূমি দুটির একটি অপরটির উপর বসছে। (৭৭) এই কল্পিত নরদেহের কোমরের অংশটি হচ্ছে পৃথিবী, যার উপরে ও নীচে যথাক্রমে স্বর্গ ও নরকসমূহ অবস্থিত।

এরপরে আসছে বিশ্বচরাচরের দৈর্ঘ্য, বিস্তার ও উচ্চতার কথা। দৈর্ঘ্যেব কোন নির্দিষ্ট হিসাব নেই, তবে উচ্চতা ও বিস্তার যথাক্রমে ১৪ ও ৭ রজ্জু। এক রজ্জু হচ্ছে ততখানি দূরত্ব যা অতিক্রম করতে দেবতাদের ছয়াস সময় লাগে, আর দেবতাদের গতিবেগের হিসাব হচ্ছে মুহূর্তে ২০,৫৭,১৫২ যোজন। নরদেহসদৃশ বিশ্বচরাচরের পাদদেশ ৭ বজ্জু, কটিদেশ ১ রজ্জু, বক্ষদেশ ৫ রজ্জু এবং মস্তক ১ রজ্জু, এই হচ্ছে ১৪ বজ্জুর হিসাব। (৭৮) বিশ্বচরাচরের ক্ষেত্রফল ৩৪৩ ঘন (কিউবিক) রজ্জু। (৭৯) বিশ্বচরাচরের যে অংশটি পৃথিবীরূপে নির্দিষ্ট তাব চারদিকে আছে যথাক্রমে ঘন জল, ঘন বায়ু ও লঘু বায়ুর আন্তরণ, দিগম্বর মতাহুযায়ী প্রতিটি আন্তরণ ২০,০০০ যোজন পরিমাণ পুরু। বিশ্বচরাচরের বর্ণনায় ঋতাস্বর ও দিগম্বর ধাবার মধ্যে খুঁটিনাটি হিসাবনিকাশের ক্ষেত্রে পার্থক্য থাকলেও, উভয়েরই বক্তব্য অহরূপ।

পৃথিবীর নীচে অর্থাৎ নরদেহরূপী বিশ্বচরাচরের কোমরের তলায় সাতটি অঞ্চল একটি অপরটির নীচে রয়েছে। এই সাতটি অঞ্চলে রয়েছে লক্ষ লক্ষ নরক। অঞ্চল সাতটি হচ্ছে রত্নপ্রভা, শর্করাপ্রভা, বালুকাপ্রভা, ধূমপ্রভা, তমঃপ্রভা এবং মহাতমঃপ্রভা। অপর একটি বর্ণনা অম্বায়াী ঐগুলির নাম হচ্ছে ধর্মী, বংশী, শৈলা, অঞ্জনা, অরিষ্টা মাধব্যা ও মাধবী। এই সাতটি অঞ্চলের উপরে রয়েছে অসংখ্য দ্বীপ ও সাগর দিয়ে গড়া পৃথিবী। পৃথিবীর এলাকার উপর থেকে স্বর্গীয় অঞ্চলগুলি শুরু হচ্ছে। নরদেহসদৃশ বিশ্বচরাচরের বকের উপর থেকে গলা পর্যন্ত বিমান নামে পরিচিত যা বাবোটি স্থানের সমষ্টি। এই স্থানগুলির নাম কল্প যেগুলির নাম শৌর্ধ্য, ঐশান, সনৎকুমার, মাহেন্দ্র, ব্রহ্মলোক, লাস্তক, মহাশক্ত, সহস্রার, আনত, প্রাণত, আবণ এবং অচ্যুত। এগুলির উপরে রয়েছে গ্ৰৈবেয়ক নামক নয়টি অঞ্চল যা আমাদের কল্পিত বিশ্বচরাচরের ত্রীবাদেশটি গঠন করেছে। এর উপরে, অর্থাৎ মস্তকদেশে আছে পাঁচটি স্থান নিয়ে গঠিত অহুত্তর নামক অঞ্চল। এই পাঁচটি স্থান হচ্ছে বিজয়, বৈজয়ন্ত, জয়ন্ত, অপবাজিত ও সর্বার্থসিদ্ধ। (৮০) এইভাবে ২৬টি

৭৭। সরকার, কসমোগ্রাফি, পৃ: ৪৬।

৭৮। কিরফেল, কসমোগ্রাফি, পৃ: ২১১।

৭৯। দুগার, আচার্যভিক্ষু স্মৃতিগ্রন্থ, (৩য়) পৃ: ২২৬।

৮০। তত্ত্বার্থাধিগম পুত্র, জ্যাকোবিকৃত অম্ববাদ দ্রষ্টব্য।

অগ্নীয় অঞ্চল একে অপরের উপর বয়েছে। সবচেয়ে উপরের স্বর্গ সর্বার্থ-সিদ্ধেরও উপরে আছে ঈশ্বরপ্রগভার নামক একটি স্থান বা সকল আত্মার শেষ আশ্রয়। (৮১)

পৃথিবী

জগত সম্বন্ধে সম্যক ধারণা বোধ হয় পুরাণকারদের ছিল না, যে কারণে ভুবিস্তাস্ত সংক্রান্ত বিষয়ে বিভিন্ন পুরাণে পরস্পরবিবোধী উক্তি রয়েছে, কখনো কখনো একই পুরাণে। উদাহরণস্বরূপ, বায়ু পুরাণে এক জায়গায় বলা হয়েছে যে পৃথিবী সাতটি দ্বীপমহাদেশ নিয়ে গঠিত, অপর জায়গায় বলা হয়েছে সাতটি নয়, চারটি। (৮২) মনে হয় যে প্রথমে উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম এই চতুর্দিককে কেন্দ্র করে চারটি মহাদেশের ধারণাই গড়ে উঠেছিল, সপ্ত মহাদেশের কল্পনা পরবর্তীকালে জনপ্রিয় হয়েছিল। পুরাণসমূহে বর্ণনামুযায়ী পৃথিবীর কেন্দ্রে মেক্র বা স্রমেক্র পর্বত, এবং পৃথিবী গঠিত হয়েছে সাগরবেষ্টিত সাতটি দ্বীপকে অবলম্বন করে, দ্বিতীয় দ্বীপটি প্রথমটির দ্বিগুণ, তৃতীয়টি দ্বিতীয়টির দ্বিগুণ, এই অমুপাতের পরিমাপে দ্বীপগুলি সন্নিবেশিত। এই দ্বীপ মহাদেশগুলির নাম জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলী, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক এবং পুষ্কর যেগুলি যথাক্রমে লবণ, হৈহু, সুরা, ঘৃত, দধি, দুগ্ধ ও জলের সমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত। কিন্তু দ্বীপগুলির নাম ও অবস্থান সম্বন্ধে বিভিন্ন পুরাণে ভিন্নমত পরিলক্ষিত হয়, যেমন মৎস্য(৮৩) ও পদ্মপুরাণে(৮৪) নিম্নলিখিত ক্রমাহসারে দ্বীপগুলিকে সাজানো হয়েছে : জম্বু, শাক, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাল্মলী, গোমেদ (প্লক্ষের পরিবর্তে) এবং পুষ্কর। এই বিষয়টি আলবিরুণী(৮৫) ও আবুলফজলের(৮৬) দৃষ্টি এড়াননি। পুরাণসমূহের বক্তব্য অনুযায়ী বৈবস্বত মহুর পুত্র প্রিয়ব্রত তাঁর সাতটি পুত্রকে উপরি-উক্ত সাতটি দ্বীপ দান করেছিলেন, তাঁরা আবার নিজেদের পুত্রদের মধ্যে দ্বীপগুলির অংশ সমূহ বন্টন করেছিলেন। দ্বীপের অংশগুলি, বর্ষ নামে পরিচিত, সেগুলির নামকরণ হয়েছে প্রিয়ব্রতের পৌত্রদের নামে। (৮৭)

প্লক্ষদ্বীপ আয়তনে জম্বুদ্বীপের দ্বিগুণ। এখানে আছে সাতটি পর্বত (গোমেজ, চন্দ্র, নারদ, হৃন্দুভি, সোমক, স্রমন এবং বৈভ্রাজ), সাতটি নদী (অমৃতপ্ত, শিখী, বিপাশা,

৮১। উত্তবাধ্যায়ণ, ৩৬।৫৭-৬২।

৮২। ৩৩।৪।২৪।৩১ ; ৩৪।৭-৪৬।৫৫-৫৬ ; ৪১।৮৩।৮।৫৬ ; ৪৩।৭২-৮০, তুলঃ ব্রহ্মাণ্ড,

৫৩।১৪০।

৮৩। ১২২-২৩।

৮৪। স্বর্গ, ৪।

৮৫। জাকাউ, আলবিরুণীস্ হিণ্ডিয়া, (১ম) পৃঃ ২৩৬।

৮৬। জ্যারেট, আইন-ই-আকবরী, (৩য়) পৃঃ ৩২।

৮৭। বায়ু, ৩৩।

ত্রিদিবা, জুম, অমৃত্যু এবং সুরুতা) এবং চার শ্রেণীর অধিবাসী (আর্থক, কুরু, বিবিশ ও ভাবী)। শাল্লী দ্বীপেও সাতটি পর্বত (কুমুদ, উন্নত, বলাহক, দ্রোণ, কংক, মহিষ এবং ককুমুদ), সাতটি নদী (ঘোনী, তোয়া, বিতুফা, চম্বা, শুক্লা, বিমোচনী এবং নিবুজি) এবং চার শ্রেণীর (কপিল, অরুণ, পীত ও কৃষ্ণ) অধিবাসী আছে। অমরুপভাবে কুশ দ্বীপেও সাতটি পর্বত (হেমশৈল, বৈক্রম, দ্যুতিময়, পুষ্পবৎ কুশেশ্বর, হরি ও মন্দবাচল), সাতটি নদী (ধূতপাপা, শিবা, পবিত্রা, সম্মতি, বিদ্যাত, অস্তা ও মহী) এবং চার শ্রেণীর অধিবাসী (দম্বী, শুদ্বী, স্নেহ ও মন্দেহ) বর্তমান। ক্রৌঞ্চ দ্বীপেও সাতটি পর্বত (ক্রৌঞ্চ, বামণ, অঙ্ককারক, দেবাবুৎ, পুণ্ডরীকবৎ, হৃন্দুভি ও মহাশৈল) এবং সাতটি নদী (গৌরী, কুমুদভী, সন্ধ্যা, রাজি, মনোজবা, ক্ষান্তি ও পুণ্ডরিকা) অবস্থিত। শাকদ্বীপেও সাতটি পর্বত (জলধর, রৈবতক, শ্যাম, অন্তগিরি, আক্ষিকেশ্বর, রম্য ও কেশরী), সাতটি নদী (সুকুমারী, কুমাবী, নলিনী, ধেমুকা, ইক্ষু, বেণুকা ও গভস্তী এবং চারশ্রেণীর অধিবাসী (মৃগ, মগধ, মানস ও মন্দগ) বর্তমান। পুন্ডর দ্বীপে একটিমাত্র পর্বত আছে যার নাম মানসোত্তর, কিন্তু সেখানে কোন নদী নেই, অধিবাসীদের আয়ু ১০,০০০ বছর। পুন্ডর দ্বীপকে যে সাগর বেষ্টিত করে আছে তার ওপারে একটি স্তব্ধ ভূমি বর্তমান, যার নাম লোকালোক।(৮৮)

রায়চৌধুরীর মতে, এই দ্বীপগুলির বর্ণনা দেখেই বোঝা যায় যে বাস্তবতার সঙ্গে বর্ণিত এই ধারণাসমূহ নিতান্তই কাল্পনিক, স্পেনীয় এল-গেরাগেব মত এগুলি একান্তই মনগড়া।(৮৯) কিন্তু তা সত্ত্বেও পশ্চিম এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকার কিছু কিছু অঞ্চলের পরিচয় এই নামগুলির মধ্যে বুঁজে পাওয়া যায়। এটাও লক্ষ্যণীয় যে আলবিরুণী কর্তৃক উদ্ধৃত একটি পুরাণের শ্লোকে পুন্ডর দ্বীপকে চীন ও মঙ্গোলিয়ায় মাঝখানে স্থান দেওয়া হয়েছে।(৯০) অ্যুর্বোপাসক শাকদ্বীপী মগধিজদের বিষয় তুলে ওই দ্বীপটিকে শকস্থান-মিজিস্তান মিস্তানের সঙ্গে অভিন্ন বলে কেউ কেউ মনে করেন। ম্যাজাই পুরোহিতরা তাদের মিথ বা মিহির উপাসনা ভারতে নিয়ে এসে এদেশে তাঁরা মগ বা শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ বলে পরিচিত হয়েছেন।(৯১) একই ভাবে কুশদ্বীপকে কুবের সঙ্গে, অর্থাৎ আকিমিনীয় লেখমালার কুষীয়দের ভূমির সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে করা হয়েছে।(৯২)

আমরা পূর্বে একথা বলেছি যে পুরাণে পৃথিবী গঠনকারী মহাদেশের সংখ্যা কোন কোন স্থানে চারটি এবং কোন কোন স্থানে সাতটি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই দুটি

৮৮। সরকার, কসমোগ্রাফি, পৃ: ৪৯-৫০।

৮৯। স্টাডিজ ইন ইণ্ডিয়ান এন্টিকুইটিস, পৃ: ৬৮।

৯০। আলবিরুণীস ইণ্ডিয়া, (১ম), পৃ: ২৬১।

৯১। ভাণ্ডারকর, বৈষ্ণববিজয়, শৈববিজয় ইত্যাদি, পৃ: ১৫৩।

৯২। সরকার, জিওগ্রাফি অফ এনসেন্ট এণ্ড মিডিয়েভাল ইণ্ডিয়া, পৃ: ১৬৩-৬৪।

মতবাদেব চাব মহাদেশের মতবাদটিই অধিকতর প্রাচীন। উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম চার দিকে চার মহাদেশের অবস্থানের ধারণাটাই বিশেষ স্বাভাবিক, পক্ষান্তরে সাত নামক সংখ্যাটি কয়েকটি বিশেষ কারণের জন্ত ভারতে ও জগতের নানাস্থানে বিশেষ জনপ্রিয়। (৯৩) চারটি মহাদেশ নিয়ে গঠিত পৃথিবীর ধারণা বৌদ্ধ সাহিত্যে বিশেষভাবে বর্তমান। (৯৪) আমরা আগেই দেখেছি, বৌদ্ধ ধারণামুযায়ী তথাকথিত ‘কাঞ্চনভূমির’ মধ্যস্থলে মেরুপর্বত অবস্থিত, যাব অপর নাম স্নমেরু, হেমমেরু, মহামেরু এবং সিনেরু, এবং যা আটটি পর্বতশ্রেণীর দ্বারা বেষ্টিত। (৯৫) প্রথম সাতটির নাম যুগন্ধর, ঈশাধব, করবীক, স্নদর্শন, নেমীন্ধর, বিনতক এবং অশ্বকর্ণ, পক্ষান্তরে অষ্টমটি বাহা লৌহনির্মিত কাঞ্চনভূমির কিনাবার অবস্থিত। (৯৬)

বহিস্‌গুদ্রে চাবটি মহাদ্বীপ অবস্থিত, যেগুলি একটি অপরটি থেকে সমদূরবর্তী। এইগুলির মধ্যে যেটি উত্তরে অবস্থিত সেটির নাম উত্তরকুরু, দক্ষিণেরটির নাম জম্বুদ্বীপ, পূর্বেরটির নাম পূর্ববিদেহ এবং পশ্চিমেরটির নাম অপব-গোদান। অধিকন্তু আটটি উপ-দ্বীপও (উপদ্বীপ নম্ব) বর্তমান—দেহ, বিদেহ, চামর, অণচামর, বাট, উত্তবমদ্রী, কুরু ও কোরব। উত্তরকুরু মহাদেশ আয়তনে সর্ববৃহৎ এবং তা সর্ব-উত্তরে অবস্থিত। আয়তনে এই মহাদেশ চতুষ্কোণ, যার পরিসীমা ৮,০০০ যোজন। এখানে মানুষ ৩২ হাত লম্বা এবং তাদের আয়ু ২,০০০ বছর। এখানকার অধিপতি কুবের বা বৈশ্রবণ যার রাজধানী অলকনন্দা এবং যার মন্দির বিষাণ নামক স্থানে অবস্থিত। (৯৭) পূর্ববিদেহের ৬,৩৫০ যোজন পরিসীমা, যাকে দেখায় অর্ধচন্দ্রের মত। এখানকার অধিবাসীদের আয়ু ২৫০ বছর, এবং তারা উচ্চতায় ৮ হাত। (৯৮) অপব-গোদান কথাটির পশ্চিমদিকের পশ্চাৎচরণ ক্ষেত্র। আয়তনে এই মহাদেশ চক্রাকার যার পরিধি ৭,৫০০ যোজন। এখানকার অধিবাসীদের আয়ু ৫০০ বছর এবং তাদের উচ্চতা ১৬ হাত। (৯৯) জম্বুদ্বীপে যখন সূর্যোদয়, অপব-গোদানে তখন মধ্যরাত্রি, এবং শেখোক্তস্থানে যখন সূর্যাস্ত পূর্বোক্ত স্থানে তখন মধ্যরাত্রি। পক্ষান্তরে অপব-গোদানে যখন সূর্যোদয় জম্বুদ্বীপে তখন দ্বিপ্রহর, পূর্ববিদেহে তখন সূর্যাস্ত এবং উত্তরকুরুতে তখন মধ্যরাত্রি। জম্বুদ্বীপ সম্বন্ধে বৌদ্ধ ধারণার খুঁটিনাটি আমরা কিছু পরে আলোচনা করছি।

৯৩। তুলঃ বেদিক ইণ্ডুক্স (২য়) পৃঃ ৪২৪।

৯৪। হার্ভি, ম্যাথুয়াল, পৃঃ ৪, ১৪ ; লিজেণ্ডস, পৃঃ ৮৫।

৯৫। প্রাতিটি চক্রবাল বা লোকধাতু বা ক্ষুদ্রব্রহ্মাণ্ডের নিজস্ব মেরু বর্তমান।

৯৬। মলয়লসেকেরু, ডিক্সনাবী অফ পালি প্রপার নেমস্ (২য়) পৃঃ ১১৩৬।

৯৭। ডিক্সনাবী অফ পালি প্রপারনেমস্ দ্রঃ উত্তরকুরু।

৯৮। ঐ, দ্রঃ পূর্ববিদেহ।

৯৯। ঐ, দ্রঃ অপবগোদান।

পুরাণসমূহে এবং বৌদ্ধশাস্ত্রসমূহে উত্তরকুরু উত্তরক্ষেত্রেই বর্তমান এবং জম্বুদ্বীপও তাই। আমরা দেখেছি যে পরবর্তী যুগেব বৈদিক সাহিত্যে উত্তরকুরুকে হিমবতের ওপারে স্থান দেওয়া হয়েছে, মোটামুটিভাবে মধ্য এশিয়া অঞ্চলে। ওস্তোরোকেরাহা নামটি টলেমির জুগোলেও বর্তমান, (১০০) এবং এই হিসাবে নামটির কিছুটা ঐতিহাসিক ভিত্তিও আছে। পূর্ববিদেহ বলতে বিদেহেব পূর্বাংশ বোঝায় যা উত্তর বিহারে অবস্থিত ছিল। বুদ্ধ এই অঞ্চলে জন্মেছিলেন বলেই হয়ত স্থানটি এতটা কৌলিষ্ঠ পেয়েছে।

জৈন ঐতিহ্য অম্বষায়ী লক্ষ লক্ষ নরক সম্বলিত সাতটি পাতালের উপরে সপ্তদ্বীপা পৃথিবী অবস্থিত। এই সাতটি দ্বীপ হচ্ছে জম্বুদ্বীপ, ধাতকী, পুঙ্কর, বারুণীবর, ক্ষীরবর, ঘৃতবর এবং ক্ষৌদ্রবর। এইগুলি সাতটি মহালাগরের দ্বারা বেষ্টিত যেগুলির নাম যথাক্রমে লবণোদ, কালোদ, পুঙ্করোদ, বারুণ্যোদ, ক্ষীরোদ, ঘৃতোদ এবং ক্ষৌদ্রোদ। মনে হয় যে আদিতে জৈন লেখকগণ সাতটি মাত্রই দ্বীপমহাদেশের কল্পনা করেছিলেন। পরবর্তীকালে এই সংখ্যাগুলি অপর লেখকদের হাতে বেড়েছে। তিলোন্নগম্ভী গ্রন্থে(১০১) ষোলটি ভিতরের ও ষোলটি বাইরের মহাদেশের নাম আছে যেগুলি নিয়ে পৃথিবী গঠিত হয়েছে এবং যেগুলির প্রত্যেকটি একটি করে সমুদ্রের দ্বারা বেষ্টিত। উপরি-উল্লিখিত সাতটি দ্বীপমহাদেশ ছাড়া নিম্নালিখিত আন্তর্দ্বীপগুলির নাম কথিত গ্রন্থে দেওয়া হয়েছে : নন্দীশ্বর, অরুণবর, অরুণগম, কুণ্ডলবর, শংখবর, রুচকবর ভূজগবর, কুশবর ও ক্রৌঞ্চবর। শেষ দুটি নাম পুরাণ থেকে নেওয়া হয়েছে। ষোলটি বহির্দ্বীপের নাম মনঃশিলা হরিতাল, সিন্দূব, শ্যাম, অঞ্জনবর, হিজুল, রূপ্য, কাঞ্চনক, বজ্রবর, বৈদূর্য, নাগবর, ভূতবর, যক্ষবর, দেববর, অহীন্দ্রবর ও স্বয়ম্ভুরমণ। পরবর্তী জৈন বচনাসমূহে আরও অনেক নাম যুক্ত হয়েছে যেমন—অরুণ, অরুণবর, অরুণবরাবভাস, কুণ্ডল, কুণ্ডলবর, কুণ্ডলবাবভাস, শংখ, শংখবর, শংখবাবভাস, রুচক, রুচকবর, রুচকবরাবভাস, হর, হরবর, হরবরাবভাস, কনকাবলি, কনকাবলিবর, কনকাবলিবরাবভাস, রত্নাবলি, রত্নাবলিবর, বদ্রাবলিবরাবভাস, যুক্তাবলি, যুক্তাবলিবর, যুক্তাবলিবরাবভাস, আজিন, আজিনবর, আজিনবরাবভাস, সূর্য, সূর্যবর, সূর্যবরাবভাস, দেব, নাগ, যক্ষ, ভূত, স্বয়ম্ভুরমণ ইত্যাদি। (১০২)

জম্বুদ্বীপ

পৌরাণিক ধারণা অম্বষায়ী জম্বুদ্বীপ পৃথিবী গঠনকারী সাতটি দ্বীপ মহাদেশের একটি। এই সেই মহাদেশ যেখানে ভারতবর্ষ অবস্থিত। (১০৩) জম্বুদ্বীপ, বার অপর নাম সূর্যদর্শন-

১০০। ৬।১৬।৩।

১০১। ৫।১১-২৬।

১০২। তুলঃ কিরকেল, কসমোগ্রাফি, পৃঃ ২৫৩-৬১।

১০৩। কখনো কখনো জম্বুদ্বীপ ও ভারতবর্ষকে অভিন্ন মনে করা হয়েছে।

দ্বীপ, এর দক্ষিণে ও উত্তরে নিম্ন এবং মধ্যভাগে উচ্চ। (১০৪) ছটি নামেরই উদ্ভব হেতু একটি জম্বুবৃক্ষ যার পরিধি শত যোজন। (১০৫) কখনো কখনো জম্বুদ্বীপকে একটি পদ্মের জায় কল্পনা করা হয়েছে যার কনিকা হচ্ছে মেরু পর্বত এবং যার চারটি পাপড়ি হচ্ছে ভদ্রাশ্ব, ভারত, কেতুমাল ও উত্তরকুরু নামক বর্ষ-চতুষ্টয়। (১০৬) জম্বুদ্বীপের উচ্চ কেন্দ্রীয় অঞ্চলটির নাম ইলাবৃতবর্ষ বা মেরুবর্ষ। (১০৭) মেরুর উত্তরে রম্যক, হিরণ্য ও উত্তরকুরু এবং দক্ষিণে ভাবত, কিস্পুরুষ ও হরি, এই তিনটি করে মোট ছয়টি বর্ষ অবস্থিত। (১০৮) এ ছাড়া আবও ছটি বর্ষ, ভদ্রাশ্ব ও কেতুমান, যথাক্রমে মেরুর পূর্ব ও পশ্চিম দিকে অবস্থিত। (১০৯) আকারে জম্বুদ্বীপ গোলাকার যার ফলে সর্বোত্তর ও সর্বদক্ষিণের বর্ষদ্বয়, উত্তরকুরু এবং ভারত, ধনুসাকৃতি বিশিষ্ট হতে বাধ্য হয়েছে। (১১০)

অবশ্য এই বর্ষগুলির ভিন্ন নামও আছে। যেমন রম্যকবর্ষকে কখনো কখনো রমণক (১১১) এবং নীল (১১২) বলা হয়েছে এবং মেরুর উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত বলে ঘোষণা করা হয়েছে। (১১৩) হিরণ্য বর্ষকে কখনো কখনো মেরুর দক্ষিণ-পূর্বে নির্দিষ্ট করা হয়েছে (১১৪) এবং হিরণ্য (১১৫), শ্বেতা বা শুক্লা (১১৬) নামে অভিহিত করা হয়েছে। উত্তর কুরুকে শৃঙ্গবৎ (১১৭) এবং ঐরাবৎ (১১৮) এবং ভারতকে হিম (১১৯), হৈমবত (১২০) এবং অজনাভ আখ্যা দেওয়াও হয়েছে। অল্পরূপ ভাবে কিস্পুরুষকেও

১০৪। মার্কণ্ডেয়, ৫৪।১২-১৩।

১০৫। মৎস্য, ১১৪।৭৪-৭৫, ব্রহ্মাণ্ড, ৩৭।২৮-৩৪, ৫০।২৫-২৬, মহাভারত, ৬।৫।১৩-১৬।

১০৬। ব্রহ্মাণ্ড, ৪৪।০৫, ৪১ ইং; মার্কণ্ডেয়, ৫৫।২০ ইং; ইত্যাদি।

১০৭। ব্রহ্মাণ্ড, ৩৫।২২; মার্কণ্ডেয়, ৬০।৭।

১০৮। মহাভারত, ৬।৬।৫৩; ব্রহ্মাণ্ড, ১৫।২৪-২৮; মৎস্য, ১১৪।৮৫।

১০৯। মৎস্য, ১১৪।৮৫; ব্রহ্মাণ্ড, ৩৪।৪৮, ৩৫।৭।

১১০। মহাভারত, ৬।৬।৩৮; মৎস্য, ১১৩।৩২; ব্রহ্মাণ্ড, ৩৫।৩৩।

১১১। মহাভারত, ৬।৮।২; মৎস্য, ১১৩।৬৮।

১১২। ব্রহ্মাণ্ড, ৩৪।৩৬।

১১৩। গরুড়, ৫৫।৩।

১১৪। ঐ, ৫৬।১।

১১৫। মহাভারত, ৬।৮।৫; মৎস্য, ১১৩।৬৪।

১১৬। ব্রহ্মাণ্ড, ৩৪।৪৬; অগ্নি, ১০৭।৭।

১১৭। ঐ, ৩৭।৪৭।

১১৮। মহাভারত, ৬।৬।৩৭।

১১৯। ব্রহ্মাণ্ড, ৮৪।৪৪ ইং।

১২০। ঐ, ৩৫।৪০।

হেমকূট (১২১) এবং হৈমবত (১২২) এবং হবিবর্ষকে নৈবধ (১২৩) নামে অভিহিত করা হয়েছে এবং মেরুর দক্ষিণ-পশ্চিমে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। (১২৪) ভদ্রাশ্বের নামও কোন কোন স্থানে মাল্যবৎ (১২৫), পূর্বদ্বীপ (১২৬) বা স্পর্শার্থ (১২৭) দেওয়া হয়েছে ও কেতু-মালকে গঙ্গমাধন নামে অভিহিত করা হয়েছে। (১২৮) বর্ষপর্বত নামক পর্বতশ্রেণী মেরুর উত্তরে ও দক্ষিণে অবস্থিত বর্ষগুলিব একটিকে অপরটির থেকে পৃথক করেছে। যেমন, হিমবৎ ভারত ও কিম্পুরুষকে, হেমকূট কিম্পুরুষ ও হবিকে, নিমধ হরি ও ইলাবৃতকে, নীল ইলাবৃত এবং রম্যকে, শ্বেত রম্য এবং হিরণ্যকে এবং শৃঙ্গী বা শৃঙ্গবৎ হিরণ্য ও উত্তর কুরুকে পৃথক করেছে। (১২৯)

বৌদ্ধগ্রন্থে জম্বুদ্বীপকে কোন কোন স্থানে জম্বুদ্বীপ (১৩০) বলা হয়েছে, এবং এও বলা হয়েছে যে ওই দ্বীপের মধ্যস্থিত একটি জম্বুবৃক্ষের নামানুসারেই দ্বীপটির জম্বুদ্বীপ নামকরণ হয়েছে। এখানে পুরাণ সমূহের প্রভাবের পরিচয় হুস্পষ্ট। ওই বৃক্ষের নাম কোন কোন স্থলে নাগবৃক্ষও দেওয়া হয়েছে। আলোচ্য জম্বুবৃক্ষটির কাণ্ডদেশ ১৫ যোজন, শাখাগুলি ৫০ যোজন এবং বৃক্ষটি উচ্চতায় ১০০ যোজন। সমগ্র জম্বুদ্বীপের আয়তন ১০,০০০ যোজন, যার মধ্যে ৩,০০০ যোজন দখল করেছে হিমবৎ, ৩,০০০ যোজন মহুশ্যবসতি এবং বাকি ৪০০০ যোজন সমুদ্র। এখানকার বাসিন্দাদের পবনায়ু ১০০ বছর এবং তারা উচ্চতায় সাড়ে তিন থেকে চার হাত। অশোকের সময় জম্বুদ্বীপের নগরসংখ্যা ছিল ৮৪,০০০ এবং সেগুলির প্রত্যেকটিতে তিনি একটি করে সংঘারায় নির্মাণ করেছিলেন। বুদ্ধগণ এবং চক্রবর্তীগণ এই দ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। (১৩১)

জৈন কল্পনা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় মহাদেশ জম্বুদ্বীপ আয়তনে ১,০০০০০ যোজন এবং তার ক্ষেত্রফল ৩,১৬,২২৭ যোজন ৩ গবুত ১২৮ ধমু এবং ১৪ অঙ্গুলি। জম্বুদ্বীপ একটি প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত যা উচ্চতায় ৮ যোজন, যা তলদেশে ১২ যোজন বিস্তৃত

১২১। ব্রহ্মাণ্ড, ৩৫।৪৪।

১২২। মহাভারত, ৬।৬।৭।

১২৩। ব্রহ্মাণ্ড, ৩৪।৪৫।

১২৪। গরুড়, ৫৫।২।

১২৫। ব্রহ্মাণ্ড, ৩৭।৪৭।

১২৬। ঐ, ৪৫।২৪।

১২৭। অগ্নি, ১০৮।১৪।

১২৮। ব্রহ্মাণ্ড, ৩৪।৪৮।

১২৯। রায়চৌধুরী, স্ট্যাডিজ ইন ইণ্ডিয়ান এ্যান্টিকুইটিজ, পৃঃ ৮৯।

১৩০। অঙ্গুত্তর, ৪।১০ ইত্যাদি।

১৩১। মল্লশেকের, ডিক্সনারী, ভ্রঃ জম্বুদ্বীপ।

এবং শীর্ষদেশে ৪ যোজন। এই প্রাচীর প্রস্থের নির্মিত, প্রতিটি উচ্চতায় ১২ যোজন এবং প্রস্থে ৫০০ ধম্ম এবং মধ্যে মধ্যে তা হীবক শোভিত। প্রাচীরের মধ্যস্থলে একটি পদ্মাকৃতি বেদী আছে যা মূল্যবান ধাতব পদার্থ দ্বারা সজ্জিত। বেদীর তলদেশ হীবক নির্মিত, স্তম্ভগুলি ঋষ্ট নির্মিত, কড়িকাঠগুলি স্বর্ণ নির্মিত এবং বন্ধনী-গুলি পদ্মরাগমণি নির্মিত। এই বেদীর অনতিদূরে স্বর্ণগোষ্ঠান, এত সুন্দর যে একমাত্র তা ইন্দ্রই কল্পনা করতে পারেন। প্রাচীরের চারটি দ্বার—বিজয়, বৈজয়ন্ত, জয়ন্ত ও অপরাজিত, প্রথম দ্বারটি পূর্ব দিকে অবস্থিত। প্রতিটি দ্বারই বর্ণাকার, দৈর্ঘ্যে, উচ্চতায় ও বিস্তারে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আট যোজন। পূর্ব দ্বার বিজয় শীতা নামক নদীর তীরে; অমূরুপভাবে পশ্চিম দ্বার জয়ন্ত শীতোদা নদীর তীরে অবস্থিত। প্রতিটি দ্বারেরই একজন করে অতিমানব প্রহরী আছে।

সমগ্র জম্বুদ্বীপে ছয়টি পর্বতশ্রেণী অবস্থিত যেগুলি দ্বীপটিকে সাতটি অসম বিভাগে বিভক্ত করেছে। এই পর্বতগুলিকে বর্ষপর্বত বা কুলপর্বত বলা হয়, নামটি অবশ্য ব্রাহ্মণ্য পুরাণ থেকে নেওয়া। এই পর্বতশ্রেণীর দ্বারা সৃষ্ট ভূভাগগুলি বর্ষ বা ক্ষেত্র নামে খ্যাত। দক্ষিণ থেকে উত্তরে পর্বতগুলির নাম যথাক্রমে হিমবৎ, শিখরী, মহাহিমবৎ, রুদ্রা, নিষধ এবং নীল। হিমবৎ এবং শিখরী স্বর্ণনির্মিত, মহাহিমবৎ ও রুদ্রা রৌপ্য নির্মিত এবং নিষধ ও নীল বৈদূর্যনির্মিত। এই পর্বতগুলির আয়তন সর্বদক্ষিণস্থ বর্ষের বিভিন্ন বিষয়ের পরিমাপের ভিত্তিতে গণনা করা হয়েছে। এই গণনার বিস্তৃত হিসাব জম্বুদ্বীপপ্রভৃতি এবং ত্রৈলোক্যদ্বীপিকা গ্রন্থদ্বয়ে পাওয়া যায়। সর্বদক্ষিণস্থ বর্ষের দ্বার আয়তন তার পরের বর্ষটির আয়তন প্রথমটির দ্বিগুণ, তৃতীয়টির দ্বিতীয়টির দ্বিগুণ, এই হিসাব। সর্বদক্ষিণস্থ বর্ষের কেন্দ্রীয় পর্বত হিমবতের উচ্চতা ১০০ যোজন হলে তার পরের বর্ষ পর্বতটির আয়তন ২০০ যোজন হবে।

প্রতিটি পর্বতেরই একাধিক করে শৃঙ্গ আছে। হিমবৎ ও শিখরী শৃঙ্গ সংখ্যা প্রত্যেকটির এগারোটি করে, এবং বাকিগুলির প্রত্যেকটির নয়টি করে। প্রতিটি পর্বতের প্রথম বা পূর্বদিকের শিখরের উপর একটি করে সিদ্ধায়ত্তন বা সিদ্ধকূট আছে। হিমবতের উপর যেটি আছে তার দৈর্ঘ্য ৫০ যোজন, বিস্তার ৫০ যোজন এবং উচ্চতা ৩৫ যোজন। পরবর্তী পর্বতগুলির সিদ্ধায়ত্তনসমূহের পরিমাপ এই হিসাবের দ্বিগুণ, তার দ্বিগুণ এইভাবে গণনা করতে হবে। প্রত্যেক পর্বতের মধ্যস্থলে একটি করে সরোবর আছে। হিমবতের উপর যেটি আছে তাব নাম পৌম বা পদ্ম, ১০০ যোজন দীর্ঘ, ৫০০ যোজন বিস্তৃত এবং ১০ যোজন গভীর। এই সরোবরের মধ্যাংশে আছে একটি বৃহদায়ত্তন পদ্ম যা পরিধিতে এক যোজন এবং যা দেবী শ্রীব-আবাসস্থল। এইটিকে ঘিরে আরও কয়েকটি পদ্মক্ষেত্র আছে।

জম্বুদ্বীপের ১৪টি নদীর মধ্যে গঙ্গা, সিদ্ধ ও রোহিত হিমবৎ পর্বতোপরি পদ্ম নামক হ্রদ থেকে নির্গত হয়েছে, রোহিতাংশ এবং হরিক্রান্ত মহাহিমবৎ পর্বতোপরি মহাপদ্ম

হ্রদ থেকে, হরিত এবং শীতোদা নিম্ন পর্বতোপরি ভিত্তিচ্ছ হ্রদ থেকে, শীতা এবং নারী নীল পর্বতোপরি কেশরী হ্রদ থেকে, নবকাস্তা এবং রূপ্যকুলা রুদ্রী পর্বতোপরি মহাপুণ্ড্রিক হ্রদ থেকে এবং স্তবর্ণকুলা, বক্তা ও বক্তোদা শিখরি পর্বতোপরি পুণ্ড্রিক হ্রদ থেকে নির্গত হয়েছে। সকল নদীরই গতিপথ একই প্রকার। (১৩২)

আগেই বলেছি, জৈন লেখকগণ পুরাণ অমুসরণ করে জম্বুদ্বীপকে সাতটি বিভাগ বা বর্ষে বিভক্ত কবেছিলেন, যেগুলি ব নাম, ভরত (ভারত নয়)। ঐরাবত, হৈমবত, হরি, হিরণ্যবত, রম্যক এবং বিদেহ। দক্ষিণ দিক থেকে দেখলে ঐরাবতবর্ষ ভরত-বর্ষের পরেই, যার কেন্দ্রীয় শহরের নাম বিজ্ঞাধব এবং যার মধ্য দিয়ে রক্তা ও রক্তোদা নদীদ্বয় প্রবাহিত। হৈমবতবর্ষের কেন্দ্রীয় পর্বতের নাম শঙ্কাপতি এবং এই বর্ষের মধ্য দিয়ে রোহিত এবং রোহিতাংশা নদীদ্বয় প্রবাহিত। হৈরণ্যবতের কেন্দ্রীয় পর্বত মলয়বৎ বা মালাস্ত। শিখরী পর্বতের দক্ষিণে অবস্থিত এই বর্ষ স্তবর্ণকুলা ও রূপ্যকুলা নদীদ্বয় বিধৌত। হরিবর্ষের কেন্দ্রে আছে বিকটাপতি পর্বত এবং দুটি নদী, হরিত ও হরিকান্তা। অমুরূপভাবে রম্যকবর্ষের কেন্দ্রে আছে গঙ্গাপতি পর্বত এবং নরকাস্তা এবং নাবী নামক দুইটি নদী। (১৩৩) সবচেয়ে বিশালায়তন বর্ষ হচ্ছে বিদেহ বর্ষ যার কেন্দ্রে মেরু বা মন্দর পর্বত অবস্থিত যান ষোলটি নাম আছে। মেরুর উত্তরে গঙ্গামাদন এবং মলয়বতের মধ্যে উত্তরকুরু, এবং দক্ষিণে, সৌম্যন ও বিদ্যাংপ্রভ পর্বতদ্বয়ের মধ্যে দেবকুরু নামক প্রদেশ অবস্থিত। (১৩৪) মেরুর পূর্বে পূর্ববিদেহ এবং পশ্চিমে অপরবিদেহ প্রদেশদ্বয় অবস্থিত। প্রতিটি প্রদেশেই একটি করে কেন্দ্রীয় নগর, কয়েকটি কবে পর্বত ও নদী আছে। (১৩৫) ভরতবর্ষ বা আমাদের ভারত হিমবতের দক্ষিণে অবস্থিত। সংক্ষেপে এই হল জৈন ব্রহ্মাণ্ড কল্পনা।

ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ ও জৈন ব্রহ্মাণ্ডকল্পনার অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় বর্তমান নিবন্ধে দেওয়া হল। এই তিনটি ধারার তুলনামূলক মূল্যায়ন করার দায়িত্ব অবশ্য পাঠকদের।

১৩২। কিরফেল, কসমোগ্রাফি, পৃ: ২১৪-২১।

১৩৩। ঐ, পৃ: ২২২-২৮।

১৩৪। মেরুপর্বত থেকে চারটি পর্বতশ্রেণী নির্গত হয়েছে—সৌম্যন (দক্ষিণ-পূর্ব), গঙ্গামাদন (উত্তর-পশ্চিম), মলয়বৎ (উত্তর-পূর্ব) এবং বিদ্যাংপ্রভ (দক্ষিণ-পশ্চিম)।

১৩৫। কিরফেল, কসমোগ্রাফি, পৃ: ২২৯-৪২।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সপ্ততিতম বার্ষিক কার্যবিবরণ

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সপ্ততিতম বর্ষের সাধাবণ অধিবেশন ও এক-সপ্ততিতম প্রতিষ্ঠা-দিবস উৎসবে আপনাবা সকলে একত্রিত হইয়াছেন। আপনাদের সকলকে যথাযোগ্য সম্ভাষণ জ্ঞাপন কবিতেছি। আপনাদের উপস্থিতিতে আমাদের সভাব কার্য সুসম্পন্ন হউক।

এই বৎসবে মध्ये আমাদের সকলকে গভীর শোকের আঘাত সহ করিতে হইয়াছে। ভারতবর্ষ জওহরলাল নেহরুর পবলোকগমন কেবল একজন কৃতী ভারতবাসীর দেহান্ত বলিয়া মনে কবা যায় না। তাঁহার জীবিতকালে দেশেব কোটি কোটি জনসাধাবণ তাঁহাকে ভারত-আত্মাব জীবন্ত প্রতীক বলিয়াই চিনিয়াছিল। সেজন্ত তাঁহার মহাপ্রয়াণে আমবা জাতীয় সঙ্কটের সম্মুখীন হই। শ্রীভগবান্ তাঁহাব আদর্শকে আমাদের সকলেব মনে জাগরুক কবিয়া রাখুন। আমবা যেন তাঁহাব উপযুক্ত দেশবাসী হইতে পাবি।

পরিষদের আপন জনেব মধ্যে আমরা এই বৎসর যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তকে হাবাইয়াছি। শিশুসাহিত্যে তাঁহাব দান আমরা পরম শ্রদ্ধাব সহিত স্মরণ করি। তিনি ১৩৫৯-৬১ পর্যন্ত পরিষদের অষ্টতম সহকাৰী সভাপতি ছিলেন। আজীবন-সদন্ত সতীশচন্দ্র বসুর পবলোকগমনও আমাদের বিশেষ শোকাবহ। আমরা এ বৎসর পরিষদের সদন্তগণেব মধ্যে অসিত-কুমার হালদাব, অপূর্ণকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, কার্তিকচন্দ্র মল্লিক, যতীন্দ্রবিমল চৌধুরীকে হাবাইয়াছি।

সাধাবণ-সভা আহ্বানেব সময়-সময় হঠাৎ সহ-সভাপতি শশিভূষণ দাশগুপ্তের অকাল প্রয়াণেব সংবাদ আসিল। তাঁহার পাণ্ডিত্য, অমায়িক ব্যবহার, চাবিত্তিক বল আমাদের বিশেষ মুগ্ধ কবিয়াছিল। তিনি তাঁহার অমূল্য সময় নষ্ট কবিয়া ভারতকোষেব বহু কাজ কবিয়াছেন।

এই সকল পবলোকগত আত্মার শান্তি কামনা করি।

এ বৎসর আমাদের বিশেষ আনন্দ-সংবাদ—পরিষদের সভাপতি শ্রীম্ননীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের জাতীয় অধ্যাপক-পদে নিয়োগ। তাঁহাব পাণ্ডিত্য ও চরিত্র-মাধুর্যের উপযুক্ত স্বাকৃতি দিয়া ভাবত-সরকাব আমাদের সকলেব ধন্যবাদার্থ হইয়াছেন। ভরসা করি, জাতীয় অধ্যাপনার কাজে তিনি নিজেকে নিয়োজিত কবিবাব সময় পরিষদের বিষয় চিন্তা কবিবেন। তাঁহাব সহিত পরিষৎ আরও বলিষ্ঠ ও স্থায়িভাবে জড়িত হইবে বলিয়া আশা কবিতেছি।

স্বামেন্দ্রসুন্দর-জন্মশত-বার্ষিক উৎসব :

এই বৎসবে পরিষৎকে একটি বিশেষ কর্তব্য পালনে ব্রতী হইতে হইয়াছে। এই ভাদ্র মাসে আচার্য বামেন্দ্রসুন্দরের জন্মশত-বর্ষ পূর্ণ হইল। পরিষৎ আজ যে জীবনরসে সিঞ্চিত

তাহার উৎস বামেন্দ্রসুন্দর। তাঁহার জন্মশতবার্ষিক উৎসব প্রতিপালন কবিতা আমবা
আমাদের ঋষি-ঋণ কিয়ৎপরিমাণে পরিশোধ কবিতা পারিব, এই ভরসা করি। কার্য-
নির্বাহক-সমিতি এ বিষয়ে যথাসময়ে অবহিত হইয়া সাধ্যমত চেষ্টা কবিয়াছেন। আনন্দের
সহিত জানাইতেছি যে, এই উপলক্ষ্যে শ্রীস্বনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'একটি
রামেন্দ্র-বচনা-সংগ্রহ পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত হইতেছে। তাহা ছাড়া ৭ই ভাদ্র ১৩৭১
(২৩শে আগস্ট ১৯৬৪) তারিখে একটি বিশেষ সভা আহ্বান কবিতা বামেন্দ্রসুন্দরের প্রতি
শ্রদ্ধা নিবেদন করিবার আয়োজন করা হইয়াছে। মুখ্য মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন, জাতীয়
অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু ও আমাদের সভাপতি মহাশয় এবং অধ্যাপক সুধীন্দ্র এই
সভায় পরিষদের আহ্বানে উপস্থিত থাকিবেন। বামেন্দ্রসুন্দরের খাতাপত্র, চিঠি প্রভৃতি এবং
পরিষদের পক্ষ হইতে রামেন্দ্রসুন্দরের প্রদত্ত ববীন্দ্রনাথকে অভিনন্দন ও ববীন্দ্রনাথের প্রদত্ত
বামেন্দ্রসুন্দরকে অভিনন্দন, এই সকল একত্র কবিতা একটি প্রদর্শনী আয়োজন করা হইয়াছে।

এই শতবার্ষিক উৎসবের প্রস্তুতি বিষয়ে বিশ্বভাবতীর্থ কর্তৃপক্ষ এবং রামেন্দ্রসুন্দরের কথা
মাননীয় শ্রীমতী চঞ্চলা দেবী ও দৌহিত্র শ্রীনির্মলচন্দ্র বায় যে সহায়তা করিয়াছেন, তজ্জন্ত
তাঁহাদের ধন্যবাদ জানাইতেছি।

সভ্যসংখ্যা ও কার্যনির্বাহক-সমিতির সদস্য :

১৩৭০ বঙ্গাব্দে পরিষদের বিভিন্ন শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যা এইরূপ ছিল :—

বান্ধব : রাজা শ্রীমবসিংহ, মল্লদেব বাহাদুর

বিশিষ্ট-সদস্য : শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু

আজীবন সদস্য : ৪৮ জন

সাধারণ-সদস্য : শহর—১২০ ও মফঃস্বল—৫৯

এই বৎসরের কর্মধ্যক্ষ-তালিকা নিম্নে উল্লিখিত হইতেছে :—

সভাপতি : শ্রীস্বনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

সহকারী সভাপতিগণ : শ্রীদীনেশচন্দ্র সবকার, শ্রীদুর্গামোহন ভট্টাচার্য্য,

শ্রীনীহাররঞ্জন বায়, শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীকণিভূষণ চক্রবর্তী,

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত ও শ্রীসুশীলকুমার দে।

সম্পাদক : শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র সিংহ

সহ-সম্পাদক : শ্রীঅতুল্যচরণ দে পুণ্ডরিক ও শ্রীভবেন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়

কোষাধ্যক্ষ : শ্রীসোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী

পুথিশালাধ্যক্ষ : শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

পত্রিকাধ্যক্ষ : শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস

গ্রন্থশালাধ্যক্ষ : শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

চিত্রশালাধ্যক্ষ : শ্রীপ্রতুলচন্দ্র গুপ্ত

কার্যনির্বাহক-সমিতির সদস্যবৃন্দ : শ্রীঅজয় হোম, শ্রীকামিনীকুমার কব বায়, শ্রীকুমারেশ ঘোষ, শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, শ্রীচিন্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীজগদীশচন্দ্র সিংহ, শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীনির্মলকুমার বসু, শ্রীত্ৰিদিবনাথ রায়, শ্রীপুলিনবিহারী সেন, শ্রীপ্রবোধকুমার দাস, শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য, শ্রীমনোমোহন ঘোষ, শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহ বায়, শ্রীসুধীবচন্দ্র লাহা, শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীহেমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীবিপ্লবকুমার দাস (পৌর প্রতিনিধি), শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য (গৌহাটী শাখা), শ্রীলক্ষ্মীকান্ত নাগ (বিষ্ণুপুর শাখা) ও শ্রীসুধাময় বন্দ্যোপাধ্যায় (মেদিনীপুর শাখা)।

আয়-ব্যয় পরীক্ষকদ্বয় : শ্রীবলাইচাঁদ কুণ্ডু ও শ্রীসরলকুমার চট্টোপাধ্যায়।

১৩৭০ বঙ্গাব্দের কার্যবিবরণী :

পবিত্রপুণ্যে নিয়মায়ুসাবে মুখ্যত কার্যনির্বাহক-সমিতি সকল কার্য পবিচালনা করেন। বিভিন্ন বিষয়ক যে সকল কার্যাদি অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার বিবরণ যথাযোগ্য স্থানে লিপিবদ্ধ করিতেছি। আলোচ্য বৎসবে মোট আটটি অধিবেশন হয়। পবিত্র-পক্ষে এ বৎসর দুঃস্থ সাহিত্যিক সাহায্য ভাণ্ডাব হইতে ৩ জনকে বার্ষিক সাহায্য দেওয়া হইয়াছে। দিল্লীতে ওবিয়েন্টাল সম্মেলনে পরিষৎ বিশেষভাবে সহায়তা করেন। পবিত্রদের কয়েকটি ছদ্মপাণ্ড পুঁথি তথাকার প্রদর্শনীতে পাঠান হয়। এগুলি দিল্লীর প্রদর্শনীতে লইয়া যান পবিত্রদের অত্যন্ত সহকারী গ্রন্থাগারিক শ্রীসুধাংশুশেখর চক্রবর্তী।

এই বৎসব কর্মচারিগণের প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের নিয়মাবলী সংশোধিত হইয়াছে।

পূর্ব পূর্ব বৎসবেব গ্রন্থ এ বৎসবেও সাহিত্য-দর্শন-বিজ্ঞান, ইতিহাস-গ্রন্থাগার-গ্রন্থ-প্রকাশ প্রভৃতি শাখা-সভা ও আয়-ব্যয় উপসমিতি গঠিত হয়।

এই বৎসব গ্রন্থপ্রকাশ বিষয়ে যে যে কাজ হইয়াছে, তাহার বিবরণ দিতেছি :

- ১। রামেন্দ্র-জন্ম-শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে প্রকাশিত রামেন্দ্র-বচনা-সংগ্রহ। (যন্ত্রস্থ)
- ২। বামেন্দ্র-বচনাবলী। ইহাব মুদ্রণকার্য সমাপ্তপ্রায়।
- ৩। নবীনচন্দ্রের 'বৈবতক'—ইহার ভূমিকাদি শেষ হইলে গ্রন্থটি প্রকাশিত হইবে।
- ৪। সাহিত্য-সাধক-চরিতমালায় আটটি গ্রন্থ পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে, ইহা ছাড়া এই তিনটি নূতন গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। ৯৮। উমেশচন্দ্র দত্ত, মহেশচন্দ্র ঘোষ, ৯৯। সরলা দেবী, শবৎচন্দ্র বায় (রাঁচী), ১০০। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়।

৫। বিষয়শিৰোনাম—গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানের বর্গীকরণবিষয়ক গ্রন্থ।

৬। ইহা ছাড়া স্বর্ণলতা, পাঁচকড়ি-রচনাবলী (১ম খণ্ড), একেই কি বলে সভ্যতা, বিবিধ প্রবন্ধ, দুর্গেশনন্দিনী, কমলাকান্ত, সধবার একাদশী ও সুরধুনী কাব্য—এই আটটি গ্রন্থেব পুনর্মুদ্রণ হইয়াছে।

৭। 'রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ' পুস্তকের সম্পাদনাব কাজ চলিতেছে। কিছু

কিছু তুষ্টিপ্য ছবি সংগৃহীত হইয়াছে, ব্লক প্রস্তুতের কাজও অগ্রসর হইয়াছে। সম্পাদনাব কাজ দ্রুত সমাধা কবিবার জন্ত সম্পাদক শ্রীপুলিনবিহারী সেনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে।

৮। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ববীন্দ্র-সংখ্যা : (১৩৬৬-ব ৩য়-৪র্থ সংখ্যা) অতঃপ্রকাশিত হইল। ববীন্দ্র শতবার্ষিকী উপলক্ষে পরিষদের প্রদ্বার্য্য নিবেদিত পরিষৎ-পত্রিকা। অতঃ আপনাদের নিবেদন কবি যে, রামেন্দ্র-জন্ম-শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে পরিষৎ-পত্রিকার বিশেষ সংস্করণ প্রকাশিত হইবে।

পরিষৎ-পক্ষে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি :

- ১। বঙ্গীয়-গ্রন্থাগার-পরিষদে : শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত
- ২। নৈহাটী বঙ্কিম-ভবনে : শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী
- ৩। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কুমুদিনী বসু পদক-সমিতিতে : শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ
- ৪। ঐ লীলা পুরস্কার সমিতিতে : শ্রীপ্রমথনাথ বসী
- ৫। ঐ শব্দচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বক্তৃতা সমিতিতে : শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য্য
- ৬। ঐ বিভাগসংব বক্তৃতা সমিতিতে : শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

আর্থিক অবস্থা :

পরিষদের আর্থিক অবস্থার বিশেষ কোন উন্নতি পবির্লক্ষিত হয় নাই। আলোচ্য বৎসবে সরকার হইতে নিম্নলিখিত সাহায্য পাওয়া যায় :

(ক)	পশ্চিমবঙ্গ-সরকার হইতে পত্রিকা প্রকাশ বাবদ	—২০০০.০০
(খ)	ঐ গ্রন্থ প্রকাশ বাবদ	—১২০০.০০
(গ)	ঐ কর্মচারী নিয়োগ খাতে	—৫৩২৮.৪২
(ঘ)	ঐ ববীন্দ্রনাথ ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ	—২০০০.০০
(ঙ)	ভারত-সরকার হইতে চিত্রশালার উন্নয়ন	—১৫,০০০.০০

এই বৎসর আমাদের সকল কার্য্য সুচারুরূপে পবিচালন করিবার জন্ত অর্থের বিশেষ প্রয়োজন। রামেন্দ্রজন্ম-জন্ম-শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে তাঁহার রচনা-সংগ্রহ প্রকাশ ও অন্যান্য উৎসব অহুতানের জন্ত অনেক টাকা ব্যয় হইতেছে। আমবা সবকালের নিকট এই বাবদে একটি বিশেষ সাহায্য মঞ্জুর করিবার জন্ত আবেদন করিয়াছি। আপনাবা সকলে উৎসব তহবিলে কিছু কিছু দান কবিলে কৃতার্থ হইব।

পূর্বে পূর্বে বৎসবের জন্ত এ বারেও বর্গীকরণ-বিভাগের সকল ব্যয়ভাব সাধাবণ তহবিল হইতে দিতে হইতেছে। কর্মচারী নিয়োগের জন্তও যে টাকা খরচ হয়, তাহার অতি সামান্য অংশই সরকার হইতে পাইয়াছি। এই সকল কাবণে আগামী বৎসবের আনুমানিক আয়-ব্যয়েব বিবরণীতে বিশেষ আশাপ্রদ কোন চিত্র আপনাদের নিকট উপস্থিত করিতে

পারিতেছি না। বিশেষতঃ গ্রন্থপ্রকাশের জন্ত যে অর্থ ববান্দ করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে, তাহা নিতান্তই অল্প এবং এই অর্থের মধ্যে কোন প্রকৃত কাজ করা কঠিন।

চিত্রশালা :

অন্ত চিত্রশালাব পুনর্বিজ্ঞাসেব প্রথম পর্ক শেষ হইল। ভাবত-সবকারেব সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া আমবা যে যে কাজ করিতে পাবিয়াছি, তাহা আপনারা সকলে দেখিয়া তৃপ্ত হইবেন বলিয়া ভরসা কবি। এই কাজের জন্ত যে টাকা খরচ হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ সবকারের সাহায্য হইতে সঙ্কুলান হয় নাই। প্রায় পাঁচ হাজার টাকা পবিমাণ দেনা আছে এবং রিপাবলিক ফার্নিসার্সেব কর্তৃপক্ষ আমাদের এই দেনাশোধ করিবার জন্ত সময় দিবেন বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন। আবও সবকারী সাহায্য পাইবাব চেষ্ঠাও করা হইতেছে।

এই পুনর্বিজ্ঞাসেব কাজে শ্রীসোমনাথ ভট্টাচার্য ও শ্রীঅবিন্দ ভট্টাচার্যেব যথেষ্ট সহায়তা পাইয়াছি। পবিষৎ-পক্ষে তাঁহাদেব ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

অন্ত শ্রীলীলামোহন সিংহ রায়—উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও খগেন্দ্রনাথ মিত্রের চিত্র উপহাব দিলেন। সে জন্ত তাঁহাকে ধন্যবাদ জানাইতেছি।

পুথিশালা :

বিগত ১৩৬৯ বঙ্গাব্দে পবিষদের পুথিশালায় সর্বপ্রকাব পুথির সংখ্যা ছিল ৬২২৩ খানি। আলোচ্য বর্ষে উপহারপ্রাপ্ত একখানি সংস্কৃত পুথি (সন্ধ্যাবিধি)। ইহাব সহিত যুক্ত হইয়া পুথিব সংখ্যা হইয়াছে ৬২২৪ খানি। - ইহাদের শ্রেণীবিভাগ এইরূপ—বান্দালা পুথি ৩৩৬৯, সংস্কৃত পুথি ২৫৯৮, তিব্বতী পুথি ২৪৪, ফার্সী পুথি ১৩—মোট ৬২২৪ খানি।

আলোচ্য বর্ষে ২৫০১ হইতে ২৬০০ সংখ্যা পর্যন্ত একশত বান্দালা পুথির বিবরণীযুক্ত তালিকা লিখিত হইয়াছে। ইংরাজি ১৯৩৫ সালে পবিষদের সংস্কৃত পুথির বিবরণ প্রকাশিত হইবার পরে যে সকল সংস্কৃত পুথি সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাব সংখ্যা ৬২৫। আলোচ্য বর্ষে ভাবত-সরকাব কর্তৃক প্রস্তাবিত পদ্ধতি অনুসাবে উক্ত ৬২৫ খানি সংস্কৃত পুথির বিবরণও প্রস্তুত করা হইয়াছে।

সদস্য ও গবেষণানিবত পণ্ডিতগণ পবিষদের পুথিশালায় বসিয়া আলোচ্য বর্ষে ১৭০ খানি পুথি আলোচনা কবিয়াছেন। ইহা ছাড়া দিল্লী ইন্টার গ্রাশনাল কংগ্রেস অব ওরিয়েণ্টালিস্ট প্রদর্শনীৰ কর্তৃপক্ষের অনুবোধে উক্ত প্রদর্শনীতে প্রদর্শনার্থ তিনখানি পুথি প্রেবিত হয়। ভাণ্ডাবকর ওরিয়েণ্টাল বিমার্চ ইনষ্টিটিউটকে একখানি 'হরিবংশে'র পুথি ও অল ইণ্ডিয়া কাশীরাজ ট্রাস্টকে দুইখানি 'বামনপুবাণে'র পুথি ধার দেওয়া হইয়াছে।

গ্রন্থাগার :

সাধারণ পাঠক ও গবেষকগণ বিশেষ ভাবে গ্রন্থাগার ব্যবহাব কবিয়াছেন। গ্রাশনাল লাইব্রেরী, এশিয়াটিক সোসাইটি এবং বিভিন্ন সবকারী সংস্থাগুলিকে তাঁহাদেব আবশ্যকমত পুস্তকাদি ধাব দেওয়া হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে ৩৬১ খানি পুস্তক উপহার পাওয়া গিয়াছে। এই ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে স্বর্গত যতীন্দ্রনাথ পাল মহাশয়ের সহধর্মিণী ও পুত্রগণ-প্রদত্ত ৯২১৯ পুস্তক ও ৩৩৭ সাময়িক পত্র পবিষদে দান কবিয়াছেন। এই সংগ্রহেব মধ্যে বহু দুস্প্রাপ্য গ্রন্থও বহিয়াছে। এই সংগ্রহেব সহিত ১২টি আলমাবিও দানস্বরূপ পাইয়াছি। পবিষদেব পক্ষ হইতে এই দানেব জন্ত দাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কবিতেছি।

এই বৎসব আমবা পবিষদেব গ্রন্থাগারভুক্ত পুস্তকসংগ্রহ মিল কবিয়া দেখিবার কাজ স্ফটাকরূপে সম্পন্ন কবিবাব চেষ্টা কবিয়াছি। আমাদেব গ্রন্থাগার বিবাহট। সে জন্ত কেবলমাত্র একটি অংশে মিল কবিবাব কাজ কবা হইয়াছে। অতি দৃঃখের সহিত জানাইতেছি যে, এই কার্যেব ফলাফল হইতে জানা যায় যে, অনেক পুস্তক নিখোঁজ হইয়াছে। তন্মধ্যে কিছু কিছু হয় ত কোন কোন সদস্তেব নিকট হইতে ক্ষেবত পাওয়া যাইবে অথবা কিছু হয় ত গ্রন্থাগারেব অত্নত্ৰ রহিয়া গিয়াছে। নিখোঁজ পুস্তকগুলি খুঁজিয়া পাইবাব বিশেষ চেষ্টা করা হইতেছে এবং পবিষদেব কর্মচাৰিগণ এই কাজ কবিতে পাবিলে কিছু পারিতোষিক পাইবেন, এইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আনন্দেব সহিত জানাই যে, ইতিমধ্যেই কিছুসংখ্যক অমিল পুস্তক পুনরুদ্ধার হইয়াছে।

ভাবতকোষ :

বিগত বৎসবেব বার্ষিক কার্যবিবরণে উল্লেখ কবিয়াছিলাম যে, নির্দ্ধারিত সময়েব মধ্যে ভাবতকোষেব চাবি খণ্ডেব জন্ত চল্লিশ টাকা মূল্যে পাঁচ হাজাব ব্যক্তি অগ্রিম গ্রাহক-তালিকাভুক্ত হইবার জন্ত আবেদন কবিয়াছিলেন। নির্দ্ধিষ্ট সময়েব মধ্যে এই মূল্য প্রেবণ কবিবাব জন্ত আবেদনকাৰীদেব প্রত্যেককে পত্র দেওয়া হইয়াছিল। তাঁহাদেব মধ্যে তিন হাজাবেব উর্দ্ধে নির্দ্ধারিত সময়েব মধ্যে মূল্য প্রেবণ করায় তাঁহাদিগকে গ্রাহকশ্রেণী-ভুক্ত করা হয়। সেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়াব শ্যামবাজার শাখা, গ্রাহকদেব নিকট হইতে মূল্য গ্রহণ কবিয়া আমাদিগকে সবিশেষ সাহায্য কবিয়াছেন। ইহাব পরে বিভাগপ্রতিষ্ঠান ও লাইব্রেরীসমূহেব জন্ত পঞ্চাশ টাকা মূল্যে এবং সাধাবণেব জন্ত বাট টাকা মূল্যে আরও এক হাজাব অগ্রিম গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত কবা হইবে স্থিৰ হয়। নির্দ্ধাবিত সময়েব মধ্যে ৫৩৩ জন ঐ বর্দ্ধিত হারে এই স্বেযোগ গ্রহণ কবিয়াছেন। কাগজেব মূল্য, মুদ্রণ এবং অত্নাত্ৰ আনুযজিক ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে পবিষদেব আর্থিক স্বচ্ছলতা বজায় রাখিবাব জন্ত বাধ্য হইয়াই এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ কবা হয়। এই তিন পর্যায়েব গ্রাহক ব্যতীত যে সকল ব্যক্তি 'ভাবতকোষে'ব জন্ত নিবন্ধ বচনা কবিয়াছেন, তাঁহাবাও প্রতি সেট চল্লিশ টাকা মূল্যে পাইবাব অধিকাৰী হইবেন স্থিৰ হইয়াছে।

ভাবতকোষেব প্রথম খণ্ডেব মুদ্রণকার্য নাভানা প্রেস হইতে বিগত পূজার ছুটিব পূর্ক হইতেই আরম্ভ হইয়াছে। মোট আট হাজাব এক শত খণ্ড ছাপা হইবে স্থিৰ হইয়াছে। ইহার মধ্যে চারি হাজাব খণ্ড গ্রাহক ও লেখকদেব জন্ত সংরক্ষিত থাকিবে

এবং অবশিষ্ট চাষি হাজাব খণ্ড প্রতি খণ্ড কুড়ি টাকা নগদ মূল্যে বিক্রয় করা হইবে স্থির হইয়াছে।

প্রথম খণ্ডটি পঁচাশি ফর্মার কিছু কম-বেশি সমন্বিত হইয়া প্রকাশিত হইবে। ইহার মধ্যে ৭৭ ফর্মা ইতিমধ্যে মুদ্রিত হইয়াছে। অবশিষ্ট কয়েক ফর্মার মুদ্রণকার্য শীঘ্রই শেষ হইবে এবং আগামী আশ্বিন মাসের প্রথম হইতেই ইহা তালিকাভুক্ত গ্রাহকগণকে বিতরণ করিতে পারা যাইবে এবং প্রথম খণ্ড নগদ মূল্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করাও সম্ভব হইবে আশা করিতেছি। বাঁধাইয়েব কার্য পরিষদ-ভবনে বসিয়া দণ্ডবিগণ ইতিমধ্যেই আবস্ত কবিয়াছে, স্ততরাং মুদ্রণকার্য সমাপ্ত হইবাব সঙ্গে সঙ্গে বাঁধাইয়েব কাজ শেষ হইতে বিশেষ বিলম্ব হইবে না। পুস্তকখানি দুই তিন মাস পূর্বেই প্রকাশ করিতে পারা যাইবে, আমবা আশা করিতেছিলাম; কিন্তু নাভানা প্রেসে ধর্মঘট ও তৎপবে কলিকাতায় দাঙ্গাহাজামাব জন্ত মুদ্রণকার্য বেশ কিছুদিনের জন্ত ব্যাহত হয়। তদুপবি প্রসঙ্গ-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবার ফলে এবং সম্পাদকীয় সংশোধনাদি কার্যে অধিকতর সময় ব্যয়িত হইবাব জন্ত আশামুখায়ী সময়ের মধ্যে উহা প্রকাশ করা সম্ভবপব হয় নাই। বিশেষ গর্বেব সহিত উল্লেখ কবি যে, পবিষদের এই বিভাগে একটি অক্লান্ত-কর্মী নিষ্ঠাসম্পন্ন কর্মি-গোষ্ঠী কার্যরত আছেন। তাঁহাদেব আন্তরিক চেষ্টায় বহু বাধা-বিপত্তির মধ্যেও ভারতকোষের অবশিষ্ট খণ্ডগুলি প্রকাশ করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইবে না ভবসা করিতেছি।

ভাবতকোষেব আয়-ব্যয়ের হিসাব পবিষদের উদ্বৃত্ত-পত্রে দৃষ্ট হইবে। তালিকাভুক্ত গ্রাহকদের নিকট হইতে সংগৃহীত অর্থেব মধ্যে এক লক্ষ টাকা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়াতে স্থায়ী আমানতে জমা আছে। দ্বিতীয় খণ্ডের কাগজও হস্তগত হইয়াছে। পূজাব ছুটিব পব দ্বিতীয় খণ্ডের মুদ্রণ সংক্রান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ কবা হইবে।

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন :

আমাব ছায় সামান্য ব্যক্তিকে আপনাবা পরিষদের সম্পাদকেব পদে নির্বাচন করায় আমি আপনাদের সকলেব নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ। কিন্তু বিশেষ কবিষা কয়েকজনের সাহায্য ব্যতিবেকে আমাব পক্ষে কার্য পবিচালনা কবা অসম্ভব হইত। সভাপতি শ্রীমুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সকল সময়েই আমাদের পথ-প্রদর্শক। শ্রীনির্মলকুমার বসু তাঁহাব বেশী ভাগ সময়ই পরিষদের কাজে ব্যয় কবিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ভারতকোষের কাজেব বাহিরেও তাঁহার স্বভাবজ পবিষৎ-প্রীতিব জন্ত আমাদের ধন্যবাদার্থ। ভাবতকোষ-বিভাগে যে সকল কর্মিগণ কাজ করিতেছেন, তাঁহাদেব পুনরায় ধন্যবাদ না জানাইলে অমুচিত হইবে। ইহা ছাড়া পবিষদেব আয়-ব্যয় পরীক্ষকদ্বয়—শ্রীবলাইচাঁদ কুণ্ডু ও শ্রীসরলকুমার চট্টোপাধ্যাকে ধন্যবাদ জানাই।

উপসংহার :

এই বৎসরে পবিষদেব অতীত বা ভবিষ্যতের কথা চিন্তা কবিলেই আবার আচার্য্য বামেন্দ্রসুন্দবেব কথাই মনে উদিত হয়। পবিষদের যে রূপ আমাদের দৃষ্ট হইতেছে, তাহাব স্রষ্টা বামেন্দ্রসুন্দব। পবিষদ্-মন্দিব ও রমেশ-ভবন তাঁহাবই কীর্ত্তি। পরিষদের মধ্য দিয়া তিনি জ্ঞানচর্চাব যে শ্রোত প্রবাহিত কবিয়াছিলেন. তাহা তাংকালিক বাংলা দেশেব শিক্ষিত জন-সমাজেব মনকে আগ্রুত কবিয়াছিল। তাঁহাব প্রতি আমাদের সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানাইতেছি। এই স্মৃত্তে অল্প কথায় তাঁহার পরিচয় দিবাব জন্ত তাঁহার মহাপ্রয়াণেব পর পবিষদেব বিশেষ আধবেশনে গৃহীত শোক-প্রস্তাব উদ্ধৃত কবিতেছি :

“যিনি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পবিষদেব প্রাণস্বরূপ ছিলেন, সাহিত্য-পবিষদকে জন্মাবধি যিনি প্রাণপণ যত্নে ও সেবায় সঞ্জীবিত রাখিয়া বর্ত্তমান অবস্থায় উন্নীত করিয়াছেন, যিনি পরিষদেব সর্ব্ববিধ সঙ্কটে অকৃত্রিম স্নহদের কার্য্য কবিয়াছেন, সাহিত্য-পবিষদের অভ্যুদয়ে ঐহাব হৃদয় আনন্দে উচ্ছসিত হইয়া উঠিত ; দর্শন, বিজ্ঞান ও সাহিত্য প্রভৃতি নানা বিষয়ে বঙ্গভাষা ঐহার কৃতিত্বে যথেষ্ট পবিপুষ্ট ও সম্পদশালী হইয়াছে, ঐহার অভাবে আজ বঙ্গদেশ, বঙ্গভাষা এবং বিশেষতঃ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পবিষৎ ক্ষতিগ্রস্ত, সেই সর্ব্বজনপ্রিয়, সৌজন্ত ও শিষ্টাচাবেব প্রতিমূর্ত্তি, আদর্শচরিত্র পরিষদের সভাপতি বামেন্দ্রসুন্দব ত্রিবেদী মহাশয়েব বিয়োগে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পবিষৎ গভীর শোক প্রকাশ কবিতেছেন।”

আমুন, আপনারা আজ পবিষৎ-মন্দিরে বামেন্দ্রসুন্দরেব আরদ্ধ কার্য্য সুপরিচালনে ব্রতী হউন। পবিষদ্-মন্দিরে সাহিত্যচর্চাব জন্ত তাঁহাবই কণ্ঠে যে আহ্বান ধ্বনিত হইয়াছিল, তাহাই উদ্ধৃত কবি :

“সাহিত্য-পরিষদের নূতন মন্দিব বঙ্গের সাহিত্য-সেবকগণেব সম্মিলন-কেন্দ্ররূপ স্থাপিত হইয়াছে। তাঁহারা এই কেন্দ্রস্থলে সমবেত হইয়া সাহিত্যেব উন্নতিকল্পে আলাপ ও পরামর্শ করিবার ও পবম্পব আত্মীয় সম্পর্কে আবদ্ধ হইবার সুযোগ পাইবেন। জ্ঞানান্বেষণ এই মন্দিরে উপবিষ্ট হইয়া নব নব তত্ত্বাসন্ধানে নিযুক্ত রহিবেন এবং দেশমধ্যে জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রচাব দ্বাবা স্বদেশকে উন্নতিমার্গে প্রেবণ করিবেন। অতীত কালেব মহাপুরুষগণেব স্মরণ-নিদর্শন সগৌরবে বহন করিয়া এই মন্দিব বঙ্গবাসী স্নাত্রেব তীর্থস্বরূপে পবিগত হইবে।”

আচার্য্য বামেন্দ্রসুন্দবেব আহ্বান সার্থক হউক, ইহাই প্রার্থনা কবি।

আপনাবা প্রত্যেকে আমার যথাযোগ্য অভিবাদন গ্রহণ করুন।

নিবেদক

৬ই ভাদ্র ১৩৭১ }
২২শে আগস্ট ১৯৬৪ }

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র সিংহ

সম্পাদক

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের একসপ্ততিতম বর্ষের কার্যবিবরণ

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের একসপ্ততিতম বর্ষের সাধারণ অধিবেশন ও দ্বিসপ্ততিতম প্রতিষ্ঠা দিবস উৎসবে আপনাবা সকলে একত্রিত হইয়াছেন। আপনাদের সকলকে যথাযোগ্য সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিতেছি। আপনাদের উপস্থিতিতে আমাদের সভার কার্য সুসম্পন্ন হউক।

এই বৎসরের মধ্যে কয়েকজন সাহিত্যসেবী আমাদের ত্যাগ করিয়া মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। যথা : কান্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত, কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর, প্রেমাসুন্দর আতর্ষী, মানিক ভট্টাচার্য্য, সতীনাথ ভাট্টা, সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, সুলতা কব প্রভৃতি। তাঁহাদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

পরিষদের সদস্যগণের মধ্যে আর্থ্যকুমার সেন, ক্ষীরোদচন্দ্র মাইতি, কৃষ্ণচরণ সরকার, কনকেশ্বর ভট্টাচার্য্য স্বর্গত হইয়াছেন। ইহাদের স্মৃতিব প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

॥ জন্মশতবর্ষ পূর্তি উৎসব ॥

বিধাতার কোন এক বিচিত্র আশীর্বাদে আজ হইতে শতবর্ষ পূর্বে বাংলাদেশে যে সকল মহান ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের স্মরণ করিয়া কৃতার্থ হইতেছি। বিগত বৎসরে আমরা আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দরকে স্মরণ করিয়াছি। পূর্বে স্থিরীকৃত কার্যক্রম অনুসারে গত বৎসর ১৩৭১ সালের ৭ই ভাদ্র তাবিখে একটি বিশেষ অধিবেশন হয়। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন, জাতীয় অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু, পরিষদের সভাপতি শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি গণ্যমান্য মহোদয়গণ এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। সেদিন ছিল শ্রাবণী-পূর্ণিমা। তাই মহা আনন্দের মধ্যে সেদিন সভায় ভাইয়ে ভাইয়ে বাণীবন্ধন উৎসব প্রতিপালিত হয়। বামেন্দ্রসুন্দরের “বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা” পঠিত হয়।

এই বৎসরেও আমরা কয়েকজন মনীষীর জন্মশতবর্ষ পূর্তি উৎসব পালন করিব। কবি রজনীকান্ত সেন (জন্ম : ২৬ জুলাই ১৮৬৫ মৃত্যু : ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯১০) পরিষদের প্রতিষ্ঠা-কালীন সেবক-বৃন্দের মধ্যে অন্যতম। তিনি পরিষদের মন্দির প্রতিষ্ঠা উৎসবে ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মেলনে যোগদান করিয়া স্বীয় স্মৃতি দ্বারা সদস্যগণকে আনন্দ দান করেন। বিগত ১১ শ্রাবণ ১৩৭২ তারিখে, পরিষৎ তাঁহার জন্মশতবার্ষিকী উৎসব পালন করিয়াছেন।

মনীষী আশুতোষ মুখোপাধ্যায় (জন্ম : ২৯ জুন ১৮৬৪ মৃত্যু : ২৫ মে ১৯২৪) ও পরিষদের অন্যতম সেবক ছিলেন। তিনি বঙ্গাব্দ ১৩১২-১৫ পর্য্যন্ত পরিষদের সহকারী সভাপতির পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বাংলা ভাষাকে নিজস্ব সম্মানিত আসনে স্থাপনা করিয়া

আন্ততৌষ আমাদের কিভাবে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা আপনাদের সকলেই স্মরিত। রামেন্দ্রসুন্দর প্রমুখ পবিষদেব তদানীন্তন কর্ম্মিগণ যখন বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মেলনের অধিবেশন আরম্ভ করেন, তখন আন্ততৌষ বিশেষ আগ্রহেব সহিত এই কাজে অংশ গ্রহণ করিতেন। ১৩২৩ বঙ্গাব্দে বাঁকীপুরে অস্থিষ্ঠিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মেলনে তিনি সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তাঁহার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করিয়া আমবা নিজেদেব ধন্য মনে করিতেছি।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ কবেন ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ৩১শে মে। তিনি ১৩৪১-৪৫ বঙ্গাব্দে পরিষদেব সহকাবী সভাপতির পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৭ জামুয়ারি ১৯০৯ সালে ববীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে অধ্যক্ষ হাভেল সাহেবকে অভিনন্দিত কবিবাব জগ্গ পরিষদে যে সভা আহুত হয়, রামানন্দ 'ভারতীয় কলাশিল্প কেন অপর দেশীয় কলাশিল্প হইতে শ্রেষ্ঠ', এই সম্বন্ধে হাভেল সাহেবের মন্তব্যেব ব্যাখ্যা কবেন। তাঁহার নবসপ্ততিতম জন্ম দিনে পবিষদের পক্ষে তাঁহাকে একটি মানপত্র দিয়া সম্মানিত কবা হয়। তাঁহার জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে পরিষদের 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা'র একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনী-গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। শীঘ্রই স্থায়ীভাবে পরিষদ মন্দিরে তাঁহার চিত্র প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হইতেছে।

ডন সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে অনেক সময়ে মনে থাকে না। কিন্তু নব্য-বাংলার মানসিক উৎকর্ষেব ক্ষেত্রে তাঁহার দান ও প্রেরণা আমাদের অরুণ করা কর্তব্য। তাঁহার জন্মশতবর্ষ এই বর্ষে পূর্ণ হইল।

॥ পরিষদের কার্যনির্বাহক-সমিতি ও সভ্যগণ ॥

১৩৭১ বঙ্গাব্দের কর্ম্মাধ্যক্ষগণের তালিকা :

সভাপতি :	শ্রীজ্ঞানীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়,
সহঃ-সভাপতি :	শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার, শ্রীহুর্গামোহন ভট্টাচার্য্য, শ্রীনীহাববজ্ঞন রায়, শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীফণিভূষণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদাব, শ্রীজ্ঞানীকুমার দে
সম্পাদক :	শ্রীরুদ্দাবনচন্দ্র সিংহ
সহঃ-সম্পাদক :	শ্রীঅতুল্যচরণ দে পুরাণবত্ত ও শ্রীগুণেন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়
কোষাধ্যক্ষ :	শ্রীসোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী
গ্রন্থশালাধ্যক্ষ :	শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত
পত্রিকাধ্যক্ষ :	শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস
পুথিশালাধ্যক্ষ :	শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী
চিত্রশালাধ্যক্ষ :	শ্রীপ্রতুলচন্দ্র গুপ্ত

১৩৭১ বঙ্গাব্দে পরিষদের কার্যনির্বাহক-সমিতি সভ্যগণ :

শ্রীঅজয় হোম, শ্রীকল্যাণী দত্ত, শ্রীকামিনীকুমার কবরায়, শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত, শ্রীকুমারবেশ ঘোষ, শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য্য, শ্রীজগদীশচন্দ্র সিংহ, শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীত্রিদিবনাথ রায়, শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীনির্মলকুমার বসু, শ্রীপুলিনবিহারী সেন, শ্রীপ্রবোধকুমার দাস, শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহবায়, শ্রীসুধীরচন্দ্র লাহা, শ্রীহীবেন্দ্রনাথায়ণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীহেমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। শ্রীবিপ্লবকুমার দাস (গৌরপ্রতিনিধি)।

শাখাপরিষৎ-পক্ষে প্রতিনিধিগণ :

শ্রীষতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য (গৌহাট), শ্রীলক্ষ্মীকান্ত নাগ (বিষ্ণুপুর) ও শ্রীসুধাময় বন্দ্যোপাধ্যায় (মেদিনীপুর)

১৩৭১ বঙ্গাব্দে পরিষদের বিভিন্ন শ্রেণীর সভ্যসংখ্যা :

বান্ধব : বাজা শ্রীনরসিংহ মল্লদেব

বিশিষ্ট সদস্য : শ্রীব্রমেশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু,
শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীসুশীলকুমার দে

আজীবন সদস্য : ৫০ জন।

সাধারণ সদস্য : মফঃস্বল—৫১ জন।

শহর —৮৭২ জন।

॥ ১৩৭১ বঙ্গাব্দের কার্যবিবরণী ॥

অতীত বৎসরের অনুরূপ এই বৎসরেও কার্যনির্বাহক-সমিতি পরিষদের সকল কার্য পরিচালন করেন। আলোচ্য বৎসরে মোট সাতটি অধিবেশন হইয়াছে। পরিষদের কর্মচারীদের ৩৬ টাকা হারে ভাতা বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

দেশে ভাষা বিষয়ক সমস্যা লইয়া নানা প্রকার আলাপ-আলোচনা এই বৎসর হইয়াছে। গত ২৬শে জ্যৈষ্ঠাবি ১৯৬৫ হইতে সর্বভারতীয় ভাষা হিসাবে হিন্দী প্রচলিত কবায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবাব পব, পরিষদের কার্যনির্বাহক-সমিতি এ বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা করেন এবং দাবী করেন যে, হিন্দী ভাষাকে একমাত্র সর্বভারতীয় ভাষা হিসাবে গ্রহণ করা চলিতে পারে না। অপর পক্ষে, হিন্দী, বাংলা, দক্ষিণ ভারতীয় একটি ভাষা এবং ইংবাজিকে সমমর্যাদায় ভারত সরকার কর্তৃক স্বীকৃত হইবার দাবী জানান হয়। এই ক্ষেত্রে পরিষদ পক্ষে নাগরী লিপিতে বাংলা ভাষা লিখিবাব দাবীর বিরোধিতা করা হয়।

এই বৎসর তিন জন দুঃস্থ সাহিত্যিক পরিবারে মহিলাকে দুঃস্থ সাহিত্যিক ভাণ্ডার হইতে মাসিক সাহায্য দেওয়া হইয়াছে।

পূর্ব পূর্ব বৎসরের গ্রন্থ, এ বৎসরেও সাহিত্য-দর্শন-বিজ্ঞান-ইতিহাস-গ্রন্থাগার-গ্রন্থ প্রকাশ প্রভৃতি শাখাসভা ও আয়বায় উপসমিতি গঠিত হয়।

এ বৎসরে যে-যে গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার বিবরণ :

১। রামেন্দ্র শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে 'রামেন্দ্র বচনা-সংগ্রহ' প্রকাশ ব্যাপাবে সরকারী সাহায্য পাইবার আশায় এই গ্রন্থ প্রকাশে কিছু বিলম্ব ঘটিয়াছে। এই পুস্তকে রামেন্দ্রজন্মের রবীন্দ্রনাথকে লিখিত একটি পত্রের প্রতিলিপি (ত্রক) এবং পরিষৎ-পক্ষে রবীন্দ্রনাথকে প্রদত্ত রামেন্দ্রজন্মের অভিনন্দন পত্রের প্রতিলিপি (ত্রক) মুদ্রণ করিবার অমুমতি দিয়া বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ আমাদের ধন্যবাদার্থ হইয়াছেন।

২। শ্রীপঞ্চানন চক্রবর্তী সম্পাদিত 'রামেন্দ্র বচনাবলী'।

৩। নবীনচন্দ্র বচনাবলীর পঞ্চম খণ্ড। ইহাতে 'প্রভাস', 'রৈবতক' ও 'কুরুক্ষেত্র' মুদ্রিত হইয়াছে।

৪। শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল প্রণীত 'বামানন্দ চট্টোপাধ্যায়'।

৫। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন', মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য' 'পদ্মাবতী' প্রভৃতি এবং 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা'র কয়েকটি গ্রন্থ পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

৬। সাহিত্য পবিষদ পত্রিকাব ১৩৬৯ সালের শেষ পর্য্যন্ত যে সংখ্যা বাকী আছে তাহা দুইটি মুখ্য সংখ্যারূপে মুদ্রণ করা হইতেছে। আশাকরি শীঘ্রই সংখ্যাগুলি প্রকাশিত হইবে। রামেন্দ্র জন্মশতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে বিশেষ সংখ্যারূপে পত্রিকাব একটি সংখ্যা প্রকাশিত হইবে।

॥ বিভিন্ন সংস্থায় পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধি ॥

(ক) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় :

- ১। কমলা বক্তৃতা সমিতি : শ্রীম্মশীলকুমার দে
- ২। গিবিশচন্দ্র ঘোষ বক্তৃতা সমিতি : শ্রীসোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী
- ৩। জগত্তাবিণী পদক সমিতি : শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ
- ৪। বিদ্যাসাগর বক্তা সমিতি : শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল
- ৫। শবৎচন্দ্র বক্তা সমিতি : শ্রীদ্বিদিবনাথ বায়
- ৬। সরোজিনী বস্ত্র পদক সমিতি : শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ

(খ) নিখিলভাবত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন : শ্রীকুমারেশ ঘোষ

(গ) বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পবিষৎ : শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য

॥ আর্থিক অবস্থা ॥

পরিষদের আর্থিক ছববস্তাব কথা প্রতি বৎসবই আপনাদের নিকট নিবেদন করি। এই বৎসর আমাদের অবস্থার কোন উন্নতি পরিলক্ষিত হয় নাই। সকল কাজই অর্থের অভাবে প্রতিহত হইতেছে। বহু গ্রন্থ প্রকাশের প্রস্তাব হইয়াছিল। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে একমাত্র অর্থাভাবে উহা কার্য্যকরী হয় নাই।

পরিষদের আনুমানিক আয়ব্যয় (বজেট) বিবরণে প্রত্যেক বৎসব ঘাটতি পবিলক্ষিত হইতেছে এবং এবারেও সেইরূপ অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। কেবল গ্রন্থ প্রকাশের কাজ সজ্জিত হওয়া ছাড়া এই ঘাটতি পূরণের জন্ত আমাদের আর একটি গভীর ক্ষতি সাধিত হইতেছে। ঝাড়গ্রাম, লালগোলা প্রভৃতি যে সকল গচ্ছিত তহবিল আছে, পুস্তক বিক্রয়লব্ধ অর্থ ঐ-ঐ তহবিলে সঞ্চিত হইবার কথা। কিন্তু ঘাটতি পূরণ করিবার জন্ত তাহা সম্ভব হয় না। ফলে ঐ সকল তহবিলের পরিমাণ ক্ষয়মান হইতেছে। ভবিষ্যতে এই ভাবে এই সকল গচ্ছিত তহবিলের অপচয় বন্ধ করিবার নিমিত্ত আমাদের বিশেষ চেষ্টিত হওয়া প্রয়োজন। দেখা যাইতেছে যে কয়েক বৎসব পূর্বে সরকারী সাহায্য পাইবার আদেশ পাইয়া আমরা যে সকল কর্মচারী নিয়োগ করিয়াছি, তাহাদের বেতন ও ভাতা বাবদ আমাদের দেয় অর্ধেকাংশ বহন করিতে হইতেছে। তাহার পরিমাণ ও ঘাটতিব পরিমাণ প্রায় এক। কিন্তু এই কথায়, এই কর্মচারীগণকে বাদ দেওয়ার প্রস্তাব উঠে না। খুব স্থিরভাবে আমাদের বিচার করিয়া দেখিতে হইবে যে কিভাবে কার্যালয়ের পুনর্নির্ভাস সাধন করিলে কাজের ক্ষতি না হইয়া ব্যয় সঙ্কোচ হইতে পারে। পরিষদের কার্যনির্বাহক-সমিতির বর্তমান বৎসবের শেষ অধিবেশনে এই উদ্দেশ্যে একটি উপসমিতি গঠন করিয়া এই সকল বিষয়ে আলোচনা করিয়া স্মৃষ্টি পন্থা নির্ধারণের জন্ত ভার দিয়াছেন।

ইহা ছাড়া রামেন্দ্র-শতবর্ষপূর্তি উৎসব উপলক্ষে আমাদের যে টাকা ব্যয় করিতে হইয়াছে, তাহাও সামান্য অংশই চাঁদা হিসাবে সংগৃহীত হইয়াছে। মুখ্যমন্ত্রীর তহবিল হইতে পাঁচশত টাকা এই বাবদ আমরা দান হিসাবে পাইয়াছি। বহুদিন হইল পবিত্র মন্দির মেরামত হয় নাই বলিয়া এই উপলক্ষে সামান্য কিছু কিছু মেরামত করা হইয়াছিল। সেই বাবদে এবং বাকী মেরামতের কাজ করিবার জন্ত সবকালের নিকট দশ হাজার টাকা সাহায্যের আবেদন জানান হইয়াছে। আমরা সবকালের নিকট হইতে নিম্নলিখিত সাহায্য পাইয়াছি :

(১) পত্রিকা প্রকাশ বাবদ ২০০০ টাকা, (২) গ্রন্থ প্রকাশ বাবদ ১২০০ টাকা এবং (৩) কর্মচারী নিয়োগ বাবদ ৫৪৮২.৩২ টাকা।

॥ চিত্রশালা ॥

আলোচ্য বৎসরে চিত্রশালায় পুনর্নির্ভাস সাধিত হইয়াছে। গত প্রতিষ্ঠা উৎসবের দিনে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীবীন্দ্রলাল সিংহ এই চিত্রশালায় দ্বার উন্মোচন করেন।

পূর্বদিবস চিত্রশালায় আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দরের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে একটি বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন। রামেন্দ্রসুন্দরের বহু চিঠিপত্র ও অতীত বিশেষ কাগজ-পত্র, নিজস্ব গ্রন্থাবলীর মধ্যে কিছু কিছু অংশ এই প্রদর্শনীতে স্থান পায়। পরিষৎ-প্রদত্ত রামেন্দ্রসুন্দরের অভিনন্দন-পত্র এবং রবীন্দ্রনাথের প্রদত্ত রামেন্দ্রসুন্দরকে অভিনন্দন-পত্র প্রদর্শিত হয়।

পরিষৎ-পক্ষে রামেন্দ্রসুন্দর কর্তৃক স্বাক্ষরিত রবীন্দ্রনাথকে প্রদত্ত মানপত্র এবং রামেন্দ্রসুন্দর কর্তৃক রবীন্দ্রনাথকে লিখিত একটি পত্রও প্রদর্শিত হয়। বিশ্বভাবতী কর্তৃপক্ষকে এই দুইটি পাঠাইবার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

চিত্রশালায় পুনর্বিজ্ঞানসেব জন্ম যে টাকা খরচ হইয়াছে, তাহা আমবা এখনো সংগ্রহ কবিতে পারি নাই। বিপাবলিক ফার্নিসার্স কোম্পানীকে মাসিক ৫০০ টাকা করিয়া কিস্তীতে দেনা পরিশোধ কবিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে।

অতীত দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে চিত্রশালায় একটি বিশেষ ক্ষতি হইয়া গিয়াছে। বিগত ১৪ জাম্বুয়াবি ১৯৬৫ তারিখের রাত্রে দুইটি বিষুর্মূর্তি অপহৃত হইয়াছে। ইহা আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর কর্তৃক কিশোরীমোহন সিংহ মহাশয়ের নিকট হইতে সংগৃহীত হয়। পাল যুগেব এই দুইটি মূর্তি আমাদের চিত্রশালায় অমূল্য বস্তু ছিল। পুলিশের নিকট ব্যক্তিগতভাবে চেষ্টা করিয়াও কোন সফল লাভ কবিতে পারি নাই।

॥ পুথিশালা ॥

বিগত বর্ষে (১৩৭১ সালে) পুথিশালায় সর্কপ্রকাব পুথিব সংখ্যা ছিল ৬২২৪। আলোচ্য বর্ষে একখানি সংস্কৃত ও দুইখানি বাঙলা পুথি সংগৃহীত হইয়া উহাব সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৬২২৭। ইহাদেব বিষয়-বিভাগ এইরূপ :

বাঙলা পুথি—৩৩৭১; সংস্কৃত পুথি—২৫৯৯; তিব্বতী পুথি—২৪৪; ফার্সী পুথি—১৩। সর্কমোট ৬২২৭।

আলোচ্য বর্ষে ২৬০১ হইতে ২৭০০ সংখ্যা পর্যন্ত একশত বাঙলা পুথিব বিবরণ-যুক্ত তালিকা প্রস্তুত করা হইয়াছে। ত্রিপুরা সবকার ও বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়কে কিছু পুথি বা তাহাব অংশ বিশেষেব প্রতিলিপি দেওয়ার ব্যবস্থা কবা হইয়াছে। পবিসদের পুথিশালায় বসিয়া সদস্ত ও গবেষণাকারী পণ্ডিতগণ আলোচ্য বর্ষে ৫৭খানি পুথি ব্যবহার করিয়াছেন।

॥ ভারতকোষ ॥

বিগত পূজার ছুটিব পূর্বে আশ্বিন মাসে 'ভারতকোষ' প্রথম খণ্ডের মুদ্রণ-কার্য্য শেষ হইলে, একটি অধিবেশনেব মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে দেয় ত্রিশখণ্ড পুস্তক মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীরবীন্দ্রলাল সিংহ মহাশয়ের হস্তে উপহার দিয়া খোলা বাজাবে নগদমূল্যে 'ভারতকোষ' বিক্রয় কার্য্য আবস্ত হইবে স্থির হয়। এই উদ্দেশে ১৭ আশ্বিন ১৩৭১ তাবিখে আহৃত সভা মন্ত্রীমহোদয় ও অন্যান্য স্বধীবন্দের উপস্থিতিতে সন্মতভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল এবং ঐ তাবিখ হইতে বৎসরেব শেষ পর্যন্ত মোট ৭৪৬ খানি পুস্তক বিক্রয় হইয়াছে। ভারতকোষ বিক্রয়ের কমিশনেব হাব যথেষ্ট আকর্ষক নহে বলিয়া অনেকে অহযোগ কবিয়াছেন; কিন্তু পুস্তকের মূল্য নির্দ্ধারণে

লাভেব অংশ একরূপ উচ্চহাবে রাখিতে পারা যায় নাই, যাহা হইতে উচ্চহারের কমিশন দেওয়া যাইতে পারে। তৎসঙ্গেও আশা করিতেছি অন্যান্য খণ্ড প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে বিক্রয়েব পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে। ভারতকোষের লেখকগণ চল্লিশ টাকা হিসাবে সত্তর সেট পুস্তক ক্রয় কবিয়াছেন।

প্রথম খণ্ড (অ—উ) প্রকাশিত হইবার পূর্ব বৈজ্ঞানিক ও বৈদেশিক প্রসঙ্গ নির্বাচন বিষয়ে পুনরায় নানাভাবে আলোচিত হয় এবং অবশিষ্ট তিনখণ্ডের কয়েকটি বিষয়ের নিবন্ধগুলি সংক্ষিপ্ততর পৰিমাণে রচিত না হইলে প্রস্তাবিত চারিখণ্ড সীমার মধ্যে সমগ্র গ্রন্থ সম্পূর্ণ করা সম্ভবপর হইবে না অস্বত্বত হয়। এই প্রয়োজন স্পষ্টভাবে বিবেচিত হইবার উদ্দেশে বিষয়ানুগভাবে অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গকে লইয়া বিভিন্ন বিষয়ের কয়েকটি উপসমিতি গঠিত হয় এবং কার্য্য ত্বরান্বিত করিবার জন্ত অতিবিক্ত পাঁচজন সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত করা হয়। এই প্রকাষের বিশদ কার্য্য সম্পন্ন করিতে স্বভাবতঃই কিছু অধিক সময় লাগিয়াছে। তবে গ্রন্থের বিষয় এই যে সম্পাদক মণ্ডলীর অহুমোদিত প্রসঙ্গগুলিব লেখক নির্বাচন ও পৰিমাণ স্থির কবিতে অধিক সময় ব্যয়িত হয় নাই এবং সেগুলি অভিজ্ঞ লেখকগণ কর্তৃক লিখিত হইবার জন্ত সঙ্গে সঙ্গেই প্রেরিত হইয়াছে। এই দ্রুত কার্য্য পরিচালনার ভার অত্যন্তম সম্পাদক শ্রীনির্মলকুমার বসুর উপর অর্পিত হয় এবং তাঁহার নেতৃত্বে সম্পাদনাব কার্য্যও অগ্রসর হইতেছে। তিনি বহু শ্রম স্বীকাব কবিয়া এবং অনেক সময় ব্যয় কবিয়া যেভাবে ভারতকোষেব কাজ কবিতেছেন সেজন্ত তাঁহাকে ধন্যবাদ জানাইতেছি।

ভারতকোষ দ্বিতীয় খণ্ডের মুদ্রণ কার্য্য নাভানা প্রেসে বিগত ১৯ জ্যৈষ্ঠ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। মুদ্রণ কার্য্যের গতিবেগ নানা কারণে আশাহুঙ্কর হয় নাই। সম্পাদকীয় সংশোধনাদি কার্য্যে অধিকতর সময় ব্যয়িত হওয়াই ইহাব অত্যন্তম কারণ। এইরূপ গ্রন্থের মুদ্রণ কার্য্যে বিশেষ সাবধানতা ও ধৈর্য্যের প্রয়োজন। সেই জন্ত ঠিক কোন সময়ে উহা প্রকাশ করিতে পাবা যাইবে এক্ষণে তাহা বলা সম্ভব হইতেছে না। তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডেব কাজ ইতিমধ্যে অগ্রসর হইয়াছে। ঐ গুলির প্রকাশে অযথা বিলম্বেব আশঙ্কা কবিতেছি না।

পূর্বে বৎসরের সম্পাদকগণ ব্যতীত আলোচ্যবর্ষে শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীকুমার সেন, শ্রীদুর্গামোহন ভট্টাচার্য্য, শ্রীচিন্তামণি কর ভারতকোষ সম্পাদক মণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া আমাদের বিশেষ সহায়তা করিতেছেন। শ্রীহিবদ্রয় বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমুবেশচন্দ্র চক্রবর্তী নানা প্রকাষেব উপদেশ দিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন।

ভারতকোষের আয় ব্যয়েব হিসাব পরিষদের উদ্বর্তপত্রে দৃষ্ট হইবে। আমাদের হস্তে বর্তমানে যে অর্থ মজুত আছে, তাহা দ্বিতীয় খণ্ডের প্রকাশ কার্য্যে ব্যয়িত হইবে। সরকার কর্তৃক প্রতিশ্রুত অর্থ বর্তমান বৎসরের মধ্যে হস্তগত হইলে, তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড প্রকাশেব বিঘ্ন হইবে না বলিয়া আশা কবি।

॥ গ্রন্থাগার ॥

বথারীতি গ্রন্থাগারের কাজ এই বৎসব পরিচালিত হইয়াছে। তবে অর্থাভাবে গ্রন্থাগারের গ্রন্থ বাঁধাই প্রভৃতি নানা কাজ বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে। এই বৎসবে পুস্তক আদান প্রদানের যে পবিসংখ্যান কবা হইয়াছে, তাহার তালিকা এইরূপ : (মোট পুস্তকাদির সংখ্যা ৪৪,৬১৪)

বিষয়	পাঠকক্ষ	লেনদেন বিভাগ	মোট পুস্তক
দর্শন (১০০)	৪৮	১০১	১৪৯
ধর্ম (২০০)	১১৫	১৯০	৩০৫
সমাজ বিজ্ঞান (৩০০)	২০২	৫২	২৫৪
ভাষাতত্ত্ব (৪০০)	৫০	২৫	৭৫
বিজ্ঞান (৫০০)	৪৮	১৪	৬২
ব্যবহারিক বিজ্ঞান (৬০০)	২৬	১২	৩৮
শিল্পকলা (৭০০)	৩৪	৯২	১২৬
সাহিত্য (৮০০)	১৫২৩	৪৭০৭	৬২৩০
ভূগোল (৯১০)	৮৮	১৫৭	২৪৫
জীবনী (৯২০)	২৮০	৩৩৯	৬১৯
ইতিহাস (৯৩০।৯৩০।৯৩০)	৩২৪	১৪১	৩৬৫
সহায়ক গ্রন্থ	৫০৫	৭৪	৫৭৯
পত্রপত্রিকা	৪১৬৯	+	৪১৬৯
মোট	৭৩১২	৫৯০৪	১৩২১৬

॥ ভাষাভূমারী ॥

ভাষা	পাঠকক্ষ	লেনদেন	মোট
বাংলা	৬,৬৭৪	৫,৭২১	১২,৩৯৫
সংস্কৃত	১৩৬	২৬	১৬২
ইংরেজী	৫০২	১৫৭	৬৫৯

আলোচ্য বর্ষে মোট ৩,০২৬ খানি গ্রন্থ উপহাব স্বরূপ পাওয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে ৮৭তীক্ষ্মনাথ পাল মহাশয়ের পুত্রগণ—৫০৪, শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল—৬২১, শ্রীঅদ্বৈত গাঙ্গুলীর পরিবারবর্গ হইতে প্রাপ্ত—১,৪৪১ এবং অন্যান্য ৪৬০খানি গ্রন্থাদি উল্লেখ যোগ্য। এই দানের অন্ত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

গ্রন্থাগারের কাজ উপযুক্তভাবে পরিচালনার জন্য, গত বৎসবে পুস্তক মিল করিবার যে কাজ আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা এ বৎসবও চলিয়াছে। পুনঃ পুনঃ চেষ্টাব ফলে নিখোঁজ

পুস্তকের সংখ্যা অনেক কমিয়াছে এবং এখন মোট $১৫২ + ১২৬ = ২৭৮$ সংখ্যার দাঁড়াইয়াছে। কার্যনির্বাহক-সমিতি এই নিখোঁজ পুস্তকাবলীর মধ্যে ছুপ্রাপ্য পুস্তকেব পৃথক তালিকা কবিবার নির্দেশ দিয়াছেন। ক্রীত বা উপহৃত পুস্তক বাহাতে যথাযথভাবে তালিকাবদ্ধ হয় তাহার জন্ত যথাযোগ্য যত্ন লওয়া হইতেছে।

॥ বিভিন্ন সংগ্রহভুক্ত পরিষৎ গ্রন্থাগারের তালিকাবদ্ধ গ্রন্থ ॥

পরিষদ মন্দিরে বর্তমান গ্রন্থসংখ্যা এইরূপ :—

১। সাধাবণ সংগ্রহ—

বাংলা—	১৬,২০০
ইংরাজি—	১০,২৭৫
সংস্কৃত—	১,৪০৬
হিন্দী—	১
	২৭,৮৮২

সাময়িক পত্রাদি—

বাংলা—	৫৬২
ইংরাজি—	১,৪৭৫
	২,০৩৭

২। রামেন্দ্রসুন্দর সংগ্রহ—

বাংলা—	২৮৬
ইংরাজি—	১,২৭০
সংস্কৃত—	২১৭
	১,৭৭৩

৩। রামেশ দত্ত সংগ্রহ—

বাংলা—	৪২
ইংরাজি—	৯৯৩
সংস্কৃত—	৬০
	১,০৯৫

৪। বিনয়কৃষ্ণ দেব সংগ্রহ—

ইংরাজি—	৫৭৮
---------	-----

৫। বিভাসাগর সংগ্রহ—

বাংলা—	৩৩০
ইংরাজি—	২,৯৪৩
	৩,২৭৩

৬। উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য—

বাংলা—	১৪৬
ইংবাজি—	৩৪৮
সংস্কৃত—	২৭
হিন্দী—	৭
	৫২৮

৭। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত সংগ্রহ—

বাংলা—	২১৪
ইংরাজি—	১৯১৯
সংস্কৃত—	৭২
	২,২০৫

৮। ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর—

বাংলা—	৩৬০
ইংবাজি—	৫৪৫
সংস্কৃত—	৯০
	৯৯৫

৯। যতীন্দ্রনাথ পাল সংগ্রহ—

ইংরাজি—	৪,২৫০

॥ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ॥

আপনাদের সকলেব স্নেহে আজ চার বৎসর হইল পরিষদের সেবা করিতেছি। উপযুক্তভাবে এই গুরুভাব বহন করিতে পারিতেছি বলিয়া মনে বল পাই না। তবে আপনাবা দয়া করিয়া কাজ চালাইয়া লইতেছেন, এজ্ঞ আপনাদের নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। বিশেষতঃ আমাদের সভাপতি শ্রীমুনাতিকুমার চট্টোপাধ্যায় স্থিতধী। সকল আপদে বিপদে তাঁহাব অধিনায়কত্ব আমাদের বল ভরসা। শ্রীনির্মলকুমার বসু ও শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ভারতকোষের কাজে ব্যস্ত থাকিলেও পবিষদেব অত্যাশ্র কাজে অংশ গ্রহণ করিয়া আমাদের ধন্যবাদার্থ হইয়াছেন। সহকারী সম্পাদক শ্রীঅতুল্যচরণ দে পুবাণরত্ন যথাসাধ্য আমাকে সাহায্য কবিয়াছেন। পবিষদেব হিসাববক্ষকদ্বয় শ্রীবলাইচাঁদ কুণ্ডু ও শ্রীসরলকুমার চট্টোপাধ্যায় যথায়থভাবে হিসাবাদি পরীক্ষা করিয়াছেন। তাঁহাবাও আমাদের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন।

॥ উপসংহার ॥

এই কয় বৎসব পবিষদেব সেবা করিয়া যে সকল কথা মনে আসিয়াছে, তাহাব দু-একটি আপনাদের নিকট নিবেদন করিব। কোন প্রতিষ্ঠান কোন প্রকারে বাঁচিয়া আছে এই অবস্থার সন্মুখীন হইলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের কর্মীগণের বিশেষভাবে অবহিত হওয়া উচিত। কেন না, যে প্রতিষ্ঠানের জীবন প্রবাহ মন্দীভূত, তাহা বাঁচিয়া থাকিলেও অবনতির দিকে যাইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আপনাদের কাছে তাই নিবেদন যে পবিষদের জীবনে নূতন কবিয়া প্রাণেব স্পন্দন জাগাইয়া তুলিবার জন্ত চেষ্টিত হউন।

কি ভাবে এই ব্রত সমাপন করিতে পারি, তাহার আদর্শ আমাদের পূর্বস্ববিগণ স্মৃতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। পরিষদের নিয়মাবলীমধ্যে যে-যে উদ্দেশ্যে পরিষদ গঠিত হয়, তাহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ কবিতে আপনাদিগকে অমুরোধ জানাইতেছি। আমার মনে হয়, প্রকৃতপক্ষে পবিষদ সাহিত্য-সৃষ্টির ক্ষেত্র নহে। সাহিত্য বিষয়ক, বিশেষতঃ ভাষা বিষয়ক গবেষণার ক্ষেত্র। ভাবতকোষ বিভাগেব কাজ আরম্ভ করিয়া গবেষণার ক্ষেত্রে আমরা কিছু গভীরভাবে প্রবেশ করিয়াছি। কিন্তু বর্তমানে দ্রুত সঞ্চরমান কালশ্রোতে মাহুবেব প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সকল সময় কোষগ্রন্থেব অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্ত পুনঃ পুনঃ সংবক্ষণ করা কর্তব্য। সেইজন্ত এনসাইক্লোপিডিয়া ত্রিটানিকার শ্রায় স্থায়ীভাবে আমাদের কোষগ্রন্থ বিভাগ স্থাপিত হওয়া প্রয়োজন। তাছাড়া ব্যাকরণ বা ভাষাবিশয়ক অত্যাশ্র কি কি পরিবর্তন সাধন করিলে বাংলা ভাষার উন্নতি হইতে পারে, তজ্জন্ত গবেষণা হওয়া প্রয়োজন।

এতদ্ব্যতীত বাংলা দেশের ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, সমাজ ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ক গবেষণার জন্তও আমাদের কার্যে অগ্রসর হওয়া উচিত। বস্তুতঃ রামেন্দ্রচন্দ্রের যুগে রবীন্দ্রনাথ

এই সকল বিষয়ে কার্য্যাহুবর্তী হইবার জন্ত পরিষদে ছাত্রগণকে আহ্বান করিয়া লইয়া আসিয়াছেন।

বর্তমানে ভাষাবিষয়ক প্রস্তাব লইয়া ভাৰত সরকার নানা সমস্তাব সম্মুখীন হইতেছেন। সৰ্ব্ভাৰতীয় ভাষা ষাহাই হউক না কেন, প্রত্যেক আঞ্চলিক ভাষার অগ্রগতিৰ জন্ত ভারতসরকারকে যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে তাহা স্ননিশ্চিত। আমাব প্রস্তাব—ভাৰত সরকার, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদকে বাংলা ভাষার উৎকর্ষেব জন্ত আঞ্চলিক ভাষাবিষয়ক প্রতিষ্ঠান হিসাবে সম্মান দান করুন। আধুনিক রুচি সম্মত গবেষণা কেন্দ্রেব সুপরিচালনার জন্ত যে সকল ব্যবস্থা প্রয়োজনীয়, সেগুলি কবিতে হইবে। তাহাচাড়া কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কেহ নিজের তাগিদে আসিয়া গবেষণার কাজ চালাইবেন, ইহা আশা কবা যায় না। সেজন্ত একজন বেতনভুক্ত উপযুক্ত মুখ্য গবেষক এবং তাঁহার দুই বা তিনজন সহকাৰী গবেষক নিয়োগ করিতে হইবে। খুব সাধাবণভাবে একটি পবিকল্পনা আপনাদের নিকট উপস্থাপিত করিলাম। যদি আপনাবা উচিত মনে করেন, তাহা হইলে আগামী বৎসরের কার্য্যনির্বাহক-সমিতি, এ বিষয়ে কাজে অগ্রণী হইবেন বলিয়া আশাকবি। ঈশ্বরের কৃপায় পরিষদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বলতর হউক।

আপনাবা আমার যথাযোগ্য অভিবাদন গ্রহণ করুন।

২২শে ভাদ্র, ১৩৭২
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

নিবেদক
শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র সিংহ
সম্পাদক